স্মৃতিকথা

(প্রথম পর্ব)

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

ডি. এম. লাইব্রেরী
৪২, কর্নওয়ালিশ ষ্ট্রীট · কলিকাতা - ৬

প্রথম প্রকাশ, বৈশাখ ১৩৫৮

দ্বিতীয় প্রকাশ, ভাদ্র ১৩৬২

তিন টাকা আট আনা

৪২নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬, ডি. এম. লাইব্রেরীর পক্ষে শ্রীগোপালদাস মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত ও ৮৩-বি, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা-৬, "বাণী-শ্রী" প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার চৌধুরী কর্তৃক মুদ্রিত। প্রচ্ছদ-শিল্পী—শ্রীআশু বন্দ্যোপাধ্যায়

সূচনা

শেষ পর্যন্ত 'স্মৃতিকথা' বাস্তবে পরিণত হ'ল।

কেউ যদি দয়া ক'রে আমার 'স্মৃতিকথা'র খাতায় একবার দৃষ্টিপাত করেন, তা হ'লে দেখবেন প্রথম পৃষ্ঠার উপর দিকের বাম কোণে লেখা আছে ১. ৫. ৪৭। পাতা দেড়েক পরে মার্জিনে পুনরায় দেখতে পাবেন ২৪. ৬. ৫০। এ থেকে বুদ্ধিমান পাঠকের বুঝতে বিলম্ব হবে না, আত্মীয়-বন্ধু-বান্ধবগণের তাগাদার চাবুক খেয়ে খানিকটা ক'রে লিখেছি, তারপর চাবুক বন্ধ হ'তেই ছ্যাকড়া গাড়ির বৈরাগ্যশান্ত ঘোড়ার মতো আপনা-আপনি থেমে গেছি।

এমনিভাবে আরও দু-চার তারিখ এগিয়ে একদিন হয়ত 'স্মৃতিকথা'র খাতায় অন্তিম দাঁড়িই প'ড়ে যেত, যদি না দুটি বন্ধু আমার অগোচরে চক্রান্ত ক'রে এমন এক কলের চক্রের সহিত আমাকে জুড়ে দিতেন, যা বন্ধ করবার চাবি আমার হাতে নেই। সে কল হচ্ছে সুবিখ্যাত সাপ্তাহিক পত্র 'দেশ', আর সে দুটি বন্ধু হচ্ছেন আমার বৈবাহিক শ্রীসুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং 'দেশ' পত্রের সহকারী সম্পাদক শ্রীসাগরময় ঘোষ। এঁরা দুজনে আমাকে বাধ্য না করলে খুব সম্ভবত 'স্মৃতিকথা' লেখা হ'য়ে উঠত না। এঁদের দুজনকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

'স্মৃতিকথা' সম্বন্ধে কোনো ব্যাখ্যা অথবা কৈফিয়ৎ দেবার প্রয়োজন আছে ব'লে মনে করি নে। এ লেখার উদ্দেশ্য-অভিপ্রায় দাবি-দাওয়া সম্বন্ধে পুস্তকের প্রথম পরিচ্ছেদেই কিছু ইঙ্গিত দিয়েছি। ছেলেরা আকাশের গায়ে সাবান-ফোস্কা (soap bubble) ওড়ায়। নলের সূক্ষ্ম ছিদ্রপথে এক-এক বিন্দু সাবান-জল স্থাপন ক'রে ফুঁ দিয়ে

দিয়ে বড় বড় গোলক তৈরি করে। ভাসমান সেই সব গোলকের দেহে রামধনুর সপ্তবর্ণের আভা। একমাত্র আনন্দ দেওয়া এবং আনন্দ পাওয়া ভিন্ন সে খেলায় অন্য কোনো সাধু উদ্দেশ্য থাকে না। অথচ দেখতে পাই, আনন্দ পাবার লোভে দোতলার বারান্দায় ছেলেদের অভিভাবকেরাও ভিড় ক'রে দাঁড়িয়ে যান।

আমার 'স্মৃতিকথা'ও সাবান-ফোস্কার পদ্ধতিতেই তৈরী। রসিক পাঠকেরা হয়ত ফোস্কার দেহ দেখেই নিরস্ত হবেন, বস্তুলোভী পাঠক যদি দেহ নিয়ে টেপাটিপি করেন তা হ'লে ফোস্কা ফাটার পীড়া ভোগ করতে হবে। তবে এটুকু আশ্বাস দিতে পারি যে, ফোস্কা ফাটার পর যে সামান্য বস্তু হাতে ঠেকবে, তা সাবান-জলেরই মতো নির্ভেজাল পদার্থ।

৪৬-৫বি, বালিগঞ্জ প্লেস
কলিকাতা
১০ চৈত্র ১৩৫৭

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

সোদরোপম বৈবাহিক

শ্রীমান সুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে

তাঁর জন্মদিনে উপহার

স্মৃতিকথা

স্মৃতিকথা

প্রথম পর্ব

১

জীবনের সুদীর্ঘ পথ চলিতে চলতে যে সংখ্যাতীত এবং বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি তার মধ্যে একটা হচ্ছে, বহু সঙ্কল্প এবং পরিকল্পনা যেমন কার্যে পরিণত হ'তে পারে নি, তেমনি এমন অনেক কিছু ব্যাপার শেষ পর্যন্ত পরিণতি লাভ করেছে যার মূলে কোনোদিন কোনো প্রেরণা ছিল না; এমন কি, হয়ত ঔদাসীন্য অথবা অনিচ্ছাই ছিল। স্মৃতিকথা নাম দিয়ে যে লেখা আজ আরম্ভ করলাম তা যদি কোনোদিন সত্য সত্যই পরিণতি লাভ করে, তা হ'লে তা শেষোক্ত শ্রেণীরই আর একটি দৃষ্টান্ত ব'লে পরিগণিত হবে, সে কথা নিশ্চয় বলতে পারি।

জীবনী অথবা জীবনকথা পড়তে আমার ভাল লাগে, কিন্তু লিখতে একেবারেই না। নিজের ত কথাই নেই, অপরেরও নয়। নিজের জীবনী লেখবার কথা মনে হ'লে মনে হয়, সে যেন কতকটা নিজের শ্রাদ্ধ নিজেই ক'রে যাওয়ার মতো হবে। অপরের লিখতে সঙ্কোচ এসে বাধা দেয়। যে মানুষ সারা জীবন কল্পনার রেখাঙ্কনের উপর শিল্পকলার রঙ চড়িয়ে নরনারী সৃষ্টি ক'রে ক'রে হাত পাকালে অথবা কাঁচালে, সে যদি হঠাৎ একদিন রক্তমাংসে গঠিত অরুণকান্তি সরকারের জীবন-চরিত লিখতে ব'সে নিজের জ্ঞাত অথবা অজ্ঞাতসারে বা কল্পনার রঙের পাত্রে তুলি ডুবিয়ে অরুণকান্তির উপর এক পোঁছ অবাস্তর রঙ চড়িয়ে অরুণকান্তিকে তরুণকান্তি ক'রে বসে, তা হ'লে বিস্মিত হবার কিছু থাকে না। সুতরাং কোনো অরুণকান্তি সরকারের জীবনী লেখবার প্রস্তাবে সঙ্কোচ এসে

কখনো যদি আমাকে বাধা দিয়ে থাকে, তা হ'লে সে সঙ্কোচকে ক্ষমা করা যেতে পারে।

আমার জীবনে একবার মাত্র এমনি একটা সঙ্কোচ আসবার কারণ ঘটেছিল প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর। শরৎচন্দ্র আমার আত্মীয়, আবাল্য বন্ধু; আমাদের উভয়ের গার্হস্থ্য এবং সাহিত্য জীবনের একটা বিশেষ অংশ একত্রে এক গৃহে অতিবাহিত হয়েছিল; 'বিচিত্রা' মাসিক পত্রিকায় শেষের দিকে শরৎচন্দ্রের প্রায় সমস্ত লেখাই প্রকাশিত হচ্ছিল। এই সকল কারণ বশত আত্মীয়-বন্ধুবান্ধবের মধ্যে অনেকেই শরৎচন্দ্রের জীবনী লেখবার জন্য আমাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করেছিলেন। একটি বড় প্রকাশকের পক্ষ থেকে এজন্য লোভনীয় পারিশ্রমিকের প্রস্তাবও আমার কাছে উপস্থিত হয়েছিল। কিন্তু পাছে জীবনীর মধ্যে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে খাড়া করতে গিয়ে শরৎকুমার চট্টোপাধ্যায়কে খাড়া ক'রে বসি, সেই ভয়ে ঐ প্রস্তাবে শেষ পর্যন্ত স্বীকৃত হই নি।

অনেকের মতে আমার জীবন বিচিত্র অভিজ্ঞতায় পূর্ণ। এই মতের সহিত আমার মতেরও খানিকটা ঐক্য যে নেই, তা নয়। অবশ্য এভারেস্টের শিখরে আরোহণ করি নি আর সাগরগর্ভের সুগভীর অতলেও ডুব মারি নি; কিন্তু এই দুই চূড়ান্তের মধ্যস্থলে যে বিশাল সমতল ভূমি আছে, তার একটা অংশে দীর্ঘকাল অবস্থান করার ফলে কিছু অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হয়েছে সে কথা অস্বীকার করতে পারি নে। এই সকল অভিজ্ঞতা থেকে কুড়িয়ে বাড়িয়ে বেছে-বুছে একটা কোনো পদার্থ খাড়া করার জন্য যে-সকল আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব আমাকে অনুরোধ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে একজন এখন কোনো সুদূর বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি গৌরবজনক পদ অধিকার ক'রে আছেন,

এবং অপর একজন এই কলিকাতা নগরেই উত্তরোত্তর সাহিত্য-প্রতিষ্ঠা অর্জন এবং সাহিত্য-পণ্যশালার শ্রীবৃদ্ধি সাধন ক'রে চলেছেন। তাঁদের অনুরোধ রক্ষা করতেও এত বিলম্ব ক'রে ফেলেছি যে, এখন যদি তাঁরা ব'লে বসেন, 'কই, এমন অনুরোধ আমরা করেছিলাম বলে ত মনে পড়ে না', তা হ'লে তাঁদের দোষ দিতে পারব না।

স্মৃতিকথা লেখবার পূর্বে একটা কথা স্বীকার ক'রে রাখছি যে, যে-শক্তির উপর নির্ভর ক'রে স্মৃতিকথা লেখবার কথা, সেই স্মরণশক্তিরই আমার যথেষ্ট দৈন্য আছে। শুধু যে আজই আছে, তা নয়; চিরকালই ছিল। স্কুল-কলেজে অধ্যয়নকালে ইতিহাস আমার ভাল লাগত না তার নাম-স্থান আর তারিখের কণ্টকাকীর্ণতার জন্যে। শিবাজী মহারাজ ১৬২৭ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, এ কথাটা আমার কাছে মুখ্য ছিল না; আমার কাছে মুখ্য ছিল, তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু যে ছাত্রকে ইতিহাসের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে হবে, তার পক্ষে ১৬২৭ খৃষ্টাব্দই মুখ্য কথা। শিবাজী যদি আদৌ জন্মগ্রহণ না করতেন, তা হ'লে সে ছাত্রের পক্ষে কোনো আপত্তিই থাকত না, যদিও আমার পক্ষে থাকত; কিন্তু যে মুহূর্তে শিবাজী জন্মগ্রহণ করেন, সেই মুহূর্তেই ইতিহাসের ছাত্রের পক্ষে শিবাজীর জন্মগ্রহণের সন-তারিখ হ'ল অপরিহার্য জিনিস,—কণ্ঠস্থ ক'রে ফেলে ভুলে-না-যাবার অতি-প্রয়োজনীয় বস্তু। এমন অনেক সুখময় দিনের স্মৃতি আমার মনে সুস্পষ্ট হ'য়ে আছে, যার সন-তারিখ সম্পূর্ণ ভুলে মেরে দিয়েছি। কিন্তু তার জন্য মনের মধ্যে বিন্দুমাত্র ক্ষোভ নেই।

তাহারে বাসিয়াছিনু ভাল, *
সে কথায় পূর্ণ আছে মন।
কোন্ সনে কি তারিখে বাসিয়াছিলাম,
সে প্রসঙ্গে কি-বা প্রয়োজন!

সন-তারিখ যে আমার মনের মধ্যে দয়া ক'রে দল বেঁধে বসবাস করছে না, সেজন্য আমি তাদের কাছে সত্যই কৃতজ্ঞ। ব্রজেন্দ্রনাথ-প্রমুখ মনীষিবৃন্দের চিত্তজগৎ তাদের পক্ষে যথেষ্ট প্রশস্ত এবং যথার্থই নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য স্থান। সুতরাং আমার মতো অর্বাচীন লেখকের চিত্তে তাদের স্থান না হ'লে দুঃখ করবার কিছু নেই।

আর একটা কথা। এই স্মৃতিকথা লিখতে আমি সময়ের ক্রমিকতা কঠোরভাবে মেনে চলব না। আমরা যখন একান্ত মনে চিন্তা করি, তখন বিভিন্ন চিন্তা আমাদের মনের মধ্যে সময়ের ক্রম ধ'রে আসে না,— আসে এলোমেলো ক্রমে; এক বিষয়বস্তু থেকে অপর বিষয়বস্তুতে চিন্তা যায় অনেক সময়ে অবান্তরের প্রণালী ডিঙিয়ে। স্মৃতিকথা লিখতে আমি অনুসরণ করব সেই অলস চিন্তারত মনের পদ্ধতি। ১৩৪০ সালের কথা লিখে চলেছি ব'লে ১৩৩০ সালের কথা পুনরায় লিখব না, এমন দুর্বলতা আমার লেখার মধ্যে দেখা যাবে না। রবীন্দ্রনাথের কথা লিখতে লিখতে শরৎচন্দ্রের কোনো কথা যদি অনিবার্য বেগে মনের রুদ্ধ দ্বারে এসে ধাক্কা মারে, তা হ'লে হয়ত দুয়ার খুলে তাকে অভ্যর্থিত ক'রে নেব; এবং তার সঙ্গে সঙ্গে যদি চিত্তরঞ্জন সম্বন্ধে কোনো এক প্রবলতর কথা অলক্ষিতে স্মৃতি-মন্দিরে ঢুকে পড়ে, তা হ'লে সে কথাকে প্রথম প্রাধান্য দেব না এমন কথাও বলতে পারি নে।

সুতরাং এরূপ অবস্থায় কোনো ঐতিহাসিক অথবা জীবনীকার যদি আমার এ লেখা থেকে তাঁদের লেখার মাল-মসলা সংগ্রহ করতে ইতস্তত করেন, তা হ'লে ক্ষুণ্ন হব না। কিন্তু রসিক পাঠকের কানে কানে ব'লে রাখি, তাঁরা যেন এ কথায় সত্য-সত্যই বিচলিত না হন। আমার এ লেখায় কাহিনী-অংশ যতটুকু থাকবে তা হবে একান্ত নির্ভরযোগ্য; আর, সন-তারিখ যেখানে যতটুকু পাওয়া যবে তা যদি একান্ত নির্ভরযোগ্য

না-ও হয়, তথাপি নির্ভুলতার যথাসাধ্য কাছাকাছি যাবে, এটুকু আশ্বাস দিতে পারি। অর্থাৎ, কোনো ঘটনা যদি গ্রীষ্মকালের ঘাম-ঝরা দিনে ঘ'টে থাকে ত বড়-জোর তাকে বসন্তকালের ফুল-ফোটা দিনে পিছিয়ে নিয়ে যেতে পারি, কিন্তু তাই ব'লে শীতকালের পাতা-ঝরা দিনে কখনো নয়। আর, কাহিনীর বিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে, কাহিনী আমি যথাযথভাবেই বিবৃত করব কিন্তু তাতে যদি সাহিত্যের একটু রসান চ'ড়ে বসে, তা হ'লে সহৃদয় পাঠক-পাঠিকা সেই রসানকে ক্ষমা করবেন, যেমন তাঁরা ক্ষমা করেন উৎকৃষ্ট কড়া-পাকের বরফী সন্দেশের উপরকার রূপালি পাতকে। রূপালি পাতের দ্বারা সন্দেশের শোভা বাড়ে, কিন্তু স্বাদ কমে না।

আমাদের সংসারে বস্তুর উপর এইরূপ রঙ-চড়ানোর প্রথা অনেক ব্যাপারেই প্রচলিত আছে। স্বর্ণকার সোনার অলঙ্কারের উপর রঙ চড়ায়। তামা-পিতলের সামগ্রীর উপর সোনা, রূপা ও নিকেলের জল চ'ড়ে গৃহের চতুর্দিকে উজ্জ্বল হ'য়ে ছড়িয়ে থাকে। আমাদের সভ্যতার কথাবার্তা ও আচার-ব্যবহারের বেশ-খানিকটা অংশ অসত্যের বাণী অধিকার ক'রে সমস্ত জিনিসকে মোলায়েম ক'রে থাকে। নিমন্ত্রণ-গৃহে কদর্য খাদ্য আহার ক'রেও আমরা প্রসন্নমুখে বলি, খাসা খাওয়া গেল! ক্রোড়পতি নিমন্ত্রিত ব্যক্তিকে করজোড়ে আবাহন ক'রে বলেন, আমার গরিবখানায় পদার্পণ ক'রে আমাকে কৃতার্থ করবেন; আপনার দৌলত-খানার কুশল ত? যদিও ক্রোড়পতি নিজেই অবগত আছেন যে, দৌলতখানায় দু-বেলা ঠিকমতো অন্ন জুটছে না। শুধু ব্যঞ্জনেই আমরা ফোড়ং দিই নে, বাক্যেও দিই। বৈষ্ণবপদকর্তার আসল পদের উপর আখর চড়িয়ে আমরা কীর্তন-গান করি। পদ যদি হয়, 'মনের বেদনা মরমীয়া জানে সই'—কীর্তন-গায়ক আর উপর চড়ান, 'এ আট পণ্ডরীর মণ নয়ক, ষোড়শী-কিশোরী মন।'

রঙ-চড়ানোর এরূপ দৃষ্টান্ত চতুর্দিকে রাশি রাশি ছাড়িয়ে আছে। এ সকল যখন সহ্য করার, এমন কি ভাল লাগার অভ্যাস আমাদের আছে, তখন আশা করি আমার স্মৃতিকথায় যদি সামান্য একটু সাহিত্যের রঙ প্রকাশ পায়, তা হ'লে খুব বেশি আপত্তিকর হবে না।

যাঁরা গুরুপাক গাঢ় দ্রব্যের খদ্দের, যাঁরা প্রজ্ঞা-মদিরার পিপাসু, তাঁরা আমার স্মৃতিকথার মধ্যে তাঁদের পছন্দসই পাকা মালের সন্ধান পাবেন কি না বলতে পারি নে, কারণ জীবনে তেমন ভাবে সাধুসঙ্গ করবার সুযোগও পাই নি, দুস্তর মরু-পর্বত অতিক্রম ক'রে দুর্গম তীর্থভ্রমণও করি নি, আর ভারতবর্ষের সীমান্ত ছাড়িয়ে গিয়ে দেশ-বিদেশের চিন্তা-নায়কগণের সহিত জগৎ-তত্ত্ব ও বিশ্ব-রহস্য সম্বন্ধে সুনিবিড় আলাপ-আলোচনাও চালাই নি। যাঁরা হাল্কা রসের রসিক, অতি-প্রত্যূষের সুমিষ্ট খেজুর রস—যা মত্ততা আনে না, কিন্তু তৃপ্তি দেয়—যাঁরা অবহেলা করেন না, আমাদের প্রতিদিনকার সামান্য এবং সঙ্কীর্ণ জীবন-পরিধিও সমগ্র বিশ্বের একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ ব'লে যাঁদের বিশ্বাস, তাঁদের জন্য আমার এই লেখা। দুনিয়া এমনই আজব জায়গা যে, এমন অনেক ঘটনাও ঘটা সম্ভব যা হনলুলু অথবা কামস্কাটকায় না ঘ'টে আমাদের এই নগণ্য বাংলা দেশে ঘটলেও আমাদিগকে পুলকিত করে, এমন কি, সেই ঘটনাগুলিকে স্মৃতিকথার অন্তর্ভুক্ত করলেও গুরুতর অপরাধ হয় না।

মানুষের স্মৃতি জীবনের কত সুদূর অতীত পর্যন্ত পরিচালিত হ'তে পারে তদ্বিষয়ে বৈজ্ঞানিক তথ্য কি, তা আমি জানি নে। কিন্তু অস্পষ্ট-ভাবে আমার মনে পড়ে সে-সব দিনের কিছু কিছু কথা, যখন আমার বয়স ছিল তিন কিংবা সাড়ে তিন বৎসর। তার পূর্বের কোনো কথাই তেমন মনে পড়ে না, একমাত্র জননীর স্নেহনিষিক্ত মুখাবয়ব ছাড়া। প্রতিদিন নিয়মিত বেশ-কিছুক্ষণ গভীর আনন্দভরে সে মুখ নিরীক্ষণ করার ফলে বোধ হয় তার ছবি মনে রাখবার অভ্যাস আমার মস্তিষ্কের মধ্যে পাকা হ'য়ে গিয়েছিল।

শৈশব ও বাল্যকালের কথা অনেকদিন পর্যন্ত যে সুস্পষ্টভাবে আমাদের স্মৃতি অধিকার ক'রে থাকে, বোধ হয়, তার কারণ, আমাদের মস্তিষ্কের ভিতরকার যে চাকতি (Disc) অথবা কোষের (Cell) উপর ঘটনার রেখাগুলি মুদ্রিত হ'য়ে অবস্থান করে, শৈশব এবং বাল্যকালে সেই কোষ অথবা চাকতিগুলি সর্বাপেক্ষা নরম থাকে ব'লে তাদের উপর চিন্তা অথবা অনুভূতির রেখাও গভীরতম রন্ধ্রে মুদ্রিত হয়, ও সেই কারণে সহজে মুছে যায় না। বয়োবৃদ্ধির সহিত চাকতি অথবা কোষগুলি ক্রমশ কঠিন হ'য়ে আসে। সুতরাং তাদের উপর অনুভূতির ছাপ পড়তে থাকে ক্রমশ অগভীর রন্ধ্রে। সেইজন্য বৃদ্ধবয়সের কথা আমাদের তত মনে থাকে না, যত মনে থাকে তরুণবয়সের কথা।

বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার প্রচেষ্টা এই পর্যন্তই থাক্, এখন যে কথা বলছিলাম তা বলি। আমার যখন তিন অথবা সাড়ে তিন বৎসর বয়স তখন আমরা সাময়িকভাবে কিছুকালের জন্য বাস করছিলাম বেহার প্রদেশের বক্সার শহরে। আমার পিতৃদেব মহেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

মহাশয় পূর্ণিয়ায় চাকরি করতেন। পূর্ণিয়ার ভীষণ ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগে প্লীহা ও যকৃতের সাংঘাতিক বিকার বশত আমার ফুলদাদা নগেন্দ্রনাথের সঙ্কটাপন্ন অবস্থা হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল। হালে পানি না পেয়ে ডাক্তার পরামর্শ দিলেন বায়ু-পরিবর্তনের। অতিশয় স্বাস্থ্যকর স্থান ব'লে তখনকার দিনে বক্সারের প্রসিদ্ধি ছিল। রৌদ্রবায়ুনন্দিত একটি উন্মুক্ত পরিচ্ছন্ন গৃহ ভাড়া নিয়ে আমরা বক্সারে বাস করতে আরম্ভ করলাম।

চাকরির জন্য পিতাঠাকুর মহাশয় বক্সারে বেশি থাকিতে পারিতেন না। পুরুষ অভিভাবক স্বরূপ আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর লালমোহন গঙ্গোপাধ্যায় ও মেজদাদা শ্রীযুক্ত রমণীমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মাঝে মাঝে থাকতেন, কিন্তু কলেজের পড়াশুনার জন্য তাঁরাও সর্বদা থাকতে পারতেন না। সেজন্য অবশ্য বিশেষ কিছু অসুবিধাও ছিল না। আমার মাতাঠাকুরাণী মনোমোহিনী দেবী অতিশয় বুদ্ধিমতী এবং সংসারসুদক্ষা রমণী ছিলেন। মাত্র তাঁর বুদ্ধি, বিচক্ষণতা, সাহস ও কর্মপটুতার উপর নির্ভর ক'রে অমন সঙ্কটাপন্ন রোগী নিয়েও বিদেশে বাস করা চলতে পারত। কিন্তু বক্সারে আমাদের একজন স্থায়ী এবং পাকা পুরুষ অভিভাবকেরও অভাব হয় নি। তিনি কান্তিচন্দ্র ঘোষ, বক্সারের তদানীন্তন সর্বশ্রেষ্ঠ উকিল।

কান্তিবাবু ছিলেন আমাদের পল্লীজামাতা, অর্থাৎ ভাগলপুরের বাঙালীটোলার এক সম্ভ্রান্ত কায়স্থ-পরিবারে তিনি বিবাহ করেছিলেন। সেই সূত্রে তাঁর সহিত আমাদের পরিচয়; আর, সেই পরিচয়ের প্রভাবেই তিনি বাড়ি ভাড়া ক'রে দেওয়া থেকে আরম্ভ ক'রে বক্সারে আমাদের বসবাসের সকল ব্যবস্থা-বন্দোবস্ত ক'রে দিয়েছিলেন। তা ছাড়া প্রতিদিন তিনি নিয়মিতভাবে আমাদের খোঁজ-খবর নিতেন ও দেখাশুনা করতেন।

এ সকল ত গেল শোনা কথা,—শ্রুতি ; স্মৃতি নয়। এবার স্মৃতির কথা বলি। বক্সারের তিনটি কথা আমার মনে পড়ে ; খুব স্পষ্টভাবে না হ'লেও, খুব অস্পষ্টভাবেও নয়।

পরবর্তী কালে ভাগলপুরে কান্তিবাবুর সহিত আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হবার সুযোগ হয়েছিল। কিছুকাল তথায় এক সঙ্গে ওকালতিও করেছিলাম। কান্তিবাবু ছিলেন উদার-হৃদয় খাড়া-স্বভাবের গম্ভীর-প্রকৃতির মানুষ ; কথা কইতেন কম, হাসতেন তার চেয়েও অনেক কম ; আর, কদাচিৎ কখনো যদি হাসতেন, সে হাসির বারো আনা মারা যেত ঘনবিস্তৃত গুম্ফশ্মশ্রুর নিবিড়তার মধ্যে। বক্সারে বাসকালে তরুণ বয়সে গোঁফদাড়ির অত বাড়বৃদ্ধি নিশ্চয়ই হয় নি। কিন্তু গম্ভীরবদন তিনি তখনো ছিলেন, সে কথা সত্য ব'লে ধ'রে নেওয়া যেতে পারে। প্রতিদিন কান্তিবাবু আমাদের বাড়িতে যাতায়াত করতেন, কাজে কাজেই তাঁর মুখ আমার বিশেষ পরিচিত হ'য়ে গিয়েছিল, তাঁর নামও আমি শিখে নিয়েছিলাম। কিন্তু সে-সব দিনের প্রতিদিবসের দেখা তাঁর মুখ আমার একটুও মনে পড়ে না ; শুধু মনে পড়ে একদিনকার অট্টহাস্যনিনাদিত কৌতুকোজ্জ্বল মুখ। বোধ করি, সাধারণ অবস্থা অপেক্ষা ব্যতিক্রমই আমার মনের উপর গভীর ছাপ মেরেছিল। কান্তিবাবু সে হাসির হেতু ছিলাম আমিই। সুতরাং কথাটা একটু খুলে বলি।

চাকরের সহিত আমি মাঝে মাঝে বৈকালের দিকে কান্তিবাবুর বাড়ি বেড়াতে যেতাম। সে-সব সময়ে কান্তিবাবু প্রায়ই কাছারিতে থাকতেন। একদিন সকালের দিকে, বোধ হয় কোনো প্রয়োজন বশত, মাতাঠাকুরাণী আমাদের চাকরকে কান্তিবাবুর বাড়ি পাঠালেন এবং সেই সঙ্গে আমাকেও সাজিয়ে-গুছিয়ে পাঠিয়ে দিলেন। কম্বিনেশন সুট প'রে ফিটফাট সাজগোছ ক'রে কান্তিবাবুর বাড়ি উপস্থিত হ'য়ে

দেখি, প্রশস্ত বারান্দায় মক্কেলদের দ্বারা পরিবৃত হ'য়ে কান্তিবাবু কাজ করছেন। বোধ হয় সে দিন ছুটির দিন ছিল।

আমাকে দেখতে পেয়ে উৎফুল্ল মুখে কান্তিবাবু বললেন, "এস খোকা, আমার কাছে এসে ব'স।" গম্ভীর মুখে আমি তাঁর কাছে গিয়ে তাঁর নির্দেশমতো একটা বেঞ্চে একজন মক্কেলের পাশে বসলাম।

আমার সহিত দু-চারটে কথাবার্তার পর কান্তিবাবু পুনরায় কাজে মন দিলেন এবং মক্কেলদের সঙ্গে কথোপকথনে লিপ্ত হলেন। ক্ষণকাল আমি ধৈর্য ধ'রে নিঃশব্দে ব'সে রইলাম। কিন্তু ক্রমশ বিরক্তি বোধ হ'তে লাগল। মক্কেলদের সঙ্গে আমাকে এমন ক'রে বার-বাড়িতে বসিয়ে রাখার কোনো অর্থই খুঁজে পাচ্ছিলাম না। অগত্যা কথা কইতে বাধ্য হলাম।

"কান্তিবাবু!"

সকৌতূহলে আমার দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে কান্তিবাবু জিজ্ঞাসা করলেন "কি বল ত ?"

"কই, সে সব কিছু হচ্ছে না ?"

"কি সব ?"

"খাওয়া-দাওয়া ?"

আমার এই কথায় কান্তিবাবু সেই অট্টহাসি হেসে উঠেছিলেন, যা আজও আমার স্পষ্টভাবে মনে পড়ে। মক্কেলরাও দেখাদেখি হাসতে আরম্ভ করেছিল। হাসি থামলে আমাকে আশ্বাস দিয়ে কান্তিবাবু বললেন, "নিশ্চয় খাওয়া-দাওয়া হবে।" তারপর চাকর ডেকে খাবার দেবার কথা ব'লে দিয়ে আমাকে অন্দর-মহলে পাঠিয়ে দিলেন।

অন্দর-মহলের প্রতি আমার আস্থা ছিল। বোধ হয় সেখানে সুখাদ্য সামগ্রীর অভাব ছিল না, আর মক্কেলরূপী অবান্তর বস্তুর একান্ত অভাব

ছিল, সেই দুই অভিজ্ঞতার ফলে। মক্কেলদের মধ্যে শুকনা ডাঙায় বসিয়ে রেখেই কান্তিবাবু হয়ত আমাকে বাইরে বাইরে বিদায় করবেন, সেই ভয় থেকে অব্যাহতি লাভ ক'রে আশ্বস্ত চিত্তে অন্দর-মহলের দিকে অগ্রসর হলাম।

সেদিন কান্তিবাবুর হাসি দেখে আমি কতটা লজ্জিত হয়েছিলাম তা জানি নে, কিন্তু প্রচুর বিস্মিত হয়েছিলাম বোধ হয় এই কথা ভেবে যে, এমন নির্বিকার খোলের মধ্যেও এমন হাসির তুবড়ি থাকতে পারে!

বক্সারের দ্বিতীয় কথা—তিনটি তালগাছের কথা। আমাদের বাড়ির সদর দরজা নিষ্ক্রান্ত হ'য়েই ডান দিকে এই তিনটি সমবয়সী এবং সমদৈর্ঘ্যের তালগাছ যেন নিবিড় সৌহার্দ্যে পরস্পরের অতি কাছাকাছি তেড়া-বেঁকাভাবে দাঁড়িয়ে মাথা-নাড়ানাড়ি করত। তাদের মাথা-নাড়ানাড়ি দেখে আমার মনে হ'ত, সে যেন শুধু মাথা-নাড়ানাড়িই নয়, কথা-কওয়াকয়িও বটে। বাড়ির ভিতরের বারান্দা থেকেও তালগাছ তিনটির মাথা দেখা যেত। দিনের বেলায় সবুজ চেরা পাতার তালগাছ ব'লে তাদের চিনতে একটুও ভুল হ'ত না; সন্ধ্যা হ'লে কিন্তু মনে হ'ত তারা যেন তিনটে বিকট দৈত্যের মাথা। স্বপ্নে তাদের কি-রকম মূর্তি দেখতাম তা জানি নে; কিন্তু সকালবেলা ঘুম ভেঙে উঠে বারান্দায় বেরিয়ে এসে দেখতাম, তারা আবার সবুজ পাতার তালগাছ হ'য়ে সোনালী রৌদ্রকিরণে ধীরে ধীরে মাথা নাড়ছে। সন্ধ্যাকালের দৈত্যদের কোনো চিহ্নই তাদের মধ্যে খুঁজে পেতাম না।

ফুলদাদার কথা বক্সারের তৃতীয় কথা, যা আমার এখনো মনে আছে। বক্সারের স্বাস্থ্যকর জল-বায়ু ডাক্তার-বৈদ্যদের সুচিকিৎসা এবং প্রাণপণ চেষ্টা, আত্মীয়-স্বজনের নিরবসর সেবা ও পরিচর্যা এবং কান্তিবাবুর বিচক্ষণ তত্ত্বাবধান কিছুই ফুলদাদাকে আটকে রাখতে পারলে না।

একদিন রৌদ্রস্নাত ঝলমলে প্রভাতে আমাদের পরিত্যাগ ক'রে চ'লে গেলেন—চোদ্দ বৎসর বয়সের ফুটফুটে বালক, পূর্ণিয়া গভর্নমেণ্ট স্কুলের সর্বশ্রেষ্ঠ ছাত্র, বাপ-মার নয়নের মণি। ফুলদাদার নিয়মিত ডায়রি লেখার অভ্যাস ছিল,—বক্সারে অবস্থানকালেও তিনি ডায়রি লিখেছিলেন। বড় হ'য়ে আমরা মুক্তার মতো অক্ষরে লিখিত সেই ডায়রি পাঠ ক'রে মুগ্ধ হয়েছি। সে ডায়রির একখানা ছিন্ন পাতাও আজ নেই। ধীরে ধীরে কেমন ক'রে ক্রমশ তা অবলোপের অন্ধকার গুহায় প্রবেশ করল, তা কেউ বলতে পারে না। থাকলে আমাদের পরিবারের একটা মূল্যবান সম্পদ হ'ত।

ফুলদাদার মৃত্যু-দিবসের কোনো কথা আমার একটুও মনে পড়ে না, —এমন কি, কান্নাকাটির কথাও নয়। বোধ হয় বিপদের মুহূর্ত আসন্ন দেখে আমাকে কান্তিবাবুর বাড়ি সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। একখানা সবুজ রঙের র‍্যাপার গায়ে জড়িয়ে ফুলদাদা নিত্য বারান্দায় রৌদ্র কিরণে ব'সে বহুক্ষণ ধ'রে মুখ ধুতেন, আমার শুধু মনে পড়ে তাঁর সেই রুগ্ন কৃশ ফুটফুটে চেহারাখানি। তখন সে কথা নিশ্চয়ই মনে হ'ত না,—এখন কিন্তু ফুলদাদার ক্লান্ত-পাণ্ডুর মুখখানি মনে পড়লেই মনে হয়, সেই সুন্দর মুখখানির উপর যেন মৃত্যুর নিশ্চিত নীলাভ ছায়া ক্রমশ ঘনিয়ে আসছিল।

আমাদের বিপদের বন্ধু কান্তিবাবু যিনি আমাদের বক্সারের বাসা বেঁধে দিয়েছিলেন, তিনিই পুনরায় সেই বাসা ভাঙার দুঃখময় কার্যে সচেষ্ট হলেন। মার মুখে শুনেছি, ফুলদাদার মৃত্যুকালে কান্তিবাবু শোকে অধীর হ'য়ে রোদন করেছিলেন। একটি মৃত্যুপথযাত্রী শরণাগত বালককে রক্ষা করার জন্য যে চেষ্টা তিনি কায়মনোবাক্যে করেছিলেন, তা অসার্থক হওয়ার দুঃখ তাঁকে গভীরভাবে আহত করেছিল।

কান্তিবাবুর চেষ্টায় সংসার গুটিয়ে দিন দুয়েকের মধ্যে পুনরায় আমরা বক্সার রেল-স্টেশনের অভিমুখে অগ্রসর হলাম। আমার মাতাঠাকুরাণী শোকে ধৈর্যশীলা রমণী ছিলেন,—আমাকে বুকে জড়িয়ে তিনি ভাগলপুরের পথে ফিরে চললেন। পশ্চাতে প'ড়ে রইল বক্সারের শ্মশানঘাটে তাঁর জীবনের আনন্দ, হৃদয়ের নিধি নগেনের সুকুমার দেহের ভস্মাবশেষ।

৩

মাতাঠাকুরাণীর দুঃসহ পুত্রশোক যথাসম্ভব লাঘব করবার উদ্দেশ্যেই বোধ হয় কয়েক মাস পরেই পিতাঠাকুর মহাশয় দাদার বিবাহ দিলেন।

মাঘ মাস,—ভাগলপুরের দুর্জয় শীতের এক গভীর রাত্রে নববধূ এলেন ব্যাণ্ড বাজিয়ে আতশবাজি পুড়িয়ে, প্রচণ্ড হৈ-হল্লার মধ্য দিয়ে। বধূর পিত্রালয় পাটনায়।

পাটনার বিহার সার্ভে স্কুলের হেডমাস্টার কুড়ারাম রায় কন্যার পিতা। এই কুড়ারামবাবু অতিশয় উদারহৃদয়, পরিহাসরসিক, সঙ্গীতপ্রিয় এবং সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। বহুবিধ গুণের বলে ক্রমশ ইনি আমাদের সংসারে কুটুম্ব হ'তে আত্মীয়ের পর্যায়ে প্রবিষ্ট হয়েছিলেন। আমাদের গৃহে তিনি আগমন করলেই আবালবৃদ্ধবনিতার মধ্যে একটা উল্লাস প'ড়ে যেত। মুখে তাঁর সর্বদা লেগে থাকত কোন-না-কোন গানের মৃদু গুঞ্জন। হাসির গল্পের তাঁর ছিল অফুরন্ত ভাণ্ডার,—এবং সেই সব গল্প অদ্ভুতভাবে সরস ক'রে বলবার ছিল অসাধারণ ক্ষমতা। একটা নমুনা দিই।

এক ছিলেন পণ্ডিত মহাশয়। সংস্কৃত ভাষায় তাঁর যত না ছিল বিদ্যা, দাপট ছিল তাঁর দশগুণ বেশি। একদিন পণ্ডিত মশায়ের খড়ের ঘরের মটকায় আগুন লেগেছে। ব্যস্ত হ'য়ে চালের উপর আরোহণ ক'রে পণ্ডিত মশায় অগ্নি নির্বাপিত করবার জলের জন্য পাঁচী নামক তাঁর এক পরিচারিকাকে আহ্বান করছেন। 'পাঁচি, পঞ্চি, প্রপঞ্চি, পঞ্চাননি, বারি আনয়।' অর্থাৎ, পাঁচি, পঞ্চি, প্রপঞ্চি, প্রঞ্চাননি, জল আনো। পাঁচীও যোগ্য পণ্ডিতের সুযোগ্য পরিচারিকা। পণ্ডিত মশায়ের কাছে

থেকে থেকে সে সংস্কৃতভাষা খানিকটা আয়ত্ত ক'রে নিয়েছিল। সে উত্তর দিলে, 'ভট্টাচার্য! শিরোধার্য! আচার্য! পরমগুরো! গঙ্গোদকং বা কূপোদকং?' অর্থাৎ গঙ্গার জল আনব অথবা কুয়ার জল? এদিকে সংস্কৃত ভাষায় বিলম্বিত আলাপ-আলোচনার সুযোগে পণ্ডিত মশায়ের কাছায় ততক্ষণে আগুন ধ'রে গিয়েছে। জলের জন্য আর অপেক্ষা করা বিপজ্জনক বিবেচনা ক'রে তিনি 'বাপ' ব'লে লাফ দিয়ে উঠানে প'ড়ে পা ভাঙলেন। গল্প ত এই সামান্য,—কিন্তু এই গল্প তিনি যতবার বলতেন, ততবারই আমাদের প্রথম-শোনার মতো ভাল লাগত।

যে কথা বলছিলাম, তাই বলি। যে রাত্রে নববধূ আমাদের গৃহে পদার্পণ করলেন, সেদিন লোকজনের ভিড়ে, বরণ এবং অপরাপর অনুষ্ঠানের হাঙ্গামায় নববধূকে ভাল ক'রে দেখবার সুযোগ পেলাম না। তা ছাড়া, চার বৎসরের বালকের অর্ধরজনীর ঘুমভাঙা চোখে নিদ্রা ঘনিয়ে এসে তাকে যদি লেপের মধ্যে টেনে নিয়ে গিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিয়ে থাকে ত বিস্ময়ের কিছু ছিল না।

রাত্রি জাগরণের জন্য প্রভাতে ঘুম ভাঙতে বিলম্ব হ'য়ে গিয়েছিল। তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বারান্দায় বেরিয়ে এসে নববধূর কমনীয় কান্তি দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল। বারান্দায় এক জায়গায় সাজিয়ে-গুছিয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ক'রে বউদিদিকে বসিয়ে রাখা হয়েছে। উগ্র গৌরবর্ণ সুগঠিত দেহ, সুশ্রী মুখাবয়ব; মুখে হাসি ও লজ্জার ভাগাভাগি খেলা। মাতাঠাকুরাণী ঘুরে-ফিরে এসে বধূর চিবুক স্পর্শ ক'রে আদর করেন, আবার দু চোখ ভ'রে অশ্রুর বন্যা নামবার উপক্রম করলে তাড়াতাড়ি স'রে পড়েন।

তেড়ে-ফুড়ে এগিয়ে গিয়ে বধূর সঙ্গে খুব সংক্ষিপ্ত একটা আলাপ করলাম। বউদিদি আমাকে পাশে বসিয়ে আদর করলেন, কিন্তু ইতরজনের সংখ্যাধিক্যবশত আলাপ তেমন জমল না।

মাঝে মাঝে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করি, কিন্তু অবান্তর লোকের ব্যূহ ভেদ ক'রে যথাস্থানে উপনীত হ'তে পারি নে। আমাদের ভাগলপুরের গাঙুলী-পরিবারে তখন তিন কর্তা, পাঁচ গৃহিণী ও তাঁদের পুত্রকন্যা নাতি-নাতনীর সুবৃহৎ সংসার। বউদিদির সমবয়সী মেয়ে আমাদের বাড়িতেই বোধ হয় আট-দশ জন; তা ছাড়া, পাড়া থেকে নিরবসর আমদানি আছেই। আমাদের গৃহখানি ঠিক যেন লঙ্কাপুরীর অশোক-বন হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। বউদিদি সর্বদা চেড়ীবেষ্টিতা সীতার মতো ব'সে আছেন। চেড়ীগণের সুদৃঢ় প্রাকার ভেদ করে কার সাধ্য! আমাকে ত তারা পাত্তাই দেয় না, তাদের মতে আমি নিতান্তই নগণ্য। তাদের মুখের বুলি,—খোকা, তুমি এখানে কি করছ? যাও, খেলা করগে। তারা জানে না, চার বৎসর বয়সের কতকটা-প্রাচীন খোকার মনে তখন ব্যক্তিত্ব অঙ্কুরিত হ'তে আরম্ভ করেছে। তা ছাড়া, এ কথাও তারা বোঝে না যে, যে রকম ক'রেই হোক ফুলদাদাকে পাকাপাকিভাবে হারানো গেছে এই ধারণার বশবর্তী হ'য়ে খোকার মনে একটা যে দুঃসহ ক্ষোভ বাসা বেঁধে আছে, এই নববধূটি তার কতটা সান্ত্বনা।

ভাগলপুরে বউদিদির সঙ্গে তেমন আলাপ জমল না। জমল বৎসর খানেক পরে পূর্ণিয়ায় বউদিদি যখন আমাদের বাড়ি কতকটা স্থায়ীভাবে ঘর করতে এলেন। আমি ও আমার দুই বৎসরের জ্যেষ্ঠা সহোদরা সারোজিনী-দিদি বউদিদিকে প্রায় একচেটে ক'রে ফেললাম। এখানে অবশ্য চেড়ীগণের তেমন দৌরাত্ম্য ছিল না, কিন্তু আর এক বিপদ ছিল; সুযোগ পেলেই দাদা বউদিদিকে আমাদের কাছ থেকে হরণ করতেন। যে ক'রেই হোক আমরা বুঝেছিলাম, বউদিদির উপর দাদার একটা বিশেষ অধিকার আছে; কিন্তু তথাপি মনে মনে যে দাদার উপর একটু বিদ্বেষপরায়ণ হ'য়ে

উঠেছিলাম, সে কথা অস্বীকার করলে সত্যের অপলাপ হবে। দাদার কলেজ খুললে আমরা নিৰ্বিঘ্ন হতাম।

সন্ধ্যাকালে শাঁখ বাজানো, প্রদীপ দেখানো হ'য়ে গেলে বউদিদি আমাদের দুজনকে দুই পাশে নিয়ে নিজ কক্ষের পালঙ্কের উপর শয়ন ক'রে নানাপ্রকার কৌতুকজনক গল্প শোনাতেন। সে সব গল্প তাঁর পিতার নিকট শেখা। গল্পগুলি আমাদের খুবই ভাল লাগত, কিন্তু সব চেয়ে ভাল লাগত ইংরেজী বর্ণমালার অনুক্রমে হোমিওপ্যাথিক ঔষধের নামকথন। বউদিদি যখন বলতেন, অ্যাকোনাইট বেলেডোনা ক্যামোমিলা ডাল্কামারা ইউফ্রাইটিস ফেরমফস ইগ্নেশিয়া, তখন আমাদের দুই ভাইবোনের বিস্ময়ের পরিসীমা থাকত না এই কথা ভেবে যে, বারো-তেরো বৎসর বয়সের একটি ক্ষুদে বালিকার পেটে এত বিদ্যে কি ক'রে ঢোকে! তারপর যখন বউদিদি আর একটি হোমিওপ্যাথিক ঔষধের নাম ক'রে বলতেন, রস্‌টক্স্‌ লিকডনড্রন, তখন আমরা ভাবতাম, নাঃ, এবার চূড়ান্ত হয়ে গেল! এর পর আর কিছু থাকতে পারে না। বউদিদির পিতা গৃহচিকিৎসক হিসাবে হোমিওপ্যাথিক শাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করেছিলেন। তাঁরই নিকটে বউদিদি হোমিওপ্যাথিক ঔষধের নামগুলি শিখেছিলেন।

বউদিদির নাম ছিল মৃদুমতী। অভিধানে মৃদুমতীর কি অর্থ লেখে তা আমি ঠিক জানি নে, কিন্তু আমাদের মানসিক অভিধানে মৃদুমতীর অর্থ ছিল বুদ্ধিমতী। প্রখর বুদ্ধিশালিনী ছিলেন তিনি। বহু চাণক্য এবং উদ্ভট শ্লোক তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল। আমরা একটু বড় হ'লে সেই সকল শ্লোক আমাদের কাছে আবৃত্তি ক'রে এবং তার অর্থ বুঝিয়ে দিয়ে আমাদের মুগ্ধ করতেন।

আমি যখন স্কুলের উপর-ক্লাসে ও কলেজে পড়ি, তখন আমার কবিতা

রচনার ব্যাধি ছিল। আমার বেশ মনে পড়ে, তিনখানা বাঁধানো খাতা আমার রচিত কবিতায় পূর্ণ হ'য়ে গিয়েছিল। 'ভারতী' এবং অপরাপর মাসিক পত্রিকায় মধ্যে মধ্যে আমার রচিত কবিতা প্রকাশিত হ'ত। আমার বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে এখনো অনেকের ধারণা, কবিতা রচনার পথ পরিত্যাগ ক'রে আমি ভুল করেছি। হয়ত করেছি,—কিন্তু সে জন্য মনে বিশেষ দুঃখ নেই, কারণ জীবনে তদপেক্ষা গুরুতর আরও অনেক ভুল করা গেছে।

বউদিদি আমার প্রতি অতিশয় স্নেহশীলা ছিলেন; আর, সেই উগ্র অবুঝ স্নেহই বোধ হয় আমার রচনার প্রতি, বিশেষত আমার কবিতার প্রতি, তাঁর অন্ধ অনুরাগ সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিল। আমার বহু কবিতা তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল। তিনি যখন সেই কবিতাগুলি উৎফুল্লভাবে আবৃত্তি করিতে থাকতেন তখন আমাদের মনে হ'ত, আমার কবিতা রচনা নিতান্তই অসার্থক হয় নি। একটি কবিতা যা তিনি প্রায়ই আবৃত্তি করতেন, তার মাঝের কয়েক ছাত্র আমার মনে আছে—

হালভাঙা তরী পাল নাই ব'লে
অসহায় তাই স্রোতমুখে চলে,
ডুবে বুঝি হায়! ডুবে পলে পলে,
নাহি কূল, নাহি তীর ভাই!
শুধু চারিধারে নীল জলরাশ,
ছলছলি' কহে ছলনার ভাষ;
বলে, চল্ চল্ সাগরেতে চল্,
তীরের তরণী হেথা নাই!
সুদূরের দিকে হেরি অনিমিখে,
কিনারার দেখা নাহি পাই!

আমার কবিতা সম্বন্ধে বউদিদির নিকট হ'তে যে সার্টিফিকেট পেয়েছিলাম তা এতই পক্ষপাতদোষে দুষ্ট যে, তা পরিপাক করতে আমারই বেদনা বোধ হ'ত। সেই সার্টিফিকেটের মর্ম যদি এখানে প্রকাশ ক'রে বলি, তা হ'লে বাংলা দেশের কবিসম্প্রদায় হয়ত আমাকে ঢিল-পেটা করবেন। সে যা হোক, সাহিত্য সাধনা সম্বন্ধে আমি যদি কারো কাছে উৎসাহ পেয়ে থাকি তা হ'লে বউদিদি তাঁদের মধ্যে অন্যতমা এবং ন্যূনতমা নিশ্চয়ই নন, সে কথা এখানে সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্বীকার ক'রে রাখলাম।

কবিতার প্রসঙ্গে ভাগলপুরের একটি আট-নয়-বৎসর বয়সের বালিকার কথা মনে প'ড়ে গেল,—তার কথা একটু বলি। অত ছোট একটি মেয়ের মধ্যে একটা অদ্ভুত হিল্লোলিত ছন্দের আবির্ভাব কিরূপে হয়েছিল, এখন সে কথা ভেবে আশ্চর্য হই; কিন্তু তখন একত্রে আমরা তিন ভাই, অর্থাৎ সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, খ্যাতনামা গল্পলেখক গিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও আমি সেই ছন্দের উৎপাতে নাজেহাল হয়েছিলাম।

আমার তখন বৎসর বারো বয়স। আমরা উক্ত তিন ভাই বয়সে কাছাকছি ত ছিলামই, কিন্তু মনের মধ্যে ছিলাম আরও বেশী কাছা-কাছি। সুতরাং আমরা তিনজনে থাকতাম সর্বদা পাশাপাশি। আমাদের তিনজনের 'কর্মনাশা জোট' ভাঙবার জন্য বয়োজ্যেষ্ঠগণ সর্বদা সচেষ্ট থাকতেন, কিন্তু মোটের উপর তাঁরাই হার মানতেন বেশী। কোনো কাজের ভার আমাদের মধ্যে একজনের উপর অর্পিত হ'লে আমরা তিনজনে একত্রে সে কাজে লেগে পড়তাম; আবার এমন কোনো কাজের ভার যদি আমাদের পড়ত যা চারজন মিলে করবার কথা, তা হ'লে চতুর্থ ব্যক্তিকে নিষ্কাশিত ক'রে দিয়ে আমরা তিনজনেই সে কাজ শেষ করতাম। এই কারণে আমাদের বয়োজ্যেষ্ঠদের মধ্যে কেউ

কেউ আমাদের তিনজনকে ব্যঙ্গচ্ছলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর আখ্যা দিয়েছিলেন।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর কিন্তু ক্ষত-বিক্ষত হ'য়ে উঠেছিল ঐ আট-নয় বৎসর বয়সের মেয়েটির কাব্যশরাঘাতে। শর অতি সংক্ষিপ্ত হ'লেও ছন্দে ও মিলে নিখুঁত, কিন্তু অর্থ বিশেষ প্রাঞ্জল নয় ব'লে তীক্ষ্ণতায় নির্মম। যে জিনিসের অর্থ স্পষ্ট বোঝা যায়, সে জিনিস স্পষ্টই বুঝি; কিন্তু যে জিনিস স্পষ্ট বোঝা যায় না, তার মধ্যে আশ্রয় বাঁধবার সুবিধা পায় যত সন্দেহ আর সংশয়। দুষ্ট বললে বুঝি, দুষ্ট পর্যন্তই বললে; কিন্তু ঘুষ্ট বললে মনে হয় বুঝি দুষ্টকেও ছাড়িয়ে আরও কিছু বললে।

মেয়েটি আমাদের প্রতিবেশিনী, খুব নিকটেই একটি গৃহে বাস করত। আমাদের গৃহ হ'তে পথ নিষ্ক্রান্ত হ'লে অব্যবহিত উত্তরে ভাগীরথী নদী; একমাত্র গঙ্গাস্নান করা ছাড়া সংসারের দৈনন্দিন যাবতীয় কাজ করতে হ'ত দক্ষিণ দিকের পথ ধ'রে। সুতরাং দিনের মধ্যে কয়েকবারই সেই মেয়েটির বাড়ির সম্মুখ দিয়ে যেতে-আসতে বাধ্য হতাম। যেতাম অবশ্য আমরা যথেষ্ট সতর্ক হ'য়ে; চতুর্দিক দেখে-শুনে সে বাড়িটার সমানে পৌঁছে চোঁ দৌড় মারতাম,—কিন্তু তাতেই কি রক্ষা পাবার জো ছিল? গেটের পাশে লতাপাতার আড়ালে কোথায় যে মেয়েটি অদৃশ্য হ'য়ে লুকিয়ে থাকত, যথাসময়ে ধাঁ ক'রে সামনে বেরিয়ে এসে অব্যর্থ লক্ষ্যে নিক্ষেপ করত তার কাব্যবাণের অস্ত্র—

উপেন পণ্ডিত ধুন্ধব ধণ্ডিত!

আমার চেয়ে বয়সে অন্তত বছর দুয়েকের ছোট এক বালিকার নিকট হ'তে অযথা পণ্ডিত আখ্যার সহিত অজ্ঞানা ভাষার 'ধুন্ধব ধণ্ডিত' লেজুড় লাভ ক'রে অতিশয় অপমানিত বোধ করতাম। প্রতিবাদস্বরূপ পিছন ফিরে মুষ্টি-আস্ফালন দেখাতাম, কিন্তু সে প্রতিবাদ ব্যর্থ হ'য়ে রাজপথের

বায়ুমণ্ডলীর মধ্যে মিলিয়ে যেত। বালিকা নির্বিকার মুখে লতাকুঞ্জের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করত।

ছন্দের দ্বিতীয় আয়ুধটি ছিল আরও গোলমেলে, সেইজন্য আরও মর্মান্তিক। আর, ঘটনাচক্রেই হোক, অথবা অপর যে-কোনো কারণেই হোক, সেটি নিক্ষিপ্ত হ'ত প্রধানত বেচারা গিরীনের উপরেই বেশী। গিরীন ছিল আমাদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ এবং ভালমানুষ; সে হয়ত কতকটা অতর্কিতে কিছু ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্ক হ'য়ে চলেছে সেই বাড়ির সম্মুখ দিয়ে, এমন সময়ে কর্ণে এসে বিদ্ধ হ'ল—

গিরীন ভদৈয়া ধুন্ধব ধৈয়া!

সচকিত হ'য়ে গিরীন মারত দৌড়, বোধ হয় পুনরাঘাতের ভয়ে; কিন্তু মেয়েটির মধ্যে কয়েকটি বীরজনোচিত ভদ্রতা ছিল। প্রথমত, পুনরাঘাত সে কখনো করত না; ঐ একবারের মারে যা-কিছু হবার তা হ'ল। মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা সে পছন্দ করত না। দ্বিতীয়ত, ছন্দের মার মারবার পর তার মুখে বিদ্রূপ অথবা অবজ্ঞা, এমন কি, কৌতুকের নিঃশব্দ হাসিও দেখা যেত না। বোধ হয় সে মনে করত, বোমা ফাটাবার পর তুবড়ি ফোটানোর কোনো অর্থ হয় না।

আমাদের তিন ভাইয়ের প্রতি ছন্দের বাণ প্রয়োগ করার বিষয়ে মেয়েটির একটি পদ্ধতি লক্ষ্য করা যেত। 'ভদৈয়া'-বাণ সুরেনদাদার প্রতি সে কদাচিৎ প্রয়োগ করত; আমার প্রতি করত মাঝে মাঝে; কিন্তু গিরীনের প্রতি সদা-সর্বদা। এজন্য গিরীনের মনে মনে বেশ একটু ক্ষোভ ছিল। ব্যঙ্গচ্ছলে ব্যবহার করলেও পণ্ডিতের নিকৃষ্টতম অর্থ হয় মূর্খ; কিন্তু ভদৈয়া এমন এক অজানা বস্তুর বিবর, যার-মধ্যে অপমানের যে-কোনো সাপ-ব্যাঙ বাস করতে পারে। কথনো কদাচিৎ মেয়েটি গিরীনকে 'গিরীন পণ্ডিত' বললে গিরীন মনে মনে একটু খুশিই

হত। কথাটা কোনো ছলে-ছুতোয় সে আমাদের শুনিয়ে দিত, "আজ আমাকে ও 'গিরীন পণ্ডিত ধুন্ধব ধণ্ডিত' বলেছে।"

যে কারণেই হোক, সুরেনদাদার পণ্ডিত্য সম্বন্ধে মেয়েটির আস্থা ছিল; সে সুরেন পণ্ডিত ভিন্ন সহজে সুরেনদাদাকে ভদৈয়া বলত না।

মেয়েটির পরবর্তী ইতিবৃত্ত কি তা জানি নে, কিন্তু অতি অল্পবয়সে সে যেরূপ ছন্দ রচনার ক্ষমতা দেখিয়েছিল তাতে যদি হঠাৎ অবগত হই যে, আমাদের বাংলা দেশে কোনো সুবিখ্যাত মহিলা-কবি ভাগলপুরের সেই নয় বৎসরের মেয়েটি, তা হলে আশ্চর্য হব না।

৪

প্রতি বৎসর আমরা নিয়মিত দুবার পূর্ণিয়া থেকে ভাগলপুরে আসতাম; একবার পূজার ছুটিতে, আর একবার ফাগুন চৈত্র মাসে বাসন্তী বারোয়ারি পূজার সময়ে। ভাগলপুরে আসবার প্রধান কারণ ছিল দুটি; প্রথমত, বাড়ি আসা এবং ঘরের জগদ্ধাত্রী পূজায় উপস্থিত থাকা,—দ্বিতীয়ত, স্বাস্থ্যকর স্থানে কিছুকাল বাস ক'রে পূর্ণিয়ার ম্যালেরিয়া আক্রমণের চোট খানিকটা সামলে নেওয়া। ভাগলপুরের বারোয়ারি পূজা দেখবার পিতাঠাকুর মহাশয়ের প্রবল আগ্রহ ছিল; প্রতি বৎসর সেই সময়ে তিনি দিন পনের-কুড়ির ছুটি নিয়ে সপরিবারে ভাগলপুরে আসতেন। ছুটি ফুরলে তিনি পূর্ণিয়ায় ফিরে যেতেন; আমরা অনেক সময়ে আরও কিছুদিন ভাগলপুরে থেকে যেতাম।

তখনকার দিনে পূর্ণিয়া থেকে ভাগলপুর যেতে হ'লে কাটিহার, মণিহারীঘাট, সকরিগলিঘাট ও সাহেবগঞ্জ জংশন হ'য়ে রেল ও ষ্টিমার-যোগে যেতে হ'ত পূর্ণিয়ায়। রেল হবার আগে ভাগলপুর যেতে হ'ত ভাগীরথীর উত্তর তীরে উত্তর ভাগলপুর ও দক্ষিণ ভাগলপুরের মধ্যে কাড়াগোলাঘাট হ'য়ে। সে সময়ে কাড়াগোলাঘাট আমদানি-রপ্তানির একটা বিখ্যাত বন্দর ছিল।

পূর্ণিয়া শহর থেকে দুই ঘোড়ার সিক্রাম গাড়ি চ'ড়ে বিউগ্‌ল্ বাজাতে বাজাতে দার্জিলিং-হিমালয়ান রোড দিয়ে উনিশ-কুড়ি মাইল পথ কাড়া-গোলায় যাওয়া, সে এক ভারি জবর ব্যাপার ছিল। তারপর, বৃহৎ পালোয়ার নৌকায় জিনিসপত্র সহ সওয়ার হয়ে বীচিবিক্ষুব্ধ ভাগীরথীর

বক্ষ ভেদ ক'রে সাহেবগঞ্জ ঘাটে পৌছানো,—সে ত সাত সাগরের দেশে পাড়ি-জমানোর একটা উপক্রমণিকার মতোই মনে হ'ত।

কাড়াগোলার পথে আমার জ্ঞানকালে আমি ভাগলপুর গিয়েছিলাম অন্তত একবার, দুটো কারণে সে কথা নিশ্চয় ক'রে বলতে পারি। দার্জিলিং-হিমালয়ান রোডের এক জায়গায় একটা পুল বেমেরামত হওয়ার দরুন মুটের মাথায় জিনিসপত্র চাপিয়ে পরপারে অপর সিক্রামে গিয়ে আমাদের উঠতে হয়েছিল, সে কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে। আর মনে আছে, কাড়াগোলাঘাটে উপনীত হ'য়ে প্রখর রৌদ্র-কিরণে ভাগীরথী-বক্ষে কোটি কোটি উজ্জ্বল মণি-মুক্তার যে অপূর্ব ঝিকিমিকি খেলা দেখেছিলাম তার কথা। বহুদিন গঙ্গাতীরে বাস করেছি, গঙ্গাবক্ষে বিচরণ-করার অভিজ্ঞতাও নিতান্ত কম হয় নি, কিন্তু সেদিন যেমন ভাগীরথীবক্ষে মৃদু তরঙ্গের শীর্ষে বিচূর্ণ আলোকের লীলা দেখে চমৎকৃত হয়েছিলাম, তেমন বোধ করি আর কোনও দিন হয় নি।

বাল্যকালে যখন আমরা বারোয়ারি পূজা দেখেছি ভাগলপুরে, তখন বাঙালীদের প্রচণ্ড রোয়াব। জন দুই-তিন উচ্চ ইংরেজ রাজকর্মচারী ব্যতীত হাকিম-হোমরা প্রায় সবই বাঙালী—রেলে, ডাকঘরে, পুলিসে, সর্বত্রই বাঙালীর প্রভুত্ব। উকিলকের অধিকাংশই, এবং উপর দিকে বাঘা-ভালুকা প্রায় সব বড় বড় উকিলই বাঙালী। কলেজের অধ্যক্ষ ও অধ্যাপক, ইস্কুলের হেডমাস্টার ও অধিকাংশ শিক্ষকও বাঙালী। হাতীর মতো বড় বড় ওয়েলার ঘোড়ার জুড়ি হাঁকিয়ে রাজপথ দিয়ে গম্‌গম্‌ ক'রে বিহারী জমিদারগণ বেড়াতে যান—পথে ভদ্রবেশধারী কোনো অপরিচিত বাঙালীকে দেখলে হাত তুলে অভিবাদন ক'রে রাখেন, কে জানে যদি কোনো সদ্যাগত হাকিম-টাকিমই হন, ভবিষ্যতে অভিবাদনটা কাজে লাগতে পারে।

বারোয়ারি পূজার চাঁদা বাঙালী সম্প্রদায়ের মধ্যে থেকে ভালই উঠত ; কিন্তু মোটা মোটা চাঁদা উঠত উগ্রমোহন ঠাকুর, প্রাণমোহন ঠাকুর, রাজ বনেলী, তেজনারায়ণ সিং প্রমুখ আরও অনেক বড় বড় জমিদার ও ব্যবসায়ীগণের নিকট হ'তে। গৃহবিবাদ ও মামলা-মকদ্দমার ফলে তখনো ভাগলপুর জেলার বিহারী জমিদারগণ বিশীর্ণ হ'য়ে যান নি,—চাঁদার খাতা সম্মুখে উপস্থিত হ'লে তাঁরা উদার-উন্মুক্ত হস্তে চাঁদা দিতেন। বিশেষত পূজা-কমিটীর সদস্যদের শীর্ষদেশে যদি কোনো উচ্চ রাজকর্মচারীর নাম থাকত, তা হ'লে অর্থ ক্ষরিত হ'ত গাঢ় প্রবাহে এবং অবলীলাক্রমে। কিন্তু সে যাই হোক, তখনকার দিনের বিহারীগণ পূজা-পার্বণে উৎসব-আনন্দে বাঙালীদের সহিত সর্বান্তঃকরণে যোগ দিতেন, সে কথা স্বীকার করতেই হবে।

অর্থের প্রাচুর্যবশত বিশেষ ধুমধামের সহিত বারোয়ারি পূজা অনুষ্ঠিত হ'ত। এত প্রকারের আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা থাকত যে, কয়েকদিন স্নানাহারের অবসর পাওয়া যেত না। সকালে ফুল তোলা, বেলপাতা বাছা থেকে আরম্ভ ক'রে পূজার নানাবিধ উদ্যোগ-আয়োজন ; বেলা দশটা আন্দাজ একদফা পুতুল নাচ ; মধ্যাহ্নে দেবীপূজা এবং অন্ন-ব্যঞ্জন-মিষ্টান্নের প্রসাদ ভোজ ; সায়াহ্নে দ্বিতীয় দফা পুতুল নাচ ; তৎপরে আরাত্রিক , আরাত্রিকের পর চণ্ডীর গান অথবা কীর্তন ; কীর্তনের পর রাত্রি দশটা হ'তে পরদিন বেলা সাতটা সাড়ে সাতটা পর্যন্ত যাত্রাগান। অর্থাৎ চব্বিশ ঘণ্টার প্রায় নিচ্ছেদ একটি আনন্দচক্র।

তৎকালীন সুপ্রসিদ্ধা কীর্তনগায়িকা পান্নাসুন্দরী আসতেন দুই রাত্রির ফুরনে কীর্তন গাইবার জন্য ; দেশপ্রসিদ্ধ মতি রায়ের দল আসতেন যাত্রা গাইতে ; কৃষ্ণনগর থেকে বিখ্যাত মূর্তিশিল্পী শশিভূষণ পাল আসতেন প্রতিমা, সঙ এবং পুতুল নাচের পালা গড়বার জন্য।

এই প্রসঙ্গে একটা কৌতুকজনক ঘটনা বলবার লোভ সম্বরণ করতে পারলাম না।

সারা রাত্রি যাত্রা চলেছে; ভোরের দিকে জমেছে অসম্ভব রকম। প্রাচীন মাতব্বরগণ, যাঁরা রাত্রি-জাগরণের চোট সহ্য করতে পারেন না, শেষ রাত্রি চারটা সাড়ে চারটা থেকে এসে সভা জাঁকিয়ে বসেছেন। আসরে তিল ধারণের স্থান নেই। প্রতিমার দিকে এবং চিক-ঘেরা মেয়েদের দিক ছাড়া বাকি দুই দিকে চার-পাঁচ কাতারে লোক দাঁড়িয়েছে। তার মধ্যে ঠেলে-ঠুলে এগিয়ে এসে এক ডাক-পিয়ন তন্ময় হ'য়ে যাত্রা শুনছে। সকালে বেচারা কাঁধে ডাকব্যাগটি ঝুলিয়ে চিঠি বিলি করতে বেরিয়ে যাত্রা হচ্ছে দেখে একটু শুনে যাবার লোভ সম্বরণ করতে পারে নি।

মাতব্বরদের মধ্যে একজনের হঠাৎ পিয়নের উপর দৃষ্টি পড়ায় হাত বাড়িয়ে ঈষৎ উচ্চকণ্ঠে তিনি বললেন, "এয় পিয়ন! হামারা চিঠ্‌ঠি হ্যায়?" পিয়ন কিন্তু যাত্রা শুনতে এমনই মগ্ন যে, না বার করে চিঠি, না দেয় কথার উত্তর। ততক্ষণে কিন্তু নিকটবর্তী জনতার মধ্যে ব্যাপারটা মালুম হয়ে গেছে। একটা প্রচণ্ড হাস্যরোলে ক্ষণকালের জন্য যাত্রা বন্ধ হ'য়ে গেল।

চার-পাঁচজন লোকের সাহায্যে ধরাধরি ক'রে ভাগলপুরের গঙ্গামাটির তৈরি পিয়নকে যাত্রার আসরে দাঁড় করিয়ে শশিভূষণ নিকটেই অপেক্ষা করছিলেন—তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে সেই চিঠিপ্রার্থী ভদ্র-লোকের সম্মুখে উপস্থিত হ'য়ে করজোড়ে বললেন, "খুশি হয়েছেন বাবু?" বৃদ্ধ ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে উঠে শশিভূষণের মাথায় দক্ষিণ হস্ত স্থাপিত ক'রে বললেন, "খুশি হই নি বললে এত বড় সভায় কেউ সে কথা বিশ্বাস করবে না শশি, সত্যিই খুশি হয়েছি। দীর্ঘজীবী হও।"

এটি আমার নিজের অভিজ্ঞতার ঘটনা। মাতাঠাকুরাণীর মুখে একটি কাহিনী শুনেছিলাম, সেটি এই কাহিনীর জুড়িদার কাহিনী। পাঠক-পাঠিকাগণ, বিশেষত পাঠিকাগণ শুনলে নিশ্চয় খুশি হইবেন।

বারোয়ারি পূজার ভোগের জন্য রাশি রাশি আনাজ এসে পড়েছে। জন দশ-বারো বউ-ঝি মিলে দশ-বারোখানা বঁটি নিয়ে আনাজ কুটতে বসেছেন। বড় বড় গামলায় আর পরাতে রাশি রাশি কোটা তরকারি স্তূপীকৃত হ'য়ে উঠছে,—এমন সময়ে জন দুই কুলির সাহায্যে শশী পাল মাঝমধ্যিখানে বসিয়ে দিলেন একটা মেছুনীর মূর্তি। ফুধিয়া নামক ভাগলপুরের একজন সর্বজনবিদিত মেছুনীর সহিত তার আকৃতির অদ্ভুত সাদৃশ্য। উবু হ'য়ে ব'সে মেছুনী একটা প্রকাণ্ড বঁটি নিয়ে দশ-বারো সের ওজনের এমটা বৃহৎ রুইমাছের গলায় সবে মাত্র কোপ বসিয়েছে। তাজা রুইমাছের দেহ থেকে টক্‌টকে রক্ত ঝ'রে পড়েছে। সঙ দেখে বউ-ঝিরা মুখ টিপে হাসাহাসি আর নিম্নকণ্ঠে কথোপকথন করছেন। সঙ বসিয়ে দিয়ে শশী পাল একটু গা-ঢাকা হয়েছেন।

ক্ষণপরেই একজন নেতৃস্থানীয়া বর্ষীয়সী মহিলা হন্তদন্তভাবে সেখানে উপস্থিত হ'য়ে উচ্চকণ্ঠে বললেন, "কই গো, কুটনো কতদূর এগুলো?" তারপর মেছুনী-মূর্তির উপর দৃষ্টি পড়তেই তেলে-বেগুনে জ্ব'লে উঠে বললেন, "এ মাগীর ত আচ্ছা আক্কেল দেখছি! আর জায়গা পেলে না! এই তরকারির মাঝখানে এসে মাছ কুটতে—।" কথা কিন্তু আর অগ্রসর হ'তে পারলে না, একটা তুমুল হাস্যধ্বনির মধ্যে অস্পষ্ট হ'য়ে গেল। ভদ্রমহিলাও ততক্ষণে তাঁর ভুল বুঝতে পেরে সানন্দে হাস্যে যোগ দিয়েছেন।

অন্তরাল থেকে বেরিয়ে এসে সহাস্য মুখে যুক্তকরে ভদ্রমহিলাকে সম্বোধন ক'রে শশিভূষণ বললেন, "আপনার তরকারি কিন্তু আঁশ হয় নি মা।"

সহাস্য অপ্রতিভমুখে ভদ্রমহিলা বললেন, "না, তা হয় নি,—কিন্তু বাছা, আমাদের নিয়েও তুমি যেন আবার সঙ-টঙ বানিয়ো না।"

জিভ কেটে মাথা নেড়ে শশিভূষণ বললেন, "আপনাদের নিয়ে কি সঙ বানাতে পারি মা! একান্তই যদি বানাই, প্রতিমাই বানাব।"

আগেকার সে-সব দিন চ'লে গেছে। তার দ্বারা আমরা লাভবান হয়েছি অথবা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি, সে কথা তুলছি নে। কিন্তু আজকালকার সভ্যতর দিনের কথা মনে হ'লে মনে হয়, আগেকার ধরিত্রী যেন আরও একটু সবুজ ছিল।

পিতাঠাকুর মহাশয়ের পেন্‌শন নেওয়ার পর পূর্ণিয়ার পাট তুলে দিয়ে আমরা সপরিবারে কলিকাতায় ভবানীপুর এসে বাস আরম্ভ করেছি। কলিকাতায় দাদা হাইকোর্টে ওকালতি আরম্ভ করেছেন।

পূর্ণিয়ায় আমি গভর্নমেণ্ট হাইস্কুলে অধ্যয়ন করতাম। আমাদের হেডমাস্টার ছিলেন ফ্র্যান্সিস্ জেভিয়ার মুখার্জি। ধপধপে গৌরবর্ণ দেহ, মুখে এক মুখ কাঁচা দাঁড়ি-গোঁফ, শান্ত ভদ্র আকৃতি, শাসনের লেশমাত্র উগ্রতা ছিল না; কিন্তু আমরা তাঁকে শ্রদ্ধা এবং সমীহ করতাম সহজ প্রবৃত্তির বশে।

পূর্ণিয়ার স্কুলে বাংলা পড়াবার ব্যবস্থা ছিল না, সুতরাং আমাকে পড়তে হ'ত হিন্দী। আমার বাংলা দেশের সহপাঠিগণ যখন পড়তেন, 'ভো নভোমণ্ডল, বল স্বরূপ, কে দিল তোমারে এরূপ রূপ?' তখন আমি পূর্ণিয়ার স্কুলে পড়তাম,—

ছহরেঁ শিরপর ছব মোর-পখা
উনকী নথকী মুক্তা থহরেঁ।
ফহরেঁ পিয়রো পট-বেণী ইতে,
উনকী চুনরিকে ঝবা ঝহরেঁ॥

আরও নিম্নশ্রেণীতে আমি যখন পড়তাম—

সুত বিত নারী ভবন পরিবারা
হোঁ হি যাহি জগ বার হি বারা।
অস বিচার জয়ী জাগহুঁ তাতা,
মিলে ন জগমে সহোদর ভ্রাতা॥

তখন বাংলা দেশের আমার বয়সের বালকেরা পড়তেন,—

রাতি পোহাইল উঠ প্রিয়ধন,
কাক ডাকিতেছে কর রে শ্রবণ।

আমার সরোজিনীদিদি বাংলা পড়তেন। তাঁর কাছে শুনে শুনে আমি বাংলা ভাষার শিশু-কবিতা কণ্ঠস্থ করতাম। তা ছাড়া, 'সখা', 'সাথী', 'সখা ও সাথী', 'মুকুল' প্রভৃতি ছেলেদের মাসিকপত্রগুলি বাংলা শিক্ষার বিষয়ে আমাকে সাহায্য করত। আমার বাংলা ভাষা শিক্ষার প্রকৃত ক্রম হচ্ছে, 'প্রথম ভাগ', 'দ্বিতীয় ভাগ', 'কথামালা'—তারপর একেবারে সুদীর্ঘ লম্ফে 'বিষবৃক্ষ'। 'কথামালা' এবং 'বিষবৃক্ষে'র মধ্যস্থল জুড়ে ছিল হিন্দী ভাষার শিক্ষা।

কলিকাতায় আসার পর ভর্তি হলাম ভবানীপুরের সাউথ সুবার্বন স্কুলে। প্রকাণ্ড স্কুল, হাজার-বারোশো ছাত্র, হেডমাস্টার সুবিখ্যাত শিক্ষা-নায়ক বেণীমাধব গঙ্গোপাধ্যায়। হেডমাস্টার মহাশয়কে আমরা শ্রদ্ধা করতাম যথেষ্ট। কিন্তু তার চতুর্গুণ ভয় করতাম শ্রীপতি হেডপণ্ডিত মহাশয়কে। সাধারণত ছেলেরা পণ্ডিত মশায়দের ভয়-ভীতি একটু কমই করে, কিন্তু শ্রীপতি পণ্ডিত মশায়ের ক্ষেত্রে সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রমই ছিল। দেখতে তিনি সুপুরুষ ছিলেন; দোহারা দেহ, ফুটফুটে রঙ, সুন্দর মুখশ্রী, প্রতিভাব্যঞ্জক চক্ষু। কিন্তু তিনি যখন কোন কারণে অসন্তুষ্ট হ'য়ে কোন ছাত্রের প্রতি ঘাড় একটু বেঁকিয়ে বক্র কটাক্ষে নিঃশব্দে চেয়ে থাকতেন, তখন সে ছাত্রের অন্তস্তল পর্যন্ত ভয়ে হিম হ'য়ে যেত। তিনি গাল-মন্দ দিতেন না, রূঢ় কর্কশ ভাষাও প্রয়োগ করতেন না; কিন্তু মার্জিত ভদ্র ভাষায় এমন মর্মন্তুদ বিদ্রূপ-বাণ বর্ষণ করতে জানতেন যে, তার কাছে কিল-চড়-চাপড় অনেক নিম্নস্তরের দণ্ড ব'লে মনে হ'ত।

শ্রীপতি পণ্ডিত মহাশয়ের ক্লাসের একদিনকার একটা ঘটনা বলি। সেদিন আমাদের পাঠ্য ছিল সংস্কৃত ব্যাকরণ। সনৎকুমার মুখোপাধ্যায় নামে আমাদের ক্লাসে কৃশ ও কৃষ্ণবর্ণের একটি ছাত্র পড়ত। সর্বদা অসুখে ভুগে-ভুগেই হোক, অথবা অন্য যে কোন কারণেই হোক, সনৎ ছিল নিতান্ত নিরীহ গো-বেচারা ধরনের ছেলে।। তার শান্ত মিষ্ট প্রকৃতির জন্য তাকে আমার বড় ভাল লাগত।

বেঞ্চে ব'সে ডেস্কের উপর নেতিয়ে পড়ে নিবিষ্টচিত্তে সনৎ পড়া শুনছিল, এমন সময়ে হঠাৎ শ্রীপতি পণ্ডিত মহাশয়ের তার উপর মনোযোগ আকৃষ্ট হ'ল।

"সনৎকুমার!"

ধড়মড়িয়ে দাঁড়িয়ে উঠে সমীহ ভরে সনৎ বললে, "আজ্ঞে পণ্ডিত মশায়"

শ্রীপতি পণ্ডিত প্রশ্ন করলেন, "কিম্‌টা ধাতু, না, শব্দ?"

মুহূর্তকাল চিন্তা ক'রে সনৎ বললে, "ধাতু পণ্ডিত মশায়।"

শ্রীপতি পণ্ডিত প্রশ্ন করলেন, "পরস্মৈপদী, না, আত্মনেপদী?"

এখন, সংস্কৃত ব্যাকরণের যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞানের কল্যাণে সনৎকুমারের একটু জানা ছিল যে, উভয় পদের মধ্যে পরস্মৈপদীটা কিছু সহজ এবং আত্মনেপদী অপেক্ষাকৃত কূটকচালে। তাই সে মাথা একটু চুলকে বললে, "পরস্মৈপদী পণ্ডিত মশায়।"

"রূপ কর।"

পরস্মৈপদীর সাধারণ ফর্মায় কিম্ শব্দকে নিক্ষেপ ক'রে সনৎকুমার রূপ ক'রে চলল, "কিমতি কিমতঃ কিমন্তি, কিমসি কিমথঃ কিমথ, কিমামি কিমাবঃ কিমামঃ, অকিমৎ অকিমতাম্ অকিমন্—"

হস্ত প্রসারিত ক'রে সনৎকুমারকে বাধা দিয়ে গভীর স্বরে শ্রীপতি পণ্ডিত মশায় বললেন, "থামো সনৎকুমার, থামো—তুমি যে রকম

অবলীলাক্রমে রূপ ক'রে চলেছ, তাতে আমারই এখন সন্দেহ হচ্ছে কিম্‌টা ধাতু, না, শব্দ!"

অবস্থার কৌতুকপরতায় এবং তার উপর এই সরস মন্তব্যে একটা দম-ফাটা হাস্য আমাদের কণ্ঠে এসে হাজির হয়েছিল; কিন্তু শ্রীপতি পণ্ডিত মশায়ের ব্যক্তিত্বের চাপে সেই দুর্দমনীয় হাস্যকে তার উৎসক্ষেত্রে নিঃশব্দে নামিয়ে দিতে আমরা বাধ্য হয়েছিলাম।

আমরা যখন দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ি, সেই সময়ে 'হিতবাদী' নামক সাপ্তাহিক পত্রে প্রকাশিত "রুচিবিকার" শীর্ষক এক কবিতা সম্পর্কে মানহানির মকদ্দমার বিচারে উক্ত পত্রের সুপ্রসিদ্ধ সম্পাদক কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের নয় মাসের কারাদণ্ড হয়। বিচারে অসন্তুষ্ট হ'য়ে আমরা সাউথ সুবার্বন স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রগণ মিলিত হ'য়ে প্রতিবাদস্বরূপ একটি কবিতা ছাপাই। কবিতাটি রচিত করেন বন্ধুবর শ্যামরতন চট্টোপাধ্যায়। দুই ভাগে কবিতাটির মর্ম বিভক্ত। প্রথম অংশে বিচারপতির অবিচারের প্রতি কঠোর মন্তব্য প্রকাশ; এবং দ্বিতীয় অংশে অকারণে দণ্ডিত কাব্যবিশারদ মহাশয়ের প্রতি সুগভীর সমবেদনা জ্ঞাপন।

কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ ভবানীপুরে বাস করতেন। 'হিতবাদী' পত্রের সুযোগ্য এবং নির্ভীক সম্পাদনার জন্য ভবানীপুর অঞ্চলে তিনি অতিশয় জনপ্রিয় ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর কারাদণ্ডের বিরুদ্ধে কবিতা ছাপিয়ে যুগপৎ কর্তব্যবোধ ও কবিত্বশক্তির পরিচয় দিয়েছি মনে ক'রে আমরা মনে মনে বেশ একটু গর্ব অনুভব করছিলাম। কবিতাটি স্কুলের ছাত্রদের এবং শিক্ষকদের মধ্যে বহুলভাবে বিতরিত হয়েছিল।

ইংরেজীর ক্লাস। ধীরে ধীরে ক্লাসে প্রবেশ করলেন হেডমাস্টার বেণীমাধব গঙ্গোপাধ্যায়। আসন গ্রহণ ক'রে তিনি চাপকানের পকেট

থেকে বার করলেন এক খণ্ড আমাদের প্রতিবাদ-কবিতা। সাগ্রহে আমরা কান পাতলাম সুখ্যাতি শোনবার প্রত্যাশায়। কিন্তু হরি হরি! আমাদের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বেণীমাধব বললেন, "এই কবিতাটি ছাপিয়ে তোমরা দুটি ভুল করেছ। প্রথমত, মকদ্দমার বিচার-অবিচার সম্বন্ধে তোমরা ছেলেমানুষেরা কি বোঝ? আমরা, তোমাদের মাস্টার মশায়রা ত কিছু বুঝি নে। সুতরাং ও-বিষয়ে তোমরা যা কিছু অভিমত প্রকাশ করেছ, তা হয়েছে অনধিকার চর্চা। তোমাদের দ্বিতীয় ভুল, সান্তনা দিতে গিয়ে তোমরা সান্তনারই বানান ভুল ক'রে বসেছ। 'ন'য়ের নীচে শুধু 'ত' দিলে সত্যিকার সান্ত্বনা দেওয়া হয় না; 'ন'য়ের নীচে 'ত' আর তার নীচে 'ব' দিলে তবে সান্ত্বনা দেওয়া হয়। সুতরাং তোমরা সান্তনাও দিয়েছ ভুল।" আমাদের কবিতার শিরোনাম ছিল "সান্তনা"।

হেডমাস্টার মহাশয়ের মন্তব্যে আমরা লজ্জিত এবং দুঃখিত হয়েছিলাম নিশ্চয়ই; কিন্তু উপকৃতও হয়েছিলাম, অন্তত আমি। আগেকার কথা বলতে পারি নে, কিন্তু সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত সান্ত্বনা শব্দ লিখিতে কখনো বানান ভুল করি নি। হাতীর কথা মনে হ'লে শুঁড়ের কথা যেমন অনিবার্যভাবে মনে আসে, সান্ত্বনার কথা মনে হ'লে ব-ফলার কথা তেমনি মনে পড়ে।

আর একটি ইংরেজী শব্দের বানানের বিষয়েও একটি কৌতুকজনক কাহিনী আছে। আমি তখন ক্যাসুয়াল স্টুডেণ্ট-রূপে রিপন কলেজে বি. এ. পড়ি। প্রেসিডেন্সী কলেজে আমার দুই বৎসরের বি. এ. অধ্যয়ন সাঙ্গ করা ছিল, অসুস্থতাবশত পরীক্ষায় উপস্থিত হ'তে পারি নি ব'লে অধ্যয়নের অভ্যাসটা চালু রাখবার উদ্দেশ্যে রিপন কলেজে ভর্তি হয়েছিলাম। কলেজে আমার কর্তব্য ছিল দুটি—প্রথমত, মাসে মাসে কলেজের মাহিনা দেওয়া, এবং দ্বিতীয়ত, ইচ্ছামত ক্লাসের লেকচারে

উপস্থিত হওয়া অথবা না হওয়া। বৎসরান্তে আমি প্রেসিডেন্সী কলেজ হ'তে পরীক্ষা দোব, সুতরাং রিপন কলেজে অ্যাটেণ্ডেন্স রাখবার কোনও প্রয়োজন ছিল না।

প্রথম প্রথম নিয়মিত কলেজে যেতাম, কিন্তু যাওয়ার মূলে প্রয়োজনের তাগিদ ছিল না ব'লে ক্রমশই যাওয়ায় শৈথিল্য দেখা দিতে লাগল। অবশেষে বেছে-বুছে পছন্দমতো, এমন কি সুযোগমতো যেতে আরম্ভ করলাম। কিন্তু দেশবরেণ্য নেতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ক্লাস আমি পারতপক্ষে বাদ দিতাম না। সুরেন্দ্রনাথ আমাদের বার্কের 'অ্যামেরিকান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স' পড়াতেন। কিন্তু সে ত পড়ানো নয়। সে যেন অগ্নিগর্ভ ওজস্বিনী ভাষায় স্বাধীনতা অর্জনের মন্ত্রপাঠ। সুরেন্দ্রনাথের পড়ানো শুনে মনে হ'ত, এডমণ্ড বার্কের অশরীরী আত্মা যেন তাঁর দেহের মধ্যে ভর ক'রে 'অ্যামেরিকান ইণ্ডিপেণ্ডেন্সে'র ভাষায় ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-লাভের দুর্বার দাবি পেশ করছে। যে সুরেন্দ্রনাথের ইংরেজী বক্তৃতার ভাষা, যুক্তি এবং-কণ্ঠস্বরের মধ্যে বিলাতের ইংরেজগণ পিট, ফক্স প্রমুখ ইংলণ্ডের প্রথম শ্রেণীর বক্তাগণের ভাষা, যুক্তি এবং কণ্ঠস্বরের প্রতিধ্বনি শুনতে পেয়ে বিমুগ্ধ হতেন, সেই সুরেন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বরের উদাত্ত হ'তে অনুদাত্তের মধ্যে ওঠা-নামার অপূর্ব কর্তব শুনে আমাদের রক্তের মধ্যে আগুন ধ'রে যেত। তখন ভারতবর্ষে স্বাধীনতা অর্জনের অগ্নিযুগ আরম্ভ হয়েছে; আর সে অগ্নিযুগের প্রধান যজ্ঞক্ষেত্র বাংলা দেশ এবং প্রধান হোতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

একদিন সুরেন্দ্রনাথের ক্লাসে প্রসঙ্গক্রমে ইংরেজী 'বিগিনিং' শব্দের কথা উঠল। সুরেন্দ্রনাথ বললেন, "সুনিশ্চিতভাবে আমি জানি বিগিনিং শব্দের মধ্যস্থলে পাশাপাশি দুটি 'এন্' আছে, কিন্তু লেখবার সময়ে কেন বলতে পারি নে, বেরিয়ে যায় একটা 'এন্'।" এ প্রসঙ্গের পর আর কোনও

দিন সুরেন্দ্রনাথের একটা 'এন্' বেরিয়েছিল কি না বলতে পারি নে, কিন্তু আমার বেরোয় নি। বিগিনিং লিখতে হ'লেই সুরেন্দ্রনাথের দুটি 'এন্'-এর গল্প মনে না প'ড়ে যায় না।

সুরেন্দ্রনাথের ক্লাস ব্যতীত অধ্যক্ষ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের ক্লাসে প্রায়ই যেতাম, আর যেতাম মাঝে মাঝে অধ্যাপক ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ক্লাসে। রামেন্দ্রসুন্দর বিজ্ঞান পড়াতেন। তাঁর লেখবার পেন্সিলটি উঁচু ক'রে ধ'রে ছাত্রদের বলতে—Suppose this to be a test-tube. প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র আমার পক্ষে এমন কথায় হাস্য-সম্বরণ করা কঠিন ছিল; কিন্তু পড়ানোর গুণে পেন্সিল টেস্ট-টিউব হ'য়ে উঠত। তখনকার দিনে অনেক কলেজে বিজ্ঞান পড়ানো হ'ত বৈজ্ঞানিক যন্ত্র বাদ দিয়ে।

ক্ষেত্র বন্দ্যোপাধ্যায় গণিত পড়াতেন। গণিতশাস্ত্রে তিনি সেকালে একজন অতিশয় নামজাদা অধ্যপক ছিলেন। নীরস গণিতশাস্ত্র পড়াতেন, কিন্তু মনে হ'ত কাব্য পড়ছি। সেই লোভে সুবিধে পেলেই, অর্থাৎ কলেজে গেলেই এবং তাঁর ক্লাস থাকলেই ক্লাসে উপস্থিত হতাম। একদিন ক্লাসে হাজির হয়েছি, নাম ডাকা হচ্ছে। আমার নাম ডাকা হ'তেই একটু উঁচু হ'য়ে উঠে বললাম—"প্রেসেন্ট সার্।"

রেজিস্টার থেকে মুখ তুলে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে ক্ষেত্রমোহন বললেন, "কি গাঙ্গুলী মশায়! ব্যাপার কি? এদিকে আজ কোন বরাত-টরাত ছিল নাকি? অমনি দয়া ক'রে আমাদের অঞ্চলটাও সেরে যাচ্ছেন? খাতায় ত দারুণ অবস্থা। পাঁচ-ছটা ক'রে 'এ', তারপর একটা ক'রে 'পি'। বলি এ রকম আচরণ করলে প্যাটেণ্ডেন্স থাকবে ত?"

অনেক কষ্টে ক্যাসুয়াল স্টুডেন্ট হয়েছিলাম। একবার সিটি কলেজে

অধ্যক্ষ হেরম্বচন্দ্র মৈত্রের নিকট গিয়ে সাধাসাধি করি, তারপর হতাশ হ'য়ে রিপন কলেজে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর কাছে এসে চাপাচাপি লাগাই। পাঁচ-ছয় দিন এই রকম ব্যাপার চলছিল। হেরম্ব মৈত্র বলেন, "তুমি রেগুলার স্টুডেণ্ট হ'য়ে এক বছর প'ড়ে আমাদের কলেজ থেকে পরীক্ষা দাও, তোমাকে এখনি ভর্তি ক'রে নিচ্ছি। তা নয়, পড়বে তুমি আমাদের কলেজে, আর পরীক্ষা দেবে প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে, এই বা কেমন কথা? প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে পাস করলে তুমি কি লাটসাহেব হবে?"

তা হয়ত হব না, কিন্তু দু বছর প্রেসিডেন্সী কলেজে বারো টাকা হিসাবে মাহিনা গুঁজে নাম বেরোবে ছ টাকার কলেজ থেকে—তাই বা কোন্ দেশের কথা? রিপন কলেজে গিয়ে উপস্থিত হই। আমাকে দেখে ভাল মানুষ ত্রিবেদী মহাশয় ভীত হ'য়ে বলেন, "দেখ, পরীক্ষা তুমি দেবে প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে, আর পড়বে তুমি এখানে, এ রকম ক্যাসুয়াল স্টুডেণ্ট হবার ব্যবস্থা ইউনিভার্সিটিতে আছে কি না, তা আমি ঠিক জানি নে। তার চেয়ে তুমি আমাদের কলেজে এসে প'ড়ে যেয়ো, তোমাকে ভর্তি হ'তেও হবে না, মাইনেও লাগবে না।" আমি কিন্তু এ প্রস্তাবে সম্মত হলাম না; বললাম, "অযথা কলেজের নিকট অর্থ-ঋণে ঋণী হওয়া ত উচিত নয় সার্। তা ছাড়া, মাসে মাসে টাকা না দিলে কলেজে আসবার চাড় থাকবে না।" কিছুটা দয়াপরবশ এবং অনেকখানি অনন্যোপায় হ'য়ে ত্রিবেদী মশায় আমাকে ভর্তি ক'রে নেবার আদেশ দিলেন।

আসল কথা ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট ফাঁস ক'রে দিয়ে অত কষ্টে অর্জিত ক্যাসুয়েল স্টুডেণ্টশিপ-কে বিপন্ন করার সম্ভাবনা সৃষ্টি করা উচিত হবে না মনে ক'রে তাঁর মন্তব্যের বিষয়ে কোনও উত্তর দিলাম

না। কি জানি, যদি তাঁর খাতা থেকে আমার নাম খারিজ ক'রে দেবার জন্যে প্রিন্সিপাল মহাশয়ের কাছে কোন প্রস্তাব ক'রে বসেন! একটু চড়্‌কে হাসি হেসে শুধু নিঃশব্দে তাঁর দিকে চেয়ে রইলাম। মনে মনে বললাম, অ্যাটেণ্ডেন্স না থাকে ত রম্ভা!

পূজার ছুটিতে আমরা সপরিবারে কলিকাতা থেকে ভাগলপুরে এসেছি। দুর্গাপূজা সবেমাত্র হ'য়ে গেছে। প্রথম কার্তিকের লতায়-পাতায় দূর্বাঘাসে নূতন হেমন্তের শিশিরকণা প্রভাত-সূর্যকিরণে ঝিক্‌মিক করতে আরম্ভ করেছে।

বিহার প্রদেশে শীতকালেই ঘুড়ি ওড়াবার ধুম। অভিভাবকদের দৃষ্টি এড়িয়ে প্রভাস ও আমি যখন পারি তখনই ঘুড়ি ওড়াই—প্রধানত গঙ্গার তীরে, কখনো কখনো বা দোতলার ছাতে। প্রভাস আমার ভাগীনেয়, অর্থাৎ স্বনামখ্যাত ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্রের মধ্যম সহোদর। প্রভাস ও আমি প্রায় সমবয়সী; আমিই এক-আধ বৎসরের বড়।

ঘুড়ি ওড়ানোর বিষয়ে প্রভাস ও আমার মধ্যে পরিপূর্ণ মিত্রতা বিদ্যমান। পরস্পরের প্রতি আমরা কখনো আক্রমণশীল হই নে। একান্তই যদি প্যাঁচ লড়তে হয় ত লড়ি অপর কোন পক্ষের সঙ্গে। কিন্তু হঠাৎ একদিন সন্ধ্যাবেলা অতর্কিতে এক গোঁত্তা মেরে প্রভাস আমার ঘুড়ি কেটে দিলে। ঘুড়িখানা হায় হায় ক'রে এপাশ-ওপাশ কাত হ'য়ে উড়তে উড়তে গঙ্গাবক্ষে প'ড়ে ঘুড়ি-জন্ম থেকে মুক্তিলাভ করলে।

বিনা প্ররোচনায় এই বিশ্বাসঘাতকতার কার্যে অত্যন্ত রুষ্ট হ'য়ে তীব্র প্রতিবাদ করলাম, "তুই আমার ঘুড়ি কাটলি কেন?"

বিস্মিতকণ্ঠে প্রভাস বললে, "কাটলাম নাকি?"

"কাটলি নে ত ঘুড়ি জলে গিয়ে পড়ল কেমন ক'রে?"

মনে হ'ল, প্রভাসের মুখে অতি ক্ষীণ এক ঝিলিক হাসি খেলে গেল।

সে বললে, "তাই যদি দেখতে পাব উপীনমামা, তা হ'লে কি তোমার ঘুড়ি কাটি ?"

"দেখতে যদি না পাস, তা হ'লে তোর ঘুড়ি অমন গুছিয়ে গোটাচ্ছিস কেমন ক'রে ?"

"ও একদম আন্দাজে।"

এ কথার উপর আর কথা নেই, লাটাইয়ে কাটা সুতো গুটিয়ে নিয়ে বাড়ি ফিরে চললাম। পথ চলতে চলতে প্রভাস কতকটা আপন মনেই বলতে লাগল, "চোখ অনেক দিনই খারাপ হয়েছে, এতদিন বলি নি, আর কিন্তু না বললেই নয়। চশমা না নিলে চোখ নষ্ট হ'য়ে যাবে।"

এর পর প্রভাস চশমার জন্য অনেকের নিকটই দরবার করতে লাগল ; কিন্তু কেউ বড় গা-গোছ করে না। হতাশ হ'য়ে হ'য়ে অবশেষে সে অহিংস উপায় পরিত্যাগ ক'রে হিংস্র উপায়ের শরণাপন্ন হ'ল। কেউ হয়ত সামান্য একটু ঝাপসা আলোয় এক ঘর থেকে অন্য ঘরে চলেছে, হঠাৎ প্রভাস শক্ত মাথা নিয়ে একেবারে তার নাকের উপর গিয়ে পড়ল। যন্ত্রণায় অস্থির হ'য়ে নাক চেপে ধ'রে 'গেছি গেছি' ব'লে সে বেচারা চীৎকার ক'রে উঠল। অম্লান মুখে প্রভাস বললে, "তা কি করব, আমি কি চোখে দেখতে পাই ?"

চাকররা হয়ত তিন ঘড়া গঙ্গাজল ভ'রে এনে পাশাপাশি সাজিয়ে রেখেছে, এমন কায়দা ক'রে প্রভাস চ'লে গেল যে, তার মধ্যে দুটো ঘড়া উল্টে প'ড়ে ভক্ ভক্ ক'রে জলোদ্গিরণ করতে লাগল। ব্যস্ত হ'য়ে চাকররা হাঁ-হাঁ ক'রে ছুটে এল। প্রভাস বললে, "চোখে দেখতে পাই নে, অমন জায়গায় ঘড়া রাখলে পড়বে না ?" অথচ জলের ঘড়া রাখবার অমন উপযুক্ত স্থান বাড়ির মধ্যে আর দ্বিতীয় ছিল না।

এই ধরনের উৎপাত দিনের পর দিন বেড়েই চলল। অবশেষে

একদিন পিতাঠাকুর মহাশয় আমাকে ডেকে বললেন, "ভুবন বলছিল, প্রভাসের চোখ ভারি খারাপ হয়েছে, ওকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে নিমাইবাবুকে দিয়ে চোখ পরীক্ষা করিয়ে চশমার ব্যবস্থা কর।"

ভুবন, অর্থাৎ ভুবনমোহিনী প্রভাসের মাতা, আমাদের মেজদিদি; আর নিমাইচরণ চট্টোপাধ্যায় ভাগলপুরের সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার, সরকারী হাসপাতালের অ্যাসিস্ট্যাণ্ট সার্জেন, পিতাঠাকুর মহাশয়দের অন্তরঙ্গ বন্ধু।

প্রভাসের পিতা মতিদাদা ত সন্ন্যাসী-বৈরাগী মানুষ; সংসারে থাকেন, কিন্তু এমন নির্লিপ্তভাবে যে, তাঁর হিসেব থেকে সবাই নিজেদের বাদ দিয়ে রেখেছে। প্রয়োজনের তিনি কেউ নন, কিন্তু অপ্রয়োজনের এমন বন্ধু আর দুটি নেই। দুটো পাটকাঠি, কিছু লাল-সবুজ-সাদা কাগজ, খানিকটা ছেঁড়া ন্যাকড়া দিয়ে যদি কেউ বললে, "মতিদা, একটা খেলনা ক'রে দিন।" তৎক্ষণাৎ মতিদাদা তৎপর হলেন। খানিকটা আঠা করিয়ে নিয়ে কিছু সুতা যোগাড় ক'রে ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে এমন এক সমুদ্রগামী জাহাজ তৈরি করলেন, যা আজকালকার দিনে মনিহারী দোকানের শো-কেসে রাখলে তিন টাকা মূল্যের টিকিট লাগানো চলে। অপূর্ব প্রতিভা, কিন্তু সে প্রতিভা সঞ্চিত হবার আধার খুঁজে না পেয়ে অপচয়িত হ'য়ে গিয়েছিল।

মতিদাদাকে দিয়ে জাহাজ তৈরি করানো সহজ, কিন্তু প্রভাসকে সঙ্গে দিয়ে হাসপাতালে পাঠানো সহজ নয়। ওদিকে কুমার সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদমপুর ক্লাবের থিয়েটারের মহলা নিয়ে শরৎচন্দ্র এমন মেতেছেন যে, স্নানাহারের সময় নেই। অগত্যা প্রভাসকে হাসপাতালে নিয়ে যাবার ভার পিতাঠাকুর মহাশয় আমার উপরই দিলেন।

প্রভাসকে বললাম, "আজ দেরি হ'য়ে গেছে, কাল তোকে হাসপাতালে নিয়ে যাব প্রভাস।"

শুভস্য শীঘ্রং নীতি স্মরণ ক'রে প্রভাস বললে, "কাল আবার কেন?—আজই চল। কিছু দেরি হয় নি।"

"তবে চল্।"

দুজনে গুটি গুটি হাসপাতালের পথে অগ্রসর হলাম। দুই চক্ষুর আসন্ন অলঙ্করণের চিত্র মানস মুকুরে দর্শন ক'রে মনে হ'ল, প্রভাস বেশ সপুলক চিত্তে চলেছে। আমিও যে প্রভাসের আগতপ্রায় সৌভাগ্যের কথা চিন্তা ক'রে মনে মনে একটু ঈর্ষান্বিত হই নি, তা বলতে পারি নে।

হাসপাতালে পৌঁছলাম।

আমাদের দুজনকে দেখে নিমাইবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "কি হয়েছে?"

বললাম, "প্রভাসের চোখ খারাপ হয়েছে; বাবা আপনাকে দিয়ে দেখাতে পাঠিয়েছেন।"

প্রভাসের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে নিমাইবাবু বললেন, "চোখ আবার কবে খারাপ হ'ল? আচ্ছা, ঐ বেঞ্চে ব'স্, একটু পরে দেখছি।"

দুজনে পাশাপাশি বেঞ্চে গিয়ে বসলাম।

বেশী বিলম্ব হ'ল না, অল্পক্ষণ পরেই নিমাইবাবু আমাদের দুজনকে চক্ষু-পরীক্ষার ঘরে নিয়ে গেলেন। একটা দেওয়ালে বৃহৎ আকারের চার-পাঁচখানা বোর্ড টাঙানো; কোনটাতে ইংরেজী বর্ণমালার অক্ষর এলো-মেলোভাবে মুদ্রিত, কোনটাতে হিন্দী বর্ণমালার, কোনটাতে বাংলা বর্ণমালার, কোনটাতে উর্দু'র, কোনটাতে বা আর কোনরূপ সাঙ্কেতিক চিহ্ন। প্রত্যেক বোর্ডেই অক্ষরগুলি কয়েক শ্রেণীতে বৃহত্তম হ'তে ক্ষুদ্রতম আকারে মুদ্রিত।

লম্বা এক লাঠির সাহায্যে ইংরেজী বোর্ডের চতুর্থ লাইনের একটা অক্ষর দেখিয়ে নিমাইবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "এটা কোন্ অক্ষর বল্?"

ধরা যাক, সে অক্ষরটা 'P', কিন্তু ভুরু কুঁচকে খানিকক্ষণ নিরীক্ষণ ক'রে প্রভাস বললে, "S"।

তৃতীয় লাইনের গোটা তিনেক অক্ষর নিয়ে নিমাইবাবু পরীক্ষা করলেন, কিন্তু ফল একই হ'ল, কোনটাই প্রভাস বলতে পারল না। তখন দ্বিতীয় লাইন টপ্‌কে নিমাইবাবু একেবারে প্রথম লাইনে গিয়ে পড়লেন। প্রথম অক্ষর একটা বৃহৎ সাইজের E; সেটার উপর লাঠি ফেলে বললেন, "বল্ এটা কোন্ অক্ষর ?"

আমি আশা করেছিলাম, এবার প্রভাস বলতে পারবে; কারণ অক্ষরটা এমনই প্রকাণ্ড বড় যে, একমাত্র অন্ধ ভিন্ন আর সকলেরই বলবার কথা। প্রভাস কিন্তু দেখে দেখে ব'লে বসল, "O"।

নিমাইবাবু বললেন, "ঠিক। বারান্দায় চল্।"

আমি ভাবলাম, না! প্রভাসটা নির্ঘাৎ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। চশমা তার কে মারে!

কম্পাউণ্ডের কাছেই একটা কালো রঙের গরু চরছিল, যে রকম হৃষ্টপুষ্ট দেহ, বোধ করি নিমাইবাবুরই হবে। বারান্দায় এসে গরুটাকে দেখিয়ে নিমাইবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "ওটা কি চরছে বল্ ?"

ভাবলাম, এটা ত প্রভাস বলবেই, কিন্তু তাতে ওর কোন ক্ষতি হবে না; যে রকম বৃহৎ সাইজের E-কে O ব'লে এসেছে, চশমা ওর অনিবার্য।

প্রভাস হয়ত আমার চেয়েও সতর্কপ্রকৃতির মানুষ; গরুটাকে দেখে বললে, "ঘোড়া।"

যাঁহাতক্ বলা ঘোড়া, এক বিরাশী সিক্কা ওজনের চড়ের শব্দ, আর সঙ্গে সঙ্গে সিংহগর্জন, "বল্ কি ওটা ?"

অতর্কিত চড়ের জন্য দুজনের মধ্যে আমরা কেউ প্রস্তুত ছিলাম না।

ইঞ্চি ছয়েক নীচু হ'য়ে গিয়ে আর্তকণ্ঠে প্রভাস ব'লে উঠল, "গরু, গরু, গরু।" তিনবার গরু শব্দ উচ্চারিত করবার উদ্দেশ্য বোধ হয় পাছে স্পষ্ট শুনতে না পেয়ে নিমাইবাবু আবার একটা চড় বসান।

এদিকে, আমি ত আর আমাতে নেই। চড়ের শব্দ শোনামাত্র তিন হাত পেছিয়ে দাঁড়িয়েছি। কি জানি, এডিং ও অ্যাবেটিং-এর অভিযোগে যদি আমার উপরও একটা চড় পড়ে।

চক্ষু-পরীক্ষার ঘরে প্রভাসকে নিয়ে গিয়ে নিমাইবাবু পুনরায় প্রভাসের চক্ষু পরীক্ষা করতে আরম্ভ করলেন। চড়ের কল্যাণে প্রভাস দিব্য-দৃষ্টি লাভ করেছিল; ছোট, বড় মাঝারি—সব অক্ষরই সে যথাযথভাবে ব'লে গেল। আমার দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে নিমাইবাবু বললেন, "বাড়ি যা তোরা। মহেন্দ্রবাবুকে বলিস, ওর চোখ বেশ ভাল আছে।"

আবার আমরা গুটি গুটি বাড়ির পথে পা চালালাম। ঘটনার শোচনীয়তা আমাদের দুজনকে নির্বাক ক'রে দিয়েছিল। খানিকটা পথ অতিক্রম করবার পর প্রভাসকে সান্ত্বনা দেবার উদ্দেশ্যে আমি বললাম, "সামনেই ছট্ পরব আসছে প্রভাস। ছটের মেলায় চার আনা দিয়ে একটা সাদা কাচের চশমা কিনে মাঝে মাঝে লুকিয়ে পরিস। দামটা না হয় আমিই দোবে।"

প্রভাস আমাকে ভুল বুঝলে, মনে করলে আমি তাকে উপহাস করছি। কোনও উত্তর না দিয়ে শুধু আমার প্রতি একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করলে। সে দৃষ্টির অর্থ—কাটা ঘায়ে আর নুনের ছিটে দিয়ো না।

সে যাই হোক, সেদিন থেকে আমাদের বাড়ির লোকজনের নাক আর চাকরদের গঙ্গাজল-ভরা ঘড়া আবার নিরাপদ হ'ল।

প্রভাসকে নিয়ে হাসপাতাল থেকে ফেরার কয়েকদিন পরেই জ্বরে পড়লাম, সামান্য গা-গরম, আততায়ীর পদক্ষেপ অত্যন্ত মৃদু,—আছে কি নেই, সব সময়ে ধরাই যায় না।

এ পূর্ণিয়ার অকুলীন ম্যালেরিয়া জ্বর নয়, যা হাড় পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিয়ে ঘণ্টা-দেড়েকের মধ্যে শরীরের উত্তাপ ১০৬ ডিগ্রীতে পৌঁছে দেয়। আমরা ত গোলা লোক, আমাদের কথা স্বতন্ত্র, জ্বরের ধীর-মন্থর বনেদী চাল দেখে বহুদর্শী চিকিৎসক নিমাইবাবুই ধরতে পারেন নি যে, যিনি আমার দেহে অবতীর্ণ হয়েছেন, তিনি রাজচক্রবর্তী সান্নিপাতিক বিকার; ইংরেজী চিকিৎসাশাস্ত্রের ভাষায় এণ্টারিক অথবা টায়ফয়েড ফিভার।

উপসর্গ কিছুই নেই; তরল পথ্যের উপর আছি; শুয়ে ব'সে কাটাই; অল্প-স্বল্প পড়ি; গল্প-টল্পও করি। এদিকে জ্বরের গতি ধীর কিন্তু সুনিশ্চিত ভঙ্গীতে ঊর্ধ্বদিকে এগিয়ে চলেছে—মুখের দিকেও, লেজের দিকেও। অর্থাৎ ম্যাক্সিমাম ও মিনিমাম টেম্পারেচার—দুই-ই। কিন্তু এমন একটু বিশেষ কায়দায় যে, মুখ এবং লেজের দূরত্ব ক্রমশ অল্প হ'য়ে আসছে।

এ লক্ষণটা তেমন ভাল নয়। জ্বর যদি ডিগ্রী সাড়েতিন-চারের মধ্যে ওঠা-নামা করে, তা হ'লে বুঝতে হবে সে নমনীয়, সুতরাং তার প্রকৃতি কতকটা সরল। কিন্তু সে যদি লেজ ও মুখ সঙ্কুচিত ক'রে ডিগ্রী দেড়-দুয়েকের মধ্যে ঠাঁই নেয়, তা হ'লে বুঝতে হবে সে বিষধর সর্পে পরিণত হয়েছে, যে কোন মুহূর্তে দংশন ক'রে প্রাণবিয়োগ ঘটাতে পারে।

সে যাই হোক, আমাকে নিয়ে তেমন উদ্বেগের কারণ ছিল না।

নিমাইবাবু অন্তত আমাদের আশ্বাস দিচ্ছিলেন যে, সরল রেমিটেণ্ট জ্বর, যে কোন সপ্তাহের মাথায় ছেড়ে যাবে। উদ্বেগ কিন্তু প্রতিনিয়ত বেড়ে উঠছিল মেজদিদিকে নিয়ে। গত পাঁচ-ছয় মাস ধ'রে তিনি নানা প্রকার জটিল ব্যাধিতে ভুগছিলেন; রোগশয্যা থেকে সংবাদ পাচ্ছিলাম, তাঁর অসুখটা হঠাৎ অনিবার্যগতিতে বাড়ের দিকে এগিয়ে চলেছে। শরৎ প্রায়ই আমাকে দেখতে আসত আর মাঝে মাঝে বলত, "উপীন, মা বোধ হয় এবার আর বাঁচবে না।" শুনে মনের মধ্যে ভারি কষ্ট পেতাম। সরল ও মিষ্ট স্বভাবের জন্য মেজদিদিকে আমরা ভারি ভালবাসতাম।

এদিকে আমার জ্বর আপাত-সরল গতিতে দিনের পর দিন অতিক্রম ক'রে তিন সপ্তাহের মাথায় এসে দাঁড়িয়েছে। বৈকালে নিমাইবাবু আমাকে দেখতে এসেছেন। বহুক্ষণ ধ'রে নাড়ী পরীক্ষা ক'রে মনে হ'ল, তাঁর মুখটা যেন একটু গম্ভীর হ'য়ে উঠল। ভাবলাম, তিন সপ্তাহের শেষে জ্বরটা ছেড়ে না গিয়ে আরও এক-আধ সপ্তাহ নেবে, হয়ত সেই কথা ভেবে নিমাইবাবু একটু বিষণ্ণ হয়েছেন। ঔষধপত্রের ব্যবস্থা ক'রে দেবার জন্য তিনি পিতাঠাকুর মহাশয়ের সহিত নীচে নেমে গেলেন।

মার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বললাম, "মা, মশারিটা তুলে দাও ত।"

আমার কথা শুনে মার মুখমণ্ডলে আতঙ্কের ছায়া দেখা দিলে; দাদাকে সম্বোধন ক'রে তিনি ভয়ার্তকণ্ঠে বললেন, "লালমোহন, উপীন ভুল বকছে; শীগগির নিমাইবাবু ডেকে আন।"

দাদা তাড়াতাড়ি নীচে চ'লে গেলেন। আমি দেখলাম, ভুলই বলেছি বটে, মশারি তোলাই আছে। মাতাঠাকুরাণীর অতি-ভয়ার্ততায় ঈষৎ বিরক্ত হ'য়ে বললাম, "আচ্ছা, কুড়ি-একুশ দিন জ্বরে ভুগছি, একটু যদি ভুলই হ'য়ে গিয়ে থাকে, তা হ'লে বলতে হবে—ভুল বকছে!"

শুনেছিলুম মিনিট চার-পাঁচেকের মধ্যে বাবা ও নিমাইবাবু আমার

পার্শ্বে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন, কিন্তু তারই মধ্যে আমি বিকারের চরম স্তরে উপনীত হ'য়ে উন্মত্তভাবে চীৎকার করছি, 'চামার! চামার!' কার প্রতি এই সৌজন্য প্রকাশ করেছিলাম, সেটা কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে প্রকাশ পায় নি।

অতঃপর দিন কুড়ি-বাইশ চলল একেবারে মহা-নিমগ্নতার পালা। চন্দ্র-সূর্য যার উঠেছে, তার উঠেছে; আমার ওঠে নি; দিবা-রাত্রি যার হয়েছে, তার হয়েছে; আমার হয় নি। জ্ঞান-জগতে যখন প্রথম প্রত্যাবর্তন করলাম, তখন বুদ্ধি স্তিমিত, অনুভূতি আচ্ছন্ন, স্মরণশক্তি লুপ্তপ্রায় এবং দৈহিক শক্তির পরিপূর্ণ বিরতি। নবজাত শিশুর অপরিণত চৈতন্য যেরূপ হয়, আমারও তখন কতকটা সেইরূপ অবস্থা।

শুনেছিলাম, ঐ ন দিন ন রাত, 'ন চন্দ্র ন সূর্য' দিনগুলিতে আমার উপর দিয়ে টাইফয়েডের টাইফুন-ঝটিকা প্রবাহিত হয়েছিল। ডবল-নিউমোনিয়া থেকে আরম্ভ ক'রে কোমা, ডিলিরিয়াম, বেড-সোর—কিছুই বাদ পড়ে নি। অসুখ বাড়াবাড়ি হ'তেই ভাগলপুরের অপর একজন বড় ডাক্তার, টাইফয়েড-স্পেশ্যালিস্ট, শিরীষচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নিমাইবাবুর সহিত চিকিৎসায় যোগ দিয়েছিলেন। শুনেছি, একদিন রাত্রি এগারোটার সময়ে আমার অবস্থার চরম অবনতিকালে, ভাইনাম গ্যালিসিয়া, মৃগনাভি ও মকরধ্বজের সর্বোচ্চ মাত্রা প্রয়োগ ক'রেও চিকিৎসকদ্বয় যখন আমার দ্রুত-অপচীয়মান জীবনীশক্তিকে উজ্জীবিত করতে সক্ষম হচ্ছিলেন না, তখন মাতাঠাকুরাণী সব কিছু লৌকিক উপায়ের অন্ত হয়েছে আশঙ্কা ক'রে পাগলিনীর ন্যায় পদব্রজে ছুটেছিলেন এক মাইল দূরস্থিত বুঢ়ানাথ মহাদেবের মন্দিরে। বাধ্য হ'য়ে তাঁর সঙ্গে বাড়ির আরও তিন-চারজন স্ত্রী-পুরুষকে ছুটতে হয়েছিল। ঘণ্টাখানেক পরে বাড়ি থেকে লোক গিয়ে যখন সংবাদ দিল, আমার অবস্থার উন্নতি হয়েছে, তখন মা উপুড়

হ'য়ে বুড়ানাথের সামনে প'ড়ে, কপালে রক্তের চিহ্ন। সাষ্টাঙ্গে বুড়ানাথকে প্রণাম ক'রে ফুল-বিল্বপত্র নিয়ে মা যখন গৃহে ফিরলেন, তখন আমার হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়া পুনরায় বোঝা যেতে আরম্ভ হয়েছে।

নিমাইবাবু বলেছিলেন, তাঁর সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতার মধ্যে মাত্র দুটি টাইফয়েড রোগীকে এরূপ সাংঘাতিক অবস্থা থেকে সেরে উঠতে দেখেছিলেন—আমাকে এবং একটি সতের বৎসর বয়সের মুসলমান বালককে।

পথ্যের পরিমাণ এবং প্রকারের ক্রমোন্নতির সহিত হারানো শক্তিগুলি পুনরায় ফিরে পেতে লাগলাম। মেজদিদির কথা মনে পড়তে আরম্ভ করেছে; কিন্তু কেউ আমাকে তাঁর কথা বলে না ব'লে আমিও কাউকে জিজ্ঞাসা করতে সাহস পাই নি—কি জানি, কি কথা শুনতে হয়! মনটা তাঁর জন্য উৎসুক ও উদ্বিগ্ন হ'য়ে থাকে।

সহসা দৈব একদিন আমার সংশয়ের নিরসন ক'রে দিলে। জ্বর ত্যাগ হয়েছে প্রায় দিন কুড়িক, তখনো কিন্তু আমি সম্পূর্ণ উত্থাপনশক্তিরহিত। বৈকালের দিকে জাগ্রত অবস্থায় শুয়ে আছি, হঠাৎ ঘরে প্রবেশ করলে শরৎ। আমার সঙ্গে চোখোচোখি হ'তেই জিভ কেটে পালিয়ে গেল। মাথা তার ন্যাড়া। শরৎ হয়ত ভেবেছিল, আমি হয় ঘুমিয়ে, নয় পাশ ফিরে শুয়ে আছি।

শরতের ন্যাড়া মাথার অর্থ বুঝতে বিলম্ব হ'ল না। আঘাত পেলাম, কিন্তু দুর্বল চিত্তে আঘাতের চোটও বোধ হয় তেমন সবল হ'তে পারে না। সন্নিপাতিকের মহাসাগরতলে আমি যখন নিমগ্ন, সেই সময়ে মেজদিদি পরলোকগমন করেছেন।

দিন দুয়েক পরে মাকে বললাম, "মা, প্রভাসকে ডেকে দাও—একটু গল্প করব।"

মা বললেন, "তোমার ছোঁয়াচে অসুখ হয়েছিল; আর দিনকতক যাক, তারপর প্রভাস আসবে।"

আমি বললাম, "আসছ ত ঘরে সবাই, এক শরৎ আর প্রভাস ছাড়া। আমি জানতে পেরেছি, মেজদিদি মারা গেছেন।"

বিস্মিতকণ্ঠে মা বললেন. "কে তোমাকে বললে?"

বললাম, "কেউ বলে নি, ন্যাড়া মাথা নিয়ে শরৎ পরশু ঘরে ঢুকে পড়েছিল।"

দুঃখের মধ্যেও মার মুখে মৃদু হাস্যের আমেজ দেখা দিল; বোধ হয় মনে মনে ভাবলেন, ধর্মের কল বাতাসে এমনি ক'রেই নড়ে। প্রকাশ্যে বললেন, "তোমার মনে কষ্ট হবে ব'লে ও আসত না। আচ্ছা, প্রভাসকে ডেকে দোব।"

শরতের কনিষ্ঠ ভাই প্রকাশের না-আসা আমি ধর্তব্যের মধ্যে আনি নি—বয়সে আমি তার নাগালের অনেক বাইরে।

ক্ষণকাল পরে প্রভাস এসে হাজির হ'ল। আমার খাটের পাশে একটা টুল টেনে নিয়ে ব'সে আমার একটা হাত ধ'রে হাসিমুখে বললে, "কেমন আছ উপীনমামা? ভাল আছ?"

সে কথার কোনও উত্তর না দিয়ে বললাম, "হ্যারে প্রভাস, মেজদিদি চ'লে গেলেন? কিছুতেই রইলেন না?"

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ ক'রে প্রভাস বললেন, "নাঃ! কিছুতেই না।"

"কবে মারা গেলেন?"

"দিন কুড়ি-বাইশ হবে।"

বললাম, "তুই আমার কাছে আসতিস নে কেন বল্ দেখি? বিকারের ঝোঁকে 'প্রভাস আমার লাটাই নিয়ে গেল! প্রভাস আমার লাটাই নিয়ে গেল!' ব'লে চেঁচাতাম, তাই রাগ করেছিলি?"

ভুরু কুঁচকে প্রভাস বললে, "দূর ! তাই কখনো কেউ করে ? বোমা মামা (আমার দাদা) কাঁচি দিয়ে তোমার চুল ছেঁটে দিচ্ছিলেন, তুমি যে তাঁকে নাপিত মনে ক'রে ঠাস ক'রে তাঁর গালে চড় বসিয়ে দিয়েছিলে, তাইতে কি তিনি তোমার ওপর রাগ করেছিলেন ? বিকারের রুগী আর পাগল ত একই ধরনের মানুষ।"

কিছুক্ষণ গল্প ক'রে প্রভাস চ'লে গেল।

বৈকালের দিকে শরৎ এসে হাজির হ'ল। হাসতে হাসতে বললে, "আমার ন্যাড়া মাথা দেখে তুই ভেবে নিলি কেন উপীন, মা মারা গেছেন ? আমার নামই ত ন্যাড়া।"

আমি বললাম, "তোমার নাম ন্যাড়া হ'তে পারে, কিন্তু মাথায় ত তোমার বড় বড় চুল ছিল !"

মেজদিদির মৃত্যুতে আমি দুঃখ প্রকাশ করতে শরৎ বললে, "মা মারা গেছেন, সে একরকম ভালই হয়েছে উপীন।"

বিস্মিত ও আহত হ'য়ে বললাম, "কেন ?"

শরৎ বললে, "এক বাড়িতে দুজন রুগীর অবস্থা অত বাড়াবাড়ি হ'লে একজন মারা না গেলে, আর একজন ভাল হয় না। তুই ছেলেমানুষ, তুই ভাল হ'য়ে উঠেছিস, এ কত আনন্দের কথা।"

এ কথার মধ্যে আমার প্রতি শরতের মমতা প্রকাশ পেলেও, কথাটা আমার তেমন ভাল লাগল না। প্রতিবাদস্বরূপ বললাম, "কিন্তু দুজনে ভাল হ'য়ে উঠলে, আরও কত ভাল হ'ত !"

শরৎ বললে, "তা ত হ'তই, কিন্তু অত ভাল সব সময়ে হয় না।"

আমার সহিত বেশী কথা কওয়া তখনো বোধ হয় নিষিদ্ধ ছিল, অল্পক্ষণ পরেই শরৎ চ'লে গেল।

আমার অসুখের খুব বাড়াবাড়ির সময়ে আরোগ্য-কামনায় কালীপূজা মানত করা হয়েছিল। মুঙ্গের থেকে আমাদের কুল-পুরোহিত রামচন্দ্র ভট্টাচার্য এসেছেন পূজা করতে।

প্রত্যুষেই হাসিতে ও কাশিতে তাঁর আগমনবার্তা ঘোষিত হয়েছিল। গল্প করতে করতে তিনি যত হাসেন, তামাক খেতে খেতে তত কাশেন। যখন তামাক খেতে খেতে গল্প করেন, তখন হাসি ও কাশির ঐকতানিক লহরা চলতে থাকে। উগ্র গৌরবর্ণ দেহ, তার উপর খাড়া নাকে আর মাথার টাকে পুরাদস্তুর বামুন-পণ্ডিতি চেহারা; সরল অন্তঃকরণ, আমাদের পারিবারিক বন্ধু।

স্থানীয় কারিকরের বাড়ি থেকে প্রতিমা গড়িয়ে এসেছে। সারাদিন মহা উৎসাহ ও উল্লাসে পূজার উদ্যোগ-আয়োজন চলার পর রাত্রে পূজা আরম্ভ হয়েছে। অন্দর-মহলের যে দ্বিতল কক্ষে আমি থাকি, একেবারে পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত ব'লে তার জানলা চণ্ডীমণ্ডপের প্রাঙ্গণে খোলে। আমার শয্যা থেকে পূজার হৈ-চৈ, এমন কি, মন্ত্রপাঠের অস্পষ্ট গুঞ্জন পর্যন্ত শুনতে পাচ্ছি।

বাড়ির অধিকাংশ লোকই চণ্ডীমণ্ডপ-বাড়িতে সমবেত হয়েছেন। দ্বিতলের ঘরে আমার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আছেন আমার মেজ ভ্রাতৃজায়া —শ্রীযুত রমণীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের স্ত্রী স্বর্গীয়া শৈবলিনী দেবী। বয়সে ইনি আমার চেয়ে ঠিক দু বৎসরের বড় ছিলেন। স্বভাবের মাধুর্যে ও অন্তরের সুস্পষ্ট সরলতা-গুণে ইনি আমাদের পরিবারস্থ সকলের সবিশেষ

শ্রদ্ধা এবং ভালবাসা অর্জন করেছিলেন। আমি তাকে 'শৈলদিদি' ব'লে সম্বোধন করতাম।

কিছুক্ষণ থেকে বেশ জোরে বাজনা বাজছিল; তারপর অল্প একটু বিরামের পর খুব জোরে বেজে উঠেই সহসা একেবারে থেমে গেল। হঠাৎ সব চুপচাপ, শুন্‌শান্‌।

আমি বললাম, "শৈলদিদি, বুঝতে পারছ, কি হয়েছে?"

সকৌতূহলে শৈলদিদি বললেন, "কি হয়েছে?"

"পাঁঠা বেধে গেছে।"

বলি বেধে যাওয়া অতীব অশুভজনক লক্ষণ। তার সরল অর্থ, পূজায় দেবী প্রসন্না হন নি; ফলে ব্যাধির পুনরাক্রমণ এবং শেষ পর্যন্ত শোচনীয় দুর্ঘটনা।

আমার কথা শুনে শৈলদিদি বেচারার মুখ শুকিয়ে চুন! এত সেবা-শুশ্রূষা, সাধ্য-সাধনা, রাত-জাগাজাগির পর কূলে-তোলা এমন সাধের ঠাকুরপোটিকে যদি সামান্য একটা বলির ফেরে পুনরায় জলে ভাসিয়ে দিতে হয়, তার চেয়ে হৃদয়বিদারক কাণ্ড আর কি হ'তে পারে! আমাকে সান্ত্বনা দেবার ছলে, আসলে বোধ হয় নিজেকেই সান্ত্বনা দেবার উদ্দেশ্যে, যথাসাধ্য দৃঢ়তা সঞ্চয় ক'রে বললেন, "কক্ষনো না, ও তুমি ভুল বুঝেছ।"

বললাম, "ভুল বুঝেছি, কি ঠিক বুঝেছি, নীচে গেলেই জানতে পারবে। বলিদানের বাজনা শোনায় এ দু কান এত পাকা যে, ভুল বোঝবার উপায় নেই।"

আমার অনুমান অবশ্যই ভুল হয় নি—পাঁঠা বেধে গিয়েছিল। আমাদের বাড়িতে ষাট-পঁয়ষট্টি বৎসর ধ'রে, জগদ্ধাত্রী-পূজা উপলক্ষ্যে বলি হ'য়ে আসছে। প্রথম প্রথম এক দিনের পূজায় নয়টা ক'রে ছাগ বলি হ'ত, কিন্তু এ পর্যন্ত কোনদিন এরূপ ব্যাপার ঘটে নি। একটা গুরুতর

অমঙ্গলের আশঙ্কায় পিতাঠাকুর মহাশয় ও মাতাঠাকুরাণী প্রতিমার সম্মুখে উপুড় হ'য়ে পড়লেন।

এই মহা অকল্যাণের ব্যাপারের প্রতিকার অবশ্য আছে; কিন্তু সেই কঠিন ও দুঃসাধ্য অনুষ্ঠান যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে সামান্য মাত্রও ত্রুটি ঘটলে স্বয়ং হোতার সমূহ আনষ্টের আশঙ্কা। সেইজন্য সহজে কেউ এই দুষ্কর কার্যে ব্রতী হ'তে চায় না।

রামচন্দ্র ভট্টাচার্য কিন্তু প্রস্তুত হলেন। তিনি আমাদের বহুদিনের কুলপুরোহিত, আত্মীয়ের মতই নিজেকে বিবেচনা করেন,—আমাদের বংশের এত বড় একটা অমঙ্গল অনিরাকৃত রেখে দেবার ভীরুতাকে তিনি প্রশ্রয় দিলেন না। তা ছাড়া, মাতাঠাকুরাণীর ও পিতাঠাকুর মহাশয়ের কাতরতা দেখে তিনি গভীরভাবে বিচলিত হয়েছিলেন।

তখন সেই মহাহোমের আয়োজনে সমিধ্‌ ও গব্যঘৃত সংগ্রহের জন্য দিকে দিকে উদ্যমশীল লোক ধাবিত হ'ল। বিল্বকাষ্ঠ ও ঘৃত বাড়িতেও কিছু পরিমাণ ছিল, আপাতত তাই দিয়েই কার্য আরম্ভ হ'য়ে গেল। ঐ অখণ্ডিত ছাগদেহ, ছুরি-বঁটি প্রভৃতি অস্ত্রের সাহায্যে অতি ছোট ছোট টুকরায় কাটা হ'তে লাগল। তারপর প্রবলভাবে হোমানল প্রজ্বলিত হ'য়ে উঠলে, মন্ত্র পাঠ ক'রে ক'রে এক-একটি মাংসের টুকরা—মায় অস্থি, রক্ত ও লোম অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হ'তে লাগল। মাংসখণ্ডের দহনকার্য যাতে ত্বরিত এবং পরিপূর্ণ হয়—অর্থাৎ কুণ্ডের ভিতর হ'তে কোনপ্রকার দুর্গন্ধ বায়ুমণ্ডলে নিষ্ক্রান্ত হ'তে না পারে, তজ্জন্য ঘন ঘন সমিধ্‌ ও গব্য-ঘৃতের প্রয়োগে যজ্ঞাগ্নিকে চরম মাত্রায় জ্বালিয়ে রাখা হয়েছে। গভীর নিষ্ঠার সহিত সারারাত্রি ধ'রে এই সুদুষ্কর কার্য চলল। অবশেষে শেষ মাংসখণ্ড যখন যজ্ঞকুণ্ডে অর্পিত হ'ল, তখন পূর্বাকাশ লাল হ'য়ে উঠেছে।

পাঁঠা বেধে যাওয়ার কথা আমি যে জানতে পেরেছি, তা রাষ্ট্র হ'য়ে

গিয়েছিল। মা এসে আমার মাথায় ফুল-বিল্বপত্র ছুঁইয়ে চরণামৃত খাইয়ে দিলেন। ক্ষণকাল পরে পিতাঠাকুর মহাশয়ের সহিত সহাস্যমুখে ঘরে প্রবেশ করলেন রামচন্দ্র ভট্টাচার্য। আমাকে শান্তিজল দিয়ে আশীর্বাদ ক'রে বললেন, "মা-কালী পূজায় খুব প্রসন্ন হয়েছেন উপেন। সারারাত্রি ধ'রে আস্ত ছাগটি তিনি একলা খেয়েছেন; আমাদের জন্য একবিন্দুও প্রসাদ রাখেন নি।" ব'লে পিতাঠাকুর মহাশয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে তাঁর সেই পেটেণ্ট হাসি হেসে উঠলেন।

শুনলাম, পাঁঠা বেধে গিয়ে হোম যদি সুসম্পন্ন হয়, তা হ'লে বৎসরাবধি সৌভাগ্যের আর আদি-অন্ত থাকে না। সেরূপ পাঁঠা বেধে যাওয়ার কল্যাণ, পাঁঠা না-বেধে যাওয়ার কল্যাণকে বহু মাইল পশ্চাতে ফেলে যায়।

স্বভাবত আমি অবিশ্বাসী। কিন্তু যে কারণেই হোক, পাঁঠা বেধে যাওয়ার পর এক বৎসর কাল আমাদের, চলিত ভাষায় যাকে বলে— 'ধুলোমুঠো ধরলে সোনামুঠো হয়,' ঠিক সেই ব্যাপারই হয়েছিল। আমাদের মনের মধ্যে সংস্কার এবং কুসংস্কারের মূলগুলি হয়ত এইরূপ কাকতালীয় ঘটনার সাহায্যেই দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হ'য়ে ওঠে।

৯

শরতের ডাকনাম ছিল ন্যাড়া। জন্মকালে বোধ হয় তার মাথায় চুল খুব কম ছিল ব'লে ঐ নামে তাকে ডাকা হ'ত। কিন্তু দেবানন্দপুর থেকে ভাগলপুরে মামার বাড়ি আসার পর তার ন্যাড়া নাম খুব বেশি চলে নি। শরতের পিতা মতিদাদা আর মাতা আমাদের মেজদিদি শরৎকে ন্যাড়া ব'লে ডাকতেন; কিন্তু কখনো-সখনো, কতকটা শখ ক'রে, এক-আধজন ছাড়া আর বড় কেউ ও-নামে ডাকত না। এমন কি, শেষাশেষি মতিদাদা এবং মেজদিদিও ন্যাড়া ও শরৎ দুই নামেই মিলিয়ে-মিশিয়ে ডাকা আরম্ভ করেছিলেন, তা বেশ মনে পড়ে। কিন্তু কি জানি কেন, মতিদাদার মুখে শুনে শুনেই বোধ করি, আদমপুর ক্লাবে শরতের ন্যাড়া নাম প্রায় ষোল আনা চলিত হ'য়ে গিয়েছিল।

আদমপুর ক্লাবের প্রধান ক্রিয়াশীলতা ছিল সঙ্গীতচর্চা, টেনিস খেলা, বিলিয়ার্ডস খেলা ও মাঝে মাঝে থিয়েটারের নাটক অভিনয় করা। কিন্তু সর্বপ্রধান ক্রিয়াশীলতা ছিল আড্ডা দেওয়া। মফস্বলে এবং কলিকাতায় অনেক ক্লাব দেখেছি, কিছু কিছু ক্লাব আমরা নিজেরাও চালিয়েছি; কিন্তু আদমপুর ক্লাবের মতো অমন সুনিবিড়ভাবে জমা ও মজা আর একটি ক্লাব কোথাও দেখেছি ব'লে মনে পড়ে না। আদমপুর ক্লাবের প্রধান ক্রিস্টাল ছিলেন রাজা শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের একমাত্র পুত্র কুমার সতীশচন্দ্র। তাঁকে অবলম্বন ক'রে অন্য যে সকল ক্রিস্টাল জোট বেঁধেছিল, তন্মধ্যে কয়েকটির নাম,—শরৎ মজুমদার, বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায়, ভাগিনেয় শরৎচন্দ্র, উপীন্দা (উপেন্দ্র) লাহিড়ী, সতীশ বসু, মণি মজুমদার, সুকুমার মৈত্র, রাজেন মজুমদার ('শ্রীকান্ত'র অন্তর্গত ইন্দ্রনাথ চরিত্রের উৎস ব'লে

অনুমিত) ও রাজেন গাছি। আরও কয়েকজন প্রধান সদস্যের কথা মনে পড়ছে, কিন্তু তাঁদের নাম মনে করতে পারছি নে। বহুবিধ গুণ-সমষ্টির প্রভাবে কুমার সতীশচন্দ্র ছিলেন কেন্দ্র হবার উপযুক্ত পাত্র। সুশ্রী আকৃতি, সুমিষ্ট প্রকৃতি, অমায়িক ব্যবহার, উদার অন্তঃকরণ, দরাজ হস্ত—এ সকল গুণ ত তাঁর ছিলই; তদুপরি তিনি ছিলেন অতিশয় সুকণ্ঠ গায়ক; হার্মোনিয়ম বাজাতে পারতেন এত ভাল যে, আড়াল থেকে শুনলে মনে হ'ত না, যা বাজছে তা হার্মোনিয়মের মতো সামান্য যন্ত্র। টেনিসে তাঁর খেলার শৈলী ছিল উচ্চাঙ্গের; আর বিলিয়ার্ডসে ভাগলপুরে তিনি ছিলেন দুর্ধর্ষ,—শুধু ভারতীয়দের মধ্যেই নয়, ইউরোপীয়ানদেরও মধ্যে। ভাল বিলিয়ার্ডস খেলোয়াড় উচ্চ ইংরেজ রাজকর্মচারী এলে রাজা সাহেব পুত্রের সহিত বিলিয়ার্ডস খেলবার জন্য তাঁদের আমন্ত্রিত করতেন। কিন্তু কদাচিৎ কারও ভাগ্যে কুমার সাহেবকে পরাজিত করবার গৌরব দেখা যেত।

আমরা কয়েকজন বন্ধুবান্ধব আদমপুর ক্লাবের বিশেষ অনুরাগী ভক্ত ছিলাম। বয়সে আমরা আদমপুর ক্লাবের সদস্যদের চেয়ে মোটামুটি বছর ছয়-সাতের ছোট ছিলাম ব'লে ক্লাবের খাস-মহলের পরিধির মধ্যে আমাদের স্থান ছিল না বটে, কিন্তু তার অব্যবহিত বহির্ভাগে যতটা সান্নিধ্য বজায় রাখা সম্ভব, তা আমরা রেখে চলতাম। টেনিস-গ্রাউণ্ডে আমরা কোর্টের বাইরে নিকটেই অবস্থান করতাম, আর সুযোগ পেলেই বল কুড়িয়ে দিতাম; যখন মজলিস বসত, আমরা ঘরের বাইরে বারান্দায় তাঁবেদারির অপেক্ষায় থাকতাম; কোনো ফাই-ফরমাশ পেলে তা তামিল ক'রে কৃত-কৃতার্থ হতাম। আমাদের আনুগত্য একেবারে অপুরস্কৃত যেত না; পৃষ্ঠপোষকোচিত আচরণ এবং মাঝে মাঝে তদপেক্ষা সারবান পদার্থের দ্বারা আমরা আপ্যায়িত হতাম।

নাটক অভিনয়ের সময় উপস্থিত হ'লে আমরা কিন্তু অনিবার্য হ'য়ে পড়তাম। উদ্যোগ পর্ব থেকেই ক্লাবের সীমান্তরেখা অতিক্রমপূর্বক খাশ-মহলের প্রাঙ্গণে প্রবেশ ক'রে নানাবিধ উপায়ে আমরা আমাদের মূল্যবানতার প্রমাণ দিতাম। পার্ট নকল করা থেকে আরম্ভ ক'রে অভিনয়-রজনীতে সীন ওঠা-নামার দড়ি টানাটানি পর্যন্ত যাবতীয় জুন্নিদারির কাজ আমরা সানন্দে সম্পন্ন করতাম।

একবার বিখ্যাত নাট্যকার অমৃতলাল বসুর 'তাজ্জব ব্যাপার' প্রহসনের অভিনয় হচ্ছে। আমি একটা উইংসের পাশে সীনের দড়ি ধ'রে ব'সে আছি; প্রম্পটার আমার পাশে দাঁড়িয়ে প্রম্পটিং করছে, পাশে আর একজন জ্বলন্ত মোমবাতি হাতে দাঁড়িয়ে প্রম্পটারকে আলো দেখাচ্ছে। হঠাৎ আমি উপর দিকে চাইতেই—এমনই যোগাযোগের ব্যাপার—গলন্ত মোম এসে পড়ল একেবারে আমার ডান চোখের ভিতর। চোখের যন্ত্রণার ত কথাই নেই, সমস্ত শরীর একটা দুর্বিষহ বেদনায় আর্ত হ'য়ে উঠল। মনে হ'ল, যেন চক্ষুর ভিতর দিয়ে এক রাশ বিদ্যুৎ-প্রবাহ সারা দেহের মধ্যে ছড়িয়ে গেল।

দুই চক্ষু বুজে প্রাণপণে কষ্ট সহ্য ক'রে সীনের দড়ি টেনে ধ'রে কোনো প্রকারে ব'সে রইলাম। মিনিট পাঁচ-সাত পরে দৃশ্য পরিবর্তিত হ'তেই দড়ি ছেড়ে দিয়ে প্রম্পটারকে দু-চার কথায় আমার অবস্থাটা বুঝিয়ে বাড়ি ছুট দিলাম।

দিন চারেক পরে আদমপুর ক্লাবে গেছি। তখনো চোখটা সামান্য লাল হ'য়ে রয়েছে। আমাকে দেখতে পেয়েই কুমার সতীশ তাড়াতাড়ি আমার কাছে এসে আমার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললেন, "শাবাশ! আমি সুকুমারের মুখে সব শুনেছি। তুমি যে অত যন্ত্রণার মধ্যেও সীনের দড়ি ছেড়ে দিয়ে অভিনয়ের মধ্যে একটা গণ্ডগোল ঘটাও নি, এর দ্বারা

তুমি অত্যন্ত প্রশংসনীয় কর্তব্যবোধের পরিচয় দিয়েছ।" তারপর হাসতে হাসতে বললেন, "আমি যদি ব্রিটিশ গভর্মেণ্ট হ'তাম, তা হ'লে তোমাকে এ সৎকার্যের জন্যে ভিক্টোরিয়া ক্রশ মেডেল দিতাম।"

শুনে আমার মনে হ'ল, হায়, হায়! আমার দু চোখেই কেন সেদিন মোমবাতি পড়ে নি!

আমার ডান চক্ষু লক্ষ্য ক'রে কুমার সতীশ বললেন, "তোমার চোখ ত এখনও লাল হ'য়ে রয়েছে উপেন!"

বললাম "এখন ত প্রায় নেই, এর চেয়েও অনেক বেশি লাল হ'য়ে ছিল।"

বজ্রকণ্ঠে কুমার সতীশ বললেন, "তা আমি জানি, জবাফুলের মতো লাল হয়েছিল, ল্যাড়ার মুখে শুনেছি।"

ল্যাড়া,—অর্থাৎ ন্যাড়া, অর্থাৎ পরবর্তী কালের প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। আদমপুর ক্লাবের অধিকাংশ সদস্য শরৎচন্দ্রকে ন্যাড়ার পরিবর্তে ল্যাড়া ব'লে ডাকতেন। আমার বিশ্বাস, আদমপুর ক্লাবের সদস্যদের ব্যবহৃত এই ল্যাড়া শব্দটিকেই শরৎচন্দ্র ইউরোপীয় ছাঁচে ফেলে শুদ্ধি ক'রে নিয়ে Lara-য় দাঁড় করিয়েছিলেন। তখনকার দিনের অনেক কাগজপত্রে, অনেক খাতায় বইয়ে শরৎচন্দ্র নিজের নাম সই করতেন—St. C. Lara। আমরা বুঝতাম তার অর্থ, শরৎচন্দ্র ল্যাড়া; কিন্তু কোনো অজানা লোক আচমকা দেখে যদি মনে করত, হল্যাণ্ড কিংবা বেলজিয়াম দেশীয় সেণ্ট ক্রিস্টোফার লারা নামক কোনো সাধু মহাপুরুষ ঐভাবে নিজের নাম দস্তখৎ করেছেন, তা হ'লে তাকে দোষ দেওয়া চলত না।

যে সকল পরিবেশ অথবা অবস্থার মধ্যে থেকে শরৎচন্দ্র জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জন করবার সুযোগ লাভ করেছিলেন, আদমপুর

ক্লাব তন্মধ্যে অন্যতম সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। বাদ্যযন্ত্রের বিভিন্ন পর্দার মতো ক্লাবের সদস্যগণ এক স্বরগ্রামের অন্তর্গত হ'লেও প্রত্যেকে বিভিন্ন সুরের প্রকাশক ছিলেন। এরূপ একটি স্বরগ্রামের অন্তর্ভুক্ত হ'য়ে মানবচরিত্র অনুশীলন করার সুযোগ লাভ দুর্লভ সৌভাগ্য এবং সে অনুশীলনের মূল্যও যথেষ্ট বেশি।

আদমপুর ক্লাব শরৎচন্দ্রের জীবনের একটি বিশিষ্ট অধ্যায়।

চোখের সামনে মৃত্যু ঘটতে জীবনে অনেকবারই দেখেছি, কিন্তু এ বিষয়ে আমার প্রথমবারের অভিজ্ঞতা যেমন অপ্রত্যাশিত, তেমনি করুণ; আর তেমনি আমার মনের মধ্যে কিছুকাল ধ'রে গভীরভাবে একটা বৈরাগ্য-মিশ্রিত আতঙ্কের ছায়া বিস্তার ক'রে রাখার বিষয়ে অদ্বিতীয়। আতঙ্ক নিজের জীবনের অনিশ্চয়তার কথা ভেবে নয়; মানুষের জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, বাসনা-কামনা, কল্পনা-পরিকল্পনার ভিত্তি যে এত ভঙ্গুর সেই কথা ভেবে। যে সূত্রের উপর জীবন বিলম্বিত হ'য়ে থাকে, যে কোনো মুহূর্তে তা ছিন্ন হ'য়ে যাবার মতো দুর্বল, সে কথা জ্ঞানের মধ্যে জানা ছিল, কিন্তু চোখের উপর এমন ক'রে দেখা ছিল না।

হাইকোর্টের পূজার ছুটি হ'তে পরিবারস্থ সকলে ভাগলপুরে চ'লে গেলেন। ভবানীপুরের বাসায় তালা পড়ল। তখনকার দিনে বাড়িতে তালা লাগিয়ে,একটু নজর রাখবার জন্য প্রতিবেশীদের ব'লে ক'য়ে বিদেশে গমন করা চলত। আজকালকার মতো চোরেরা তখন এতটা তৎপর হ'য়ে ওঠে নি। এখন বাড়িতে লোক না রেখে, শুধু তালা বন্ধ ক'রে গেলে, রেলগাড়ি বর্ধমান পৌঁছবার সবুর সয় না, তারই মধ্যে তালা-চাবি ভেঙে ভাল ভাল মূল্যবান সামগ্রী বেছে-বুছে রামের ঘর হ'তে শ্যামের ঘরে গিয়ে উপস্থিতি হয়।

আমার কলেজ বন্ধ হ'তে তখনো দিন কুড়িক দেরি আছে। আমি আমার জিনিসপত্র নিয়ে বউবাজারে ৪ নং দুর্গা পিথুড়ীর লেনে কাকার বাসায় এসে উঠলাম। আমার কাকা অক্ষয়নাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়

কলিকাতার কালেক্টারিতে চাকরি করতেন। তাঁর তিন পুত্র,—জ্যেষ্ঠ ললিতমোহন, মধ্যম বঙ্কিমবিহারী ও কনিষ্ঠ বিপিনবিহারী। এই বিপিনবিহারীই বর্তমানে সুপ্রসিদ্ধ কংগ্রেস-নেতা শ্রীবিপিনবিহারী গঙ্গোপাধ্যায় এম. এল. এ.।

তখন বিপিন নিতান্ত লাজুক মুখ-চোরা শান্তপ্রকৃতির বালক ছিল। সে সময়ে তাকে দেখে কেউ কল্পনাও করতে পারত না যে, ভবিষ্যতে একদিন এই ফুটফুটে ছিপছিপে নিরীহ বালকটি একজন দুর্ধর্ষ লাঠিয়াল হ'য়ে পঞ্চাশজন শত্রুর মহড়া নিতে সক্ষম হবে এবং উত্তরকালে কংগ্রেসের পতাকাতলে উপস্থিত হ'য়ে একজন উচ্চশ্রেণীর অকৃত্রিম দেশকর্মী ব'লে নিজেকে প্রতিপন্ন করবে। বিপিন যখন দুর্দান্তভাবে ক্রিয়াশীল, তখন তাঁকে নিয়ে প্রবল ইংরেজ পুলিসের দুরূহ সমস্যার দুস্তর সলিলে নাকানি-চোকানি খাবার অন্ত ছিল না। বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হয়েছিলাম, তৎকালীন ইণ্ডিয়া গভর্মেণ্টের হোম ডিপার্টমেণ্টের কন্‌ফিডেন্সিয়াল পুলিস-রিপোর্টের পাতায় পাতায় 'বিপিন গাঙ্গুলী'র নামোল্লেখ দেখা যেত। একবার পুলিস কর্তৃক বিপিন ধৃত হওয়ার সংবাদ লাভ ক'রে সিমলার গর্ডন কাসেলে হোম ডিপার্টমেণ্টের একজন ইংরেজ কর্মচারীকে অপর এক ইংরেজ কর্মচারীর নিকট উপস্থিত হ'য়ে উল্লসিত কণ্ঠে বলতে শোনা গিয়াছিল,—That terrible Bepin Ganguli (বেপিন গাঙ্গুলী) has been caught !

চোখে ধুলো ছিটিয়ে পালিয়ে যাবার কৌশল আছে, সে কথা শুনেছি। কিন্তু ধূলির সাহায্য একদম না নিয়ে সম্পূর্ণ এক অভিনব উপায়ে বিপিন ভায়া একবার পুলিসকে ফাঁকি দিয়ে পলায়ন করেছিলেন। সে কাহিনী শুনলে পাঠকেরা নিশ্চয়ই একটু কৌতুক বোধ করবেন।

অতি প্রত্যূষে একদিন পুলিস এসে কাকার বাড়ির সদর ঘেরাও

ক'রে নিঃশব্দে অপেক্ষা করছে। ভিতরে থেকে কেউ দরজা খুললেই বিপিনকে ধরবার ব্যবস্থা করবে। সেদিন বিপিন গৃহে উপস্থিত আছে। সামনের বাড়ি থেকে ইশারা-ইঙ্গিতের সাহায্যে নির্বাক বার্তা পৌঁছে গেছে। পলায়ন করতে হ'লে পশ্চিম দিকের যে সদর-দরজায় পুলিস মোতায়েন রয়েছে, তাই দিয়েই করতে হয়; গৃহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হবার আর দ্বিতীয় উপায় নেই। কিছুক্ষণ পরে খট ক'রে খিল খোলার শব্দ হ'য়ে সুপ্রশস্ত দরজা প্রসারিত হ'য়ে খুলে গেল। বাইরের ঘরে প্রবেশ করিবার জন্য পুলিস সবে মাত্র পা বাড়িয়েছে, এমন সময়ে চক্ষের নিমেষে অতর্কিতে সাপটে মাল-কোঁচা মারা একটা শ্বেতবর্ণের পদার্থ সিংহবিক্রমে লাফ দিয়ে ইন্সপেক্টারের প্রায় কাঁধ বরাবর উঁচু হ'য়ে একেবারে গলির উপর পড়ল; তারপর মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না ক'রে বউবাজার স্ট্রীটের দিকে ছুট দিলে। হকচকিয়ে গিয়ে পুলিসরা সমস্বরে হাঁ-হাঁ রবে চিৎকার ক'রে উঠল। গলিতে দুই জায়গায় দুজন কন্সটেবল মোতায়েন ছিল, তারা একাদিক্রমে ঐ ছুটন্ত পদার্থকে জাপটে ধরবার চেষ্টা করলে, কিন্তু আটকে রাখতে পারলে না—দুই ঝট্‌কায় দুই কন্সটেবলের আলিঙ্গন থেকে মুক্তিলাভ ক'রে নগ্নপদে দুদ্দাড় ক'রে দৌড়ে ঐ পদার্থ বউবাজার স্ট্রীটের ফুটপাথের পথচারীদের মধ্যে গিয়ে মিশল।

বিপিন গাঙুলী কন্সটেবলদের করায়ত্ত হ'ল না; যা করায়ত্ত হ'ল তা বিপিন গাঙুলীর দেহের খানিকটা ক'রে সর্ষপ তৈল। পুলিসের আগমন-সংবাদ পেয়েই বিপিন মাল-কোঁচা মেরে সমস্ত দেহে বেশ ক'রে সরিষার তৈল মেখে নিয়েছিল। দু পায়ের আড়াই-সেরী বুট প'রে ধপড় ধপড় শব্দ করতে করতে বিপিনকে অনুসরণ ক'রে কন্সটেবলরা যখন বউবাজার স্ট্রীটের ফুটপাথে এসে উপস্থিত হ'ল, তখন বোধ হয় নিকটবর্তী কোনো গুপ্ত ঘাঁটিতে প্রবেশ ক'রে বিপিন কলের জলের ঝরনা খুলে স্নানে বসেছে।

এ গল্পটি আমার শোনা গল্প কিন্তু এত বিশ্বস্ত সূত্রে শোনা যে, এর সত্যতা সম্বন্ধে আমার মনে কোনও সন্দেহ নেই।

বংশগুণাধিকার (heredity) নামে একটা যে মতবাদ প্রচলিত আছে, বিপিনের ক্ষেত্রে তার ধারা খুঁজে পাওয়া যায় না। যাকে বলে মাটির মানুষ, কাকা ও খুড়িমা তাই ছিলেন। তবে বিপিন এত শৌর্য অধিকার করলে কোথা হ'তে? মানুষের মধ্যে 'ভোলানাথ' ব'লে কোন কিছু বস্তু যদি থাকে, কাকা ছিলেন তাই,—আকৃতিতেও, প্রকৃতিতেও। উগ্র গৌরবর্ণের নাতিস্থূল দেহ, মুখাবয়বে সরলতা এবং নির্মলতার এমন সুস্পষ্ট ছাপ যে, তাঁর শত্রুও মনে করত না, প্ররোচিত হ'য়েও তিনি কারও অনিষ্ট করতে পারেন।

আমি কাকার বাসায় আসবার চার-পাঁচ দিন পরেই ভাগলপুর থেকে শরৎচন্দ্র এসে উপস্থিত হলেন। আদমপুর ক্লাবে থিয়েটার হবে, স্ত্রী-ভূমিকায় অভিনয় করবার উপযুক্ত দুই-একটি বালক সংগ্রহ করাই প্রধান উদ্দেশ্য। তা ছাড়া, কিছু সাজসজ্জা ক্রয় অথবা ভাড়া করবার প্রয়োজনও বোধ হয় ছিল।

শরৎচন্দ্র আসার পর প্রতিদিন সকলে ও বৈকালে আমরা উভয়ে মিলিত হতাম। কাছেই কোনো মেসে শরৎচন্দ্র থাকতেন। আমাদের কাজ ছিল পথে পথে ঘুরে বেড়ানো, বউবাজারের চোরাবাজারে পুরাতন জিনিসপত্র ঘাঁটা ও কিছু কিছু কেনা এবং ক্ষুধার উদ্রেক হ'লে, এমন কি না হ'লেও, দোকানে ঢুকে পেট ভ'রে খাবার খাওয়া। একদিন শরৎ ও আমি থিয়েটার দেখেছিলাম। কোন্ থিয়েটার তা মনে পড়ছে না, কিন্তু সুলিখিত ঝরঝরে একটি নাটকের সু-অভিনয় দেখে আমরা দুজনে মুগ্ধ হয়েছিলাম। নাটকটির নাম "চক্ষুদান" অথবা "দৃষ্টিদান" অথবা ঐ রকম আর কিছু। সুমিষ্ট কণ্ঠে গাওয়া নাটকের অন্তর্গত একটি গান আমাদের

অতিশয় ভাল লেগেছিল। তার প্রথম লাইন মনে আছে, 'বল বল আবার বল, ভাল কথার মিছেও ভাল।'

একদিন, কি জানি কেন, রাত্রি দুটো-আড়াইটার সময় হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। শোবার সময়ে সহজ বাড়ি দেখেই শুয়েছিলাম,—অন্তত আমি তখন সেই রকমই বুঝেছিলাম; জেগে দেখি, বাড়িময় অসম্ভব চঞ্চলতা; চাপা গলায় অস্ফুট কথোপকথন, সিঁড়িতে ত্বরিত ওঠা-নামার পদধ্বনি, সকলের চলনে-বলনে একটা সন্ত্রাসের ভঙ্গী। উদ্বিগ্ন চিত্তে শয্যাত্যাগ ক'রে উঠে অবগত হলাম, কালীর প্রসববেদনা উপস্থিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, ইতিমধ্যে দুবার এক্লাম্‌সিয়া ফিট-এর আক্রমণও হ'য়ে গেছে।

কালী কাকার পনের-ষোল বছরের পরমাসুন্দরী কন্যা, আসন্ন প্রসবের প্রতীক্ষায় পিতা-মাতা-আত্মীয়-পরিজনের আদর ও যত্নের মধ্যে কিছুকাল হ'তে পিত্রালয়ে বাস করেছ। এইবার তার প্রথম প্রসব।

কালীর জন্য, কি জানি কেন, আমার মনে একটা উদ্বেগ লেগে থাকত। অতি যত্নের ফলেই বোধ হয়, দেহ তার একটু স্থূল হ'য়ে গেছে; অলস বিষণ্ণ-ভাবে সর্বদা শুয়ে ব'সে থাকে; কাজকর্ম কিছুই করে না, অথবা করতে দেওয়া হয় না; পা দুটি বেশ একটু ফোলা-ফোলা। মনে মনে ভাবতাম, কি ক'রে বেচারা ভালয়-ভালয় সন্তান প্রসব করবে!

শুনলাম, অবস্থা সঙ্কটাপন্ন মনে হওয়ায় ধাত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী ললিতদাদা গেছেন ডাক্তার কেদার দাসকে নিয়ে আসবার জন্য। কেদারনাথ দাস তখনকার দিনের কলিকাতার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রসূতি-চিকিৎসক। তাঁর সুনাম ভারতবর্ষ ছাড়িয়ে ইউরোপ ও আমেরিকা পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত।

একজন সহকারী ডাক্তার সহ কেদার দাস যখন উপস্থিত হলেন,

ততক্ষণে আরও একবার ফিট হয়েছে। বিবরণ শুনে ও রোগী পরীক্ষা ক'রে কেদার দাস মুখ বিকৃত করলেন। এক্লাম্সিয়ার ফিট একবার হওয়াই যথেষ্ট আশঙ্কার ব্যাপার, এ ক্ষেত্রে ত তিন-তিন বার! ডক্টর দাসের মুখ থেকে বিশেষ কিছু আশা-ভরসার কথা পাওয়া গেল না; কিন্তু তিনি সাহসী সৈনিকের ন্যায় অ্যাপ্রন পরিধান ক'রে, যন্ত্রপাতি নিয়ে অবিলম্বে রোগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন।

ঘরের ভিতরে ডাক্তারগণ, ধাত্রী ও খুড়িমা ছিলেন; আমারা ঘরের সম্মুখে উঠানে দাঁড়িয়ে উদ্বেগ-ব্যাকুল চিত্তে অপেক্ষা করতে লাগলাম। প্রায় ঘণ্টা দেড়েক পরে প্রসূতি-কক্ষের দ্বার খুলে কেদার দাস যখন বেরিয়ে এলেন, তখন প্রাঙ্গণে প্রত্যূষের স্তিমিত আলোক এসে পড়েছে।

শুনলাম, শিশুটি রক্ষা পায় নি, কিন্তু প্রসূতি জীবিত আছে; তবে গভীর অজ্ঞান অবস্থায় নিমগ্ন। ক্লোরোফর্ম হয়ত সে অবস্থার জন্য প্রধানত দায়ী।

ডক্টর দাসের পিছনে পিছনে আমরা বাইরের ঘরে এসে হাজির হলাম। সেবা ও ঔষধ সম্বন্ধে ধাত্রী ও ললিতদাকে প্রয়োজনীয় উপদেশাদি দিয়ে ডক্টর দাস প্রস্থানোদ্যত হলেন। কাতরকণ্ঠে কাকা জিজ্ঞাসা করলেন, "ডাক্তারবাবু, মেয়েটা বাঁচবে ত?"

কেদার দাস উত্তর দিলেন, "সে কথা ত ডাক্তাররা বলতে পারে না। তবে মেয়েটি যে প্রসব করানোর চোট কাটিয়ে উঠেছে, এ একটা আশার কথা।"

যাবার সময়ে ডক্টর দাস ব'লে গেলেন, সেবা-শুশ্রূষার জন্য কলেজের দুটি ছাত্রকে তিনি পাঠিয়ে দেবেন।

সকাল সাতটা আন্দাজ যথারীতি শরৎ এসে হাজির হ'ল। এক

রাত্রির ফেরে বাড়ির এরূপ অবস্থান্তর দেখে সে ত অবাক! সেদিন তার আর মেসে ফিরে যাওয়া হ'ল না।

বেলা আড়াইটে আন্দাজ বিনা নোটিসে কেদার দাস এসে হাজির। সঙ্গে দুটি মেডিক্যাল ছাত্র; বেলা নয়টার সময় যে দুটি ছাত্রকে পাঠিয়েছিলেন, তাদের বদলি।

তখনো কালীর অজ্ঞান অবস্থা চলেছে। পরীক্ষা ক'রে ডাক্তার বললেন, ভালও নয় মন্দও নয়,—একই অবস্থা। যাই হোক, আমরা তাতেই একটু আশ্বস্ত হলাম—রোগের সমভাবও ভাল। ভাটা বন্ধ হ'য়ে জীবন-নদী যদি থম্‌থমিয়ে থাকে, তা হ'লে যে-কোন মুহূর্তে জোয়ারের আশা করা যেতে পারে।

কাকা ফী দিতে উদ্যত হ'লে ডক্টর দাস বললেন, "কি আশ্চর্য! আপনি 'কল' দেওয়ায় আমি এসেছি না কি যে, ফী নোব? আপনার মেয়েটি নিরাপদ না হওয়া পর্যন্ত আবশ্যক মতো মাঝে মাঝে আসব, তার জন্যে আপনাকে কিছু দিতে হবে না।"

লক্ষ্মীর মতো রোগিণী আর মহাদেবের মতো রোগিণীর পিতাকে দেখে ডাক্তার বোধ হয় উৎসাহিত হয়েছিলেন।

ফী নিতে সম্মত না হওয়ায় কাকা ঈষৎ সঙ্কোচ বোধ করছেন বুঝতে পেরে কেদার দাস সহাস্যমুখে বললেন, "এর জন্যে আপনাকে কুণ্ঠিত হ'তে হবে না গাঙুলী মশায়। বেশ ত এক কাজ করলেই হবে। আপনি ত সন্দেশের পাড়ায় বাস করেন ভগবানের কৃপায় আপনার মেয়েটি ভাল হ'য়ে উঠুক, তারপর আমাকে টাকা পাঁচেকের উৎকৃষ্ট সন্দেশ আর এক জোড়া ফরাসডাঙার ধুতি-চাদর পাঠিয়ে দেবেন,—আমি খুব খুশি হব।"

এমন কথার পর কাকাকে অগত্যা নিবৃত্ত হ'তেই হ'ল। দুরূহ সমস্যার

সন্দেশের দ্বারা এমন সুমিষ্ট সমাধান হ'তে দেখে খুশি হ'য়ে গেলাম। ডাক্তারের মহানুভবতা দেখে আমার মনও খানিকটা মহানুভব হ'য়ে উঠল। কেবল মনে হ'তে লাগল, আমিও যদি এইরূপ কোনো একটা মহানুভবতা দেখাবার সুযোগ পাই ত নিশ্চয় দেখাই।

সন্ধ্যার সময়ে কেদার দাস এলেন, সকালে যে ছেলে দুটি এসেছিল তাদের সঙ্গে নিয়ে। এরা সারা রাত্রি আমাদের গৃহে থাকবে এবং পর্যায়ক্রমে রোগিণীর সেবা-শুশ্রূষা করবে। বলা বাহুল্য, এরা দুজনে আহারাদি করবে আমাদেরই গৃহে।

কালী তখনো একভাবেই অজ্ঞান হ'য়ে আছে। কিন্তু তাকে পরীক্ষা ক'রে দেখে ডক্টর দাসের মুখ ঈষৎ প্রফুল্ল ভাব ধারণ করলে। বললেন, "নাড়ী অনেকটা উন্নতি করেছে, দুর্বলতাও খানিকটা হ্রাস পেয়েছে।" শুনে আমাদেরও যেন খানিকটা দুর্বলতা হ্রাস পেলে।

ঘর থেকে সকলেই নিষ্ক্রান্ত হ'য়ে গেলেন, শুধু শরৎ ও আমি রইলাম কালীর কাছে। ঘরের সম্মুখে উঠানে দাঁড়িয়ে কেদার দাস ধাত্রী ও ছাত্রগণকে সমস্ত রাত্রির রোগী-পরিচর্যার বিস্তৃত উপদেশ দিচ্ছেন। ঘরে ব'সেও আমরা তা শুনতে পাচ্ছি। হঠাৎ শরৎ ব'লে উঠল, "ওরে উপীন, কালী যে ম'রে যাচ্ছে!"

চমকিত হ'য়ে কালীর মুখের দিকে চাইলাম। দেখলাম, তার ওষ্ঠাধর নিমেষের জন্য অল্প-একটু ফাঁক হ'য়ে বুজে গেল। শরতের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে ব্যগ্র কণ্ঠে বললাম, "কি বলছ শরৎ! ভুল করছ না ত?"

এ বিষয়ে শরৎ আমার চেয়ে অনেক অভিজ্ঞ: "না, বোধ হয় ভুল করছি নে" ব'লে সংক্ষেপে আমার কথার উত্তর দিয়ে, ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে কেদার দাসকে বললে, "ডাক্তারবাবু, একবার দেখবেন চলুন ত, কেমন যেন ভাল বোধ হচ্ছে না।"

দ্রুতপদে ঘরের ভিতর প্রবেশ ক'রে নত হ'য়ে ব'সে কেদার দাস কালীর মণিবন্ধ টিপে ধরলেন; তারপর আর-একটু জোরে আর একবার নাড়ী টিপে দেখে দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, "গন।"

কি সর্বনাশ! গন? চ'লে গেছে? এত সহজে, এত অবলীলাক্রমে একেবারে হাতের বাইরে? ফিরিয়ে আনবার আর কোনও উপায় নেই? জীবন কি তা হ'লে এমনই পিচ্ছিল বস্তু, যা কেদার দাসের মতো শক্তিমান ডাক্তারকে সামনে দাঁড় করিয়ে রেখেও ফসকে বেরিয়ে যেতে পারে!

এর পর চোখের উপর কত মৃত্যু ঘটতে দেখেছি, কিন্তু কালীর মৃত্যু-সভার সেই 'গন' শব্দের ভয়াবহতার তুলনা নেই। আজও সে শব্দের বৈরাগ্যগভীর ধ্বনি কানে লেগে আছে।

ক্ষণেকের জন্য যে আশার রশ্মি হৃদয়ে দেখা দিয়েছিল, একটা বুকফাটা ক্রন্দনের রোলে তা সমাধি লাভ করলে।

১১

মৃত্যু জীবনের পূর্ণচ্ছেদ অথবা মৃত্যুর পরও জীবন কোনো প্রকারে নিজের জের টেনে চলে,—তা সে "আকাশস্থো নিরালম্বঃ বায়ুভূতো নিরাশ্রয়ঃ" হ'য়েই হোক অথবা অবিনশ্বর আত্মার মধ্যে নিজের সত্তাকে গুটিয়ে নিয়েই হোক,—সে বিষয়ে এত বাদ-প্রতিবাদ, এত তর্ক-বিতর্ক, এত বিশ্বাস-অবিশ্বাসের অবকাশ আছে যে, বিষয়টা আজ পর্যন্ত মোটের উপর রহস্যই থেকে গেছে।

আইন-শাস্ত্রে highly probable এবং highly improbable নামে দুটি তত্ত্ব আছে, মাত্র যার উপর নির্ভর ক'রে অভিযুক্তকে দণ্ড অথবা মুক্তি দেওয়া চলে। পরলোকতত্ত্বে যাঁরা সুপণ্ডিত, পরলোক বিষয়ে যাঁদের গভীর গবেষণা এবং মননশীলতা আছে, তাঁহাদের প্রমাণ-পরীক্ষা অবগত হ'লে, যুক্তি-বিচার শুনলে, পরলোক highly probable হয়; কিন্তু তদপেক্ষা এক ইঞ্চিও বেশি কিছু হয় না। এতদিন চেষ্টা-চরিত্র চলেছে, কিন্তু ইহলোক ও পরলোককে যুক্ত ক'রে এ পর্যন্ত নির্ভরযোগ্য সেতু নির্মিত হ'ল না। যে উপকরণ অলৌকিককে গ'ড়ে তোলে, বিশ্লেষণ ক'রে দেখলে দেখতে পাই তার প্রায় ষোল-আনাই সংস্কার অর্থাৎ কুসংস্কার। ভৌতিক বিবেচনা ভূতের ভয়ের মধ্যে এমন আশাহীনভাবে তলিয়ে গেছে যে, দম আটকে তার মধ্যে সে বেচারা বোধ হয় মারাই পড়েছে।

গভীর রাত্রে দরজা খুলে দেখি, উঠানের ঈশান কোণে জ্যোৎস্নালোকে

দাঁড়িয়ে অশরীরী প্রেতাত্মা হাতছানি দিচ্ছে। বিনা বাক্যব্যায়ে দরজায় খিল লাগিয়ে লেপের মধ্যে আশ্রয় নিই। পরদিন সকালে উঠে দেখি, সূর্যকিরণেও ঈশান কোণে হাতছানি দিচ্ছে বটে কিন্তু প্রেতাত্মা নয়, আকন্দ গাছের পাতা। এ অবস্থায় অশরীরী প্রেতাত্মাকে উঠানের ঈশান কোণ থেকে বিদায় নিতে হয় বটে, কিন্তু একেবারেই বিদায় নেয় না; ঈশান কোণ থেকে বিদায় নিয়ে প্রেতাত্মা বাসা বাঁধে আমার আপন অন্তরাত্মার মধ্যে। এমনিভাবেই প্রধানত ভূতের ভয়ের ল্যাবরেটারিতেই ভৌতিক বিজ্ঞান জন্মগ্রহণ করে।

সে যাই হোক, আজ আমি একান্ত নিষ্ঠার সহিত যে কাহিনীটি বিবৃত করব, তার দ্বারা পরলোকের সেতু নির্মিত না হোক, অন্তত ইহলোকের কঠিন যবনিকার গাত্রে একটা ছিদ্র নির্মিত হ'য়ে পরলোকের খানিকটা অংশ যে দেখা গিয়েছিল, সে কথা কতকটা নিশ্চয়তার সহিত বলা যেতে পারে। ১৯৪২ সনে দেওঘরে অবস্থানকালে এই কাহিনীটি আমি সুপ্রসিদ্ধ পরলোকতত্ত্ববিদ্‌ ডাক্তার সরসীলাল সরকার মহাশয়ের নিকট বলেছিলাম। গল্পটি শুনে যৎপরোনাস্তি খুশি হ'য়ে তিনি বলেছিলেন, পরলোকবাদের প্রমাণ হিসাবে এ গল্প অমূল্য; এবং গল্পটি লিখে প্রকাশ করবার জন্য আমাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু শাস্ত্রের উপদেশ হচ্ছে, যে কথা অলৌকিক, যা শুনে লোকে বিশ্বাস করবে না, এমন কি, হয়ত উপহাস করবে, তেমন কথা জনসমীপে প্রকাশ ক'রে তার অনির্বচনীয়তা নষ্ট করবে না। শাস্ত্রের আর একটি উপদেশ, শতং বদ, মা লিখ—একশ' বার ব'লো, কিন্তু লিখো না। আমি শেষোক্ত উপদেশটি পালন ক'রে গল্পটি এ পর্যন্ত বহু লোককে বলেছি, কিন্তু লিখি নি। আজ স্মৃতিকথা লিখতে ব'সে বোধ হয় কালীর মৃত্যু-কাহিনীর দ্বারা অনুপ্রাণিত হ'য়েই গল্পটা না লিখে পারলাম না।

আমি তখন ভাগলপুরে ওকালতি করি। সকালে মক্কেল নিয়ে বসি; আশা-নিরাশা, আনন্দ-নিরানন্দ, প্রতারিত হওয়া প্রতারিত করা নিয়ে দ্বিপ্রহর কাটে আদালতে; বৈকালে গৃহে ফিরে চোগা-চাপকানের বিজাতীয় খোলস থেকে আর্ত্ত দেহকে খালাস ক'রে, চা খাবার খেয়ে ছুট দিই 'ভাগলপুর ইন্‌ষ্টিটিউটে'। সেখানে টেনিস, ব্যাডমিণ্টন, বিলিয়ার্ডস্, বই, সংবাদপত্র, গান-বাজনার বিচিত্র অয়োজন। কিন্তু সবচেয়ে বড় আকর্ষণ উত্তর দিকের সুবিস্তৃত বারান্দায় আকাশের চন্দ্রাতপতলে ঈজি-চেয়ারে অর্ধশায়িত অবস্থায় ব'সে রাজা-রুজি মারা আর গালগল্প ওড়ানো। ইন্‌ষ্টিটিউট থেকে ফিরে যদি মক্কেল থাকে ত কাজে বসি, নচেৎ আহার সমাপন ক'রে আইন এবং সাহিত্য নিয়ে গভীর রাত্রি পর্যন্ত জেগে কাটাই।

এইভাবে এক নিয়মে এক ছন্দে জীবন অতিবাহিত হ'য়ে চলেছে। এমন সময় হঠাৎ একদিন বৈকালবেলা ইন্‌ষ্টিটিউট যাবার পথে আদমপুরের মোড়ে একটি ভদ্রলোকের সহিত একেবারে মুখোমুখি হ'য়ে দাঁড়াতে হ'ল।

"এ কি! আপনি এখানে?"

"চাকরি উপলক্ষে এসেছি। আপনি এখানে কি করেন?"

"ওকালতি করি।"

আমার প্রেসিডেন্সি কলেজের সহপাঠী শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ দাস। ভাগলপুরে এসেছেন কমিশনারের পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যাণ্ট হ'য়ে। এঁর কনিষ্ঠ সহোদর শ্রীযুক্ত গোপেন্দ্রনাথ দাস বর্তমানে কলিকাতা হাইকোর্টের অন্যতম বিচারপতি। গণিতশাস্ত্রে এম. এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার ক'রে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুপারিশে অমরেন্দ্রনাথই প্রথম ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট।

আদমপুরে মণীন্দ্রনাথ মজুমদারের বাড়ি ভাড়া নিয়ে অমরেন্দ্র সপরিবারে বাস করছেন। বিস্তৃত কম্পাউণ্ডের মধ্যে দুইখানি বাড়ি; ছোটখানিতে মণিবাবু নিজে বাস করেন, বড়টি ভাড়া নিয়েছেন অমরেন্দ্রনাথ। কম্পাউণ্ডের অব্যবহিত নিম্নেই পুণ্যসলিলা ভাগীরথী; তখন সুবিস্তৃত প্রসারে ভাগলপুরের উপর দিয়েই প্রবাহিত।

ভাগলপুরের সম্মুখবর্তী গঙ্গা নদীর একটা অদ্ভুত আচরণ দেখা যায়। কখনো ইনি ভাগলপুর শহরের অব্যবহিত উপকূল স্পর্শ ক'রে প্রবাহিত হন, কখনো বা পাঁচ-ছয় মাইল উত্তরে সাড়ে পনের আনা জল নিয়ে স'রে পড়েন, শহরের উপকূলে প'ড়ে থাকে আধ-আনা জলের বিশীর্ণ উপশাখা, ভাগলপুরবাসীরা তার নাম দেয়—যমুনিয়া অর্থাৎ যমুনা। এই গঙ্গা ও যমুনিয়ার মধ্যবর্তী স্থলে জেগে ওঠে এক সুবিস্তৃত চরভূমি, যার নাম একেবারে বাঁধা আছে দিরা-শঙ্করপুর এবং যার পলিপড়া নূতন মৃত্তিকার অত্যুৎপাদিকা-শক্তির সুযোগ গ্রহণ করতে উদ্যমশীল তৎপর লোকেরা একদিনও বিলম্ব করে না। দেখতে দেখতে দিরার বক্ষের উপর গজিয়ে উঠতে থাকে চাষ-বাস, ক্ষেত-খামার, ঘর বাড়ি, দোকান-পসার। কালক্রমে শঙ্করপুর-দিরার উপর নাতিবৃহৎ শঙ্করপুর মৌজা গ'ড়ে ওঠে। তার ঘননিবদ্ধ বসতির মাঝে দিকে দিকে পথ-ঘাটের বিস্তার, পথপার্শ্বে জায়গায় জায়গায় বিশ-পঁচিশ বৎসরের জলবায়ু-রৌদ্রের প্রভাবে বর্ধিত বৃহৎ বট ও অশ্বত্থ বৃক্ষ।

সকালে-বৈকালে চরভূমির উন্মুক্ত স্থান মুখর হ'য়ে ওঠে গো-মহিষাদি পশুর গলায়-বাঁধা ঘণ্টির বিচিত্র সুরে। প্রত্যহ খেয়া নৌকা ভর্তি হ'য়ে ভারে ভারে আসে বিবিধ শস্য, আনাজ, দুগ্ধ এবং ঘৃত দধি ননী প্রভৃতি দুগ্ধজাত দ্রব্য। উদ্যমশীল গোয়ালারা পারানির কড়ি ও সময় বাঁচাবার জন্য প্রত্যূষে দুধের ভাণ্ড বাম হস্তে মাথার উপর ধারণ ক'রে

দক্ষিণ বাহু ও পদদ্বয়ের সাহায্যে সাঁতার কেটে ভাগলপুর শহরের ঘাটে এসে ওঠে দুধ বিক্রয় করবার জন্যে। শীতকালে বোঝা-বোঝা আসে টাটকা তাজা—যেন সবুজ রঙে চোবানো—বড় বড় কড়াইশুঁটি, গ্রীষ্মকালে আধমণ-ত্রিশসের ওজনের ভাগলপুরের বিখ্যাত তরমুজ।

পক্ষান্তরে ভাগলপুর থেকে ব্যাপারীরা শঙ্করপুরে নিয়ে যায় বস্ত্র লবণ হ'তে আরম্ভ ক'রে সংসারের যাবতীয় ব্যবহার্য দ্রব্য, যা শঙ্করপুরের চরভূমিতে উৎপন্ন হয় না। এইরূপে আমদানি ও রপ্তানির সাহায্যে শঙ্করপুর ও ভাগলপুরের মধ্যে একটা নিবিড় যোগাযোগ চলতে থাকে।

কিন্তু সহসা একদিন কোনো এক বর্ষাকালের খরস্রোতের উপর ভর দিয়ে গঙ্গামাতার দক্ষিণায়ন আরম্ভ হ'য়ে যায়। ত্রিশ বৎসর ধ'রে শঙ্করপুর-দিয়ার যে আলগা মাটি ক্রমশ কঠিন মৃত্তিকায় পরিণত হয়েছে, কাস্তের মুখে পাকা ধান্যের মতো, উত্তর উপকূল থেকে তা কাটতে আরম্ভ ক'রে বঙ্গোপসাগরে চালান যেতে থেকে। এ কাজটি সম্পূর্ণ হ'তে, অর্থাৎ গোটা শঙ্করপুর-দিয়া নিশ্চিহ্ন হ'য়ে বঙ্গোপসাগরে পৌছতে দুই-তিন বৎসরের বেশি লাগে না। এই অল্প সময়ের মধ্যে শঙ্করপুরবাসীরা ত্রিশ-বত্রিশ বৎসরের পাতা সংসারের বাড়ি-ঘর তুলে মাল-জাল নিয়ে স'রে পড়বার কার্যে বিব্রত হ'য়ে ওঠে।

এ দিকে, দেবী জাহ্নবী যেখান থেকে উত্তরায়ণ আরম্ভ করেছিলেন সেখানে পৌছে, অর্থাৎ ভাগলপুর শহরের পাড়ে এসে ধাক্কা মারতে আরম্ভ করেছেন। স্থানে স্থানে পাড় খ'সে প'ড়ে গঙ্গাগর্ভে বিলীন হচ্ছে। চক্ষের সম্মুখে শঙ্করপুরের ভয়াবহ বিলোপ দেখে যোগশরের গঙ্গাতীরবর্তী বুঢ়ানাথের মন্দিরে স্বয়ং শঙ্কর ত্রস্ত হ'য়ে ওঠেন, কি জানি দেবী তাঁকে শুদ্ধ তাঁর মন্দিরটি লেহন ক'রে না নেন! বাঙালীটোলায় আমাদের পৈতৃক বাড়ির ঠিক উত্তরে ঘোষেদের বাড়ির অল্প-স্বল্প অংশ গঙ্গাগর্ভে

প্রবেশ করেছে। স্নান করতে এসে স্নানার্থীরা তটস্থ হ'য়ে বলে, 'মা, যথেষ্ট কৃপা করেছ, এবার তোমার অনুগ্রহের সীমান্ত-রেখা দয়া ক'রে টানো।'

কিছুকাল পূর্বে শঙ্করপুর-দিয়ার বক্ষে যেখানে স্বচ্ছন্দে গরু-বাছুর চ'রে বেড়াত, এখন সেখান দিয়ে কলিকাতা-পাটনাগামী বৃহৎ মালবাহী স্টীমার অবলীলাক্রমে যাতায়াত করে।

অমরেন্দ্রবাবুর ভাগলপুরে অবস্থিতিকালে তাঁর কম্পাউণ্ড স্পর্শ ক'রে গঙ্গা নদী সগৌরবে প্রবাহিত ছিল। ভাগীরথীবীচিচুম্বিত অমরেন্দ্রনাথের কম্পাউণ্ড ও অমরেন্দ্রনাথের সঙ্গলাভস্পৃহা ধীরে ধীরে আমার সায়াহ্নগুলিকে অধিকার করতে লাগল। ইন্‌স্টিটিউট যাওয়া ক্রমশ হ্রাস পেয়ে পেয়ে শেষ পর্যন্ত মাসে মাসে চাঁদা দেওয়াতে পর্যবসিত হ'ল।

আমাদের বৈঠক বসত নদীমুখ হ'য়ে নবদূর্বাদলের হরিৎ আস্তরণের উপর। সম্মুখে পূর্ববাহিনী খরস্রোতা ভাগীরথী নদী; তার উত্তরে অপর পারে দিগন্তবিলীয়মান বালুচর, নদীতটে সাহিত্যিকের পক্ষে পরম কৌতূহলের বস্তু নদীজলাভিমুখে হেলে-পড়া ক্ষয়িতমূল সেই অশ্বত্থ গাছ, গভীর রাত্রে নৈশ অভিযান থেকে ফিরে এসে যার শিকড়ে শরৎ-চন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের "ইন্দ্রনাথ" নৌকা বাঁধত।

এই মনোরম পরিবেশের মধ্যে প্রথম প্রথম বৈঠকে বসতাম মাত্র আমরা তিনজন—অমরবাবু, অমরবাবুর বাড়িওয়ালা মণিবাবু ও আমি। প্রসিদ্ধ গল্পলেখক ও ভারতবিখ্যাত গায়ক ইনকাম ট্যাক্সের অ্যাসিস্ট্যাণ্ট কমিশনার সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয়ের কনিষ্ঠ সহোদর এই মণিবাবু। তিনি নিজেও একজন সুকণ্ঠ গায়ক এবং সুদক্ষ চিত্রশিল্পী ছিলেন।

শশিকলার মতো দিনে দিনে না হ'লেও, ধীরে ধীরে পুষ্টি লাভ করতে

করতে আমাদের দলের সদস্য-সংখ্যা শেষ পর্যন্ত আট-নয় জনে এসে দাঁড়াল। এ কয়েকজন অবশ্য পাকা সদস্য। তা ছাড়া দু-চার জন ছুটকো সদস্যও ছিলেন, ধূমকেতুর ন্যায় মাঝে মাঝে এসে দু-চার দিন আকাশ আলো ক'রে অস্ত যেতেন। কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল শ্রীযুক্ত যতীনাথ ঘোষ পাকা সদস্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত হ'লেও প্রধানত কলিকাতায় থাকতেন; কিন্তু পূজার ছুটি ও বড়দিনের ছুটি উপলক্ষে তিনি বৎসরে নিয়মিত দুবার ভাগলপুরে আসতেন ও প্রতিদিন আমাদের দলে হাজির হতেন।

বন্ধু, সুহৃৎ, মিত্র ও সখা—এই চার ভাবের অভিধা-নিরূপক একটি সূত্র আছে, "অত্যাগসহনো বন্ধুঃ সদৈবানতঃ সুহৃৎ। একক্রিয়ং ভবেন্মিত্রং সমপ্রাণঃ সখা মতঃ।" এই সূত্র-অনুযায়ী আমরা আট-নয় জন পাকা সদস্য যে পরস্পরের বন্ধু ছিলাম তা বলতে পারি নে, কারণ পরস্পরের বিচ্ছেদ আমাদের সহ্য করতেই হ'ত; সুহৃদ্‌ও আমাদের ঠিক বলা চলত না, কারণ মতামতের ক্ষেত্রে আমরা কারো অনুমত হ'য়ে তাঁবেদারি ক'রে চলতাম না, বরং মাঝে মাঝে প্রয়োজন উপস্থিত হ'লে তর্কের ঝড়ও ওঠাতাম; আমরা একক্রিয় ছিলাম না ব'লে আমাদের মিত্র বলাও চলত না, কারণ আমাদের মধ্যে কেউ ছিলেন হাকিম, কেউ উকিল, কেউ অধ্যাপক, কেউ-বা ব্যবসায়ী। তবে রুচি ও প্রবৃত্তির একতাবশত আমরা অনেকটা সমপ্রাণ অর্থাৎ সমভাবাপন্ন ছিলাম তদ্বিষয়ে সন্দেহ নেই। রুচির একতা যে-পরিমাণ সমপ্রাণতার সৃষ্টি করতে পারে, এমন বোধ করি আর কিছু নয়। সভা-সমিতির সভ্য হবার সাধারণ নিয়ম, 'ফেলো কড়ি মাখো তেল', অর্থাৎ দাও চাঁদা হও সভ্য। আমাদের দলের সভ্য হবার কড়ি, অর্থাৎ প্রবেশ-টিকিট ছিল রুচির মিল। রুচির মিলের টিকিট দুষ্ক্রেয় বস্তু। সুতরাং আমাদের দলটি বিস্তৃত হ'তে পারে নি, কিন্তু গভীর হবার সুযোগ লাভ করেছিল।

দলটি সবেগে পুরা-দমে চলছে, এমন সময়ে ক্ষিতীশচন্দ্র সেন নামে একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ভাগলপুরে বদলি হ'য়ে এলেন। দেখতে অতিশয় সুপুরুষ; মুখে প্রসন্ন মিষ্টহাসি লেগেই আছে; মার্জিত রুচি, মার্জিত কথাবার্তা, সুমার্জিত আচরণ। সর্বোপরি, এমন একটা সহজ তরল সহৃদয়তা, যা অতি অল্প সময়ের মধ্যে গভীর হৃদ্যতা স্থাপন করতে সমর্থ হয়। আমাদের দলপতি অমরেন্দ্রনাথ নিপুণ জহুরী, অবিলম্বে ক্ষিতীশচন্দ্রকে হাত ধ'রে দলে টেনে নিলেন। সুরসিক ক্ষিতীশচন্দ্রকে লাভ ক'রে আমাদের দল উল্লসিত হ'য়ে উঠল।

শীতকাল। ভাগলপুরের দুর্জয় শীতে গঙ্গার ধারে বৈঠক আর সম্ভব হচ্ছে না, তৎপরিবর্তে বসছে আমার বৈঠকখানার প্রশস্ত ফরাসের উপর। সেখানে চলে প্রধানত গল্প-গুজব আর সঙ্গীতের মজলিস। যখন গান চলে, তখন আমাকে বাদ দিয়ে আর সকলেই হন শ্রোতা। সুতরাং গান গাইতে হয় একমাত্র আমাকেই।

ফরাসের উপর দিনে দিনে ক্রমশ আমাদের বসবার স্থানগুলি নির্দিষ্ট হ'য়ে গেছে। সকলেই নিজ নিজ স্থানে এসে বসে বসে, কেউ কারও স্থান অধিকার করে না। অমরেন্দ্রনাথ ও আমি সামনা-সামনি বসি, মধ্যে প'ড়ে থাকে একটা হার্মোনিয়মের ব্যবধান। একমাত্র ক্ষিতীশবাবু ছাড়া আমরা সকলেই ফরাসে বসি। কিছুকাল পূর্বে ঘোড়া থেকে প'ড়ে গিয়ে অস্ত্রোপচারের ফলে একটা পায়ের শিরায় টান থেকে যাওয়ায় তিনি পা মুড়ে বসতে পারেন না। ঘরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে একটা বেতের ঈজি-চেয়ার ছিল, প্রতিদিন সঙ্গীতপ্রিয় ক্ষিতীশচন্দ্র একটি পায়ের উপর অপর পা স্থাপন ক'রে সেই চেয়ারে উপবেশন ক'রে গান শোনেন, আলাপ-আলোচনা করেন। চেয়ারটি তাঁর জন্য সংরক্ষিত হ'য়ে

গেছে। এমন কি, তিনি উপস্থিত না থাকলেও কেউ সেটা অধিকার করে না, তাঁর অপেক্ষায় খালি প'ড়ে থাকে।

ক্ষিতীশবাবুর বাড়ি ও আমার বাড়ি রাস্তার এপার-ওপার। একদিন ছুটির দিনে সকালবেলা তাঁর ময়ূরকণ্ঠী রঙের শৌখিন বালাপোশটি গায়ে দিয়ে ক্ষিতীশচন্দ্র এসে হাজির; হাতে একখানা বই।

অভ্যর্থনা ক'রে তাঁকে বসিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "কি ক্ষিতীশবাবু, সকালবেলা বই হাতে ক'রে বেরিয়েছেন, ব্যাপার কি?"

স্মিতমুখে ঈষৎ অপ্রতিভভাবে ক্ষিতীশবাবু বললেন, "এটি রবীন্দ্রনাথের গানের স্বরলিপির বই। এর একটি গানের ভাষা ও ভাব কয়েকদিন থেকে আমার মনকে অস্থির ক'রে রেখেছে। আমার দ্বারা ত সম্ভব নয়, তাই আপনার শরণাপন্ন হলাম। স্বরলিপি থেকে গানটি শিখে আমাদের সভায় আপনাকে গাইতে হবে।" ব'লে গানের পাতাটি খুলে বইখানি আমার হাতে দিলেন।

গানটি প'ড়ে মুগ্ধ হ'য়ে গেলাম। সত্যিই অতি চমৎকার, এমন কি, রবীন্দ্রনাথের গানের মধ্যেও। যে অদ্ভুত গল্প বলতে উদ্যত হয়েছি, তার পূর্ণ রসোপলব্ধির জন্য সমগ্র গানটি এখানে উদ্ধৃত করলাম।—

"আমি তোমায় যত শুনিয়েছিলেম গান
তার বদলে আমি চাই নে কোনো দান।
ভুলবে সে গান যদি, না-হয় যেয়ো ভুলে,
উঠবে যখন তারা সন্ধ্যাসাগর-কূলে,
তোমার সভায় যবে করব অবসান
এই ক'দিনের শুধু এই কটি মোর তান।
তোমার গান যে কত শুনিয়েছিলে মোরে,
সেই কথাটি তুমি ভুলবে কেমন ক'রে?

সেই কথাটি কবি, পড়বে তোমার মনে
বর্ষামুখর রাতে ফাগুন-সমীরণে—
এইটুকু মোর শুধু রইল অভিমান,
ভুলতে সে কি পারো ভুলিয়েছ মোর প্রাণ।"

গানটি প'ড়ে বললাম, "সত্যিই অপূর্ব! হাকিমের হুকুম তামিল করবার যথাসাধ্য চেষ্টা করব।"

কিছুক্ষণ গল্প ক'রে ক্ষিতীশবাবু গৃহে প্রত্যাগমন করলেন।

স্বরলিপি থেকে গানটি উদ্ধার করতে বিশেষ কষ্ট পেতে হ'ল না; তখন ও-বিদ্যা কতকটা আয়ত্তে ছিল। প্রতিমার দুই চোখে তারকা বসিয়ে দিলে মুখমণ্ডলের যে অবস্থা হয়, সুললিত ভাষামণ্ডিত অপূর্ব ভাবের গানটিতে সুর সংযুক্ত হওয়ায় ঠিক সেই অবস্থা হ'ল। গানটি যেন প্রসন্ন দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে দেখলে।

সেদিনকার সান্ধ্য মজলিসে প্রথমেই গাইলাম, 'আমি তোমায় যত শুনিয়েছিলেম গান'।

ক্ষিতীশবাবু ত আত্মহারা! চেয়ার থেকে উঠে প'ড়ে পা মুড়ে আমার পাশে এসে বসেন আর কি! অপর সকলেও এমন সুন্দর নূতন গান শুনে বিশেষ আনন্দিত হলেন। অমরবাবু বললেন, "এ গান কোথায় পেলেন? কখনো ত আপনার মুখে আগে শুনি নি?"

গানটির সকালবেলাকার ইতিহাস প্রকাশ ক'রে বললাম। শুনে সকলে যৎপরোনাস্তি খুশি হলেন এবং এমন অপরূপ সঙ্গীত-সুরধুনী আমাদের সভায় নিয়ে আসবার কারণ হওয়ার জন্য ক্ষিতীশবাবুর প্রশংসায় মুখর হ'য়ে উঠলেন।

প্রথম প্রথম কয়েকদিন নিত্যই ঐ গানটি স্বেচ্ছাক্রমেই গাইতাম, কিন্তু পরে এক-আধ দিন বাদ পড়বার উপক্রম হ'তে লাগল। কিন্তু উপক্রম

হ'লে হবে কি। বাদ পড়বার উপায় ছিল না। ক্ষিতীশবাবু মনে পড়িয়ে দিতেন, "উপেনবাবু, সেই গানটা ?"

"কোন্‌টা বলুন ত ?"

"সেই 'আমি তোমায় যত'।"

"ও! আচ্ছা, গাচ্ছি।"

অনুরোধে খুশি হ'য়েই গান ধরতাম,—'আমি তোমায় যত শুনিয়েছিলেম গান'।

এই রকম ব্যাপার মাঝে মাঝে প্রায়ই ঘটতে লাগল। অবশেষে আমরা লক্ষ্য না ক'রে পারলাম না যে, 'আমি তোমায় যত' গানটির কোনোদিন কোনো প্রকারে বাদ পড়বার উপায় নেই। আমি যদি স্বেচ্ছায় প্রণোদিত হয়ে গাই ত বহুৎ আচ্ছা, অন্যথা ক্ষিতীশবাবু আমাকে গাইতে বাধ্য করেন।

গোপন পরামর্শ অনুযায়ী একটু কৌতুক করবার অভিপ্রায়ে দু-চারখানা গান গেয়ে হার্মোনিয়মের স্টপগুলো ঠেলে দিয়ে বেলোটা বন্ধ ক'রে হয়ত বলি, "আজ আর থাক্।"

ষড়যন্ত্রের বশবর্তী হ'য়েই যতীন্দ্র হয়ত বলেন, "তবে থাক্।"

কিন্তু ফরাসের উপর 'থাক্' বললে কি হবে ? ওদিক বেতের ঈজি-চেয়ারে উস্‌খুস্‌নি আরম্ভ হ'য়ে গেছে। ন'ড়ে-চ'ড়ে বসার সামান্য একটু শব্দ, অত্যন্ত চাপা গলা-খাঁকারির অল্প একটু আওয়াজ, তারপর কুণ্ঠিত মৃদু কণ্ঠস্বর, "উপেনবাবু, সেই গানটা ?"

ফরাসের উপর উচ্চ হাসির ঝড় ব'য়ে যায়। ক্ষিতীশবাবু লজ্জিত মুখে গান শুনে আনন্দ লাভ করেন এবং পরদিন প্রয়োজন হ'লে লজ্জিত-কণ্ঠে "উপেনবাবু, সেই গানটা" বলতে বিরত হন না। ক্রমশ আমাদের সকলের মধ্যে 'আমি তোমায় যত' গানটির নাম দাঁড়িয়ে গেল, 'সেই

গানটা'। উল্লেখ করবার প্রয়োজন হ'লে আমরাও বলতাম, 'সেই গানটা'।

ক্ষিতীশবাবুর সঙ্গীতে অনুরাগের কথা আমাদের অবিদিত ছিল না; কিন্তু একমাত্র এই গানটির উপরই তাঁর যেন একটা অলৌকিক আকর্ষণ দেখা যেত।

সুখে-স্বচ্ছন্দে আমাদের দিনগুলি অতিবাহিত হ'য়ে চলেছিল, এমন সময়ে অকস্মাৎ একদিন বিপদ দেখা দিলে। সেদিন রবিবার অথবা অন্য কোন ছুটির দিন। সন্ধ্যার সময়ে শুনলাম, টম্‌টম্‌ ও তৎসহিত ঘোড়া ক্রয় করবার অভিপ্রায়ে ক্ষিতীশবাবু অপরাহ্ণকালে নিজে টম্‌টম্‌ চালিয়ে পরীক্ষা ক'রে দেখছিলেন, এমন সময়ে ঘোড়া হঠাৎ ভয় পেয়ে বিগড়ে গিয়ে অসামাল হওয়ায় গাড়ি উল্টে প'ড়ে ক্ষিতীশবাবু আহত হয়েছেন। উদ্বিগ্ন চিত্তে ক্ষিতীশচন্দ্রের গৃহে উপস্থিত হ'য়ে দেখি, ইত্যবসরেই ডাক্তার এসে ক্ষত পরিষ্কৃত ক'রে ঔষধ লাগিয়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিয়ে গেছেন। বেশির ভাগ চোট মস্তকে। ব্যাণ্ডেজের দ্বারা একটা চোখ প্রায় ঢেকে গিয়েছে। একটা খাড়া চেয়ারে ক্ষিতীশচন্দ্র সোজা হ'য়ে ব'সে আছেন। মুখে তাঁর সদানন্দ-ভাবের মিষ্ট হাসির অংশ লেগে রয়েছে। বললেন, "গ্রহের ফের, এর ওপর মানুষের কোনো হাত নেই।"

দিন দুই প্রায় সমভাবেই কাটল, বিশেষ উদ্বেগের কোনো কারণ আছে ব'লে মনে হয় না। হঠাৎ কিন্তু একদিন সমস্ত মুখাবয়ব জুড়ে ভীষণ বিসর্প (Erysipelas) রোগ দেখা দিলে। অমন যে সুশ্রী মুখ, কোথায় যে কি তার হ'য়ে গেল কিছুই বোঝা গেল না। মুখ ও মাথা চতুর্গুণ ফুলে উঠে তার মধ্যে চক্ষু গেল ডুবে, নাসিকা গেল বুজে। অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হ'য়ে দাঁড়াল। চিকিৎসা বিষয়ে ভাগলপুরে যা-কিছু হওয়া সম্ভব কিছুই বাকি রইল না। ইংরেজ সিভিল সার্জেন থেকে আরম্ভ ক'রে দু-তিন জন

খ্যাতনামা বাঙালী ডাক্তার একত্রে মিলিত হ'য়ে রোগের বিরুদ্ধে অবিশ্রান্ত যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরাজিত হ'তে হ'ল। একদিন রাত্রি দশটা আন্দাজ স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, একদল অন্তরঙ্গ বন্ধু-বান্ধব সকলকে কাঁদিয়ে অকালে অসময়ে ক্ষিতীশচন্দ্র চ'লে গেলেন।

আত্মীয়বর্গের দুঃখের ত পরিসীমাই নেই, আমাদের মনও দুঃসহ শোকের ভারে পীড়িত হ'য়ে উঠল। আমাদের মৈত্র-জগতের আকাশ থেকে একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক খ'সে গিয়ে খানিকটা আলোক হরণ ক'রে নিয়ে গেছে।

ক্ষিতীশবাবুদের বাড়ি মজঃফরপুরে। দিন দুই পরে তথা হ'তে তাঁর অগ্রজ সুরেন্দ্রনাথ সেন এসে উপস্থিত হলেন, শোকাভিভূত আত্মীয়বর্গকে মজঃফরপুরে নিয়ে যাবার জন্য। ইনি আমার পূর্বপরিচিত; মজঃফরপুরে এঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হবার কয়েকবার সুযোগ হয়েছিল।

সুরেনবাবুর সহিত আমরা সকাল-বিকাল মিলিত হই, আর তাঁর কণ্ঠস্বর শুনে চমকে চমকে উঠি। তিনি কথা কন, আমাদের মনে হয় যেন ক্ষিতীশবাবুই কথা কইছেন। ভাইয়ে ভাইয়ে কণ্ঠস্বরের মিল থাকার মধ্যে আশ্চর্যের তেমন কিছু নেই, কিন্তু তাই ব'লে এত!

ভাগলপুরের পাট তুলে মজঃফরপুর রওনা হ'তে সুরেনবাবুদের দিন চারেক লাগবে। যেদিন তাঁরা রওনা হবেন, তার আগের দিন সকালে অমরেন্দ্রনাথ সুরেনবাবুকে বললেন, "দেখুন সুরেনবাবু, আপনার মুখ দেখে, আপনার কণ্ঠস্বর শুনে আমাদের কেমন যেন ক্ষিতীশবাবুকে মনে পড়ে। ক্ষিতীশবাবুর সঙ্গে আমরা যেমন সন্ধ্যাকালে উপেনবাবুর বৈঠকখানায় বসতাম, আজ সন্ধ্যায় আপনাকে নিয়ে তেমনি যদি বসি, তা হ'লে হয়ত আমাদের মনে হবে, কিছুক্ষণের জন্যে যেন ক্ষিতীশবাবুকেই আমরা ফিরে পেলাম।"

অমরেন্দ্রনাথের প্রস্তাব শুনে অভিভূত হ'য়ে সুরেনবাবু বললেন, "আমিও ভারি তৃপ্তি পাব অমরবাবু। ক্ষিতীশ যে আপনাদের কত আপনার ছিল তা জানতে আমার আর বাকি নেই।"

সন্ধ্যাকালে আমরা সুরেনবাবুকে মধ্যে নিয়ে আমার বৈঠকখানার ফরাসের উপর মিলিত হলাম। সুরেনবাবু ব্যতীত আমরা সেদিন ছিলাম, যতটা মনে পড়ছে, জন আষ্টেক বন্ধু। সুরেনবাবু আমাদের সঙ্গে ফরাসেই ব'সে ছিলেন; ঘরের কোণে বেতের চেয়ারটা খালি প'ড়ে ছিল, যেমন সেটা খালি প'ড়ে থাকত ক্ষিতীশবাবুর অপেক্ষায় যেদিন তিনি আসতেন না অথবা আসতে বিলম্ব করতেন।

চায়ের পালা শেষ হ'লে গল্পের গতি হ'ল ত্বরিত। বলা বাহুল্য, যা-কিছু গল্প সেদিন হচ্ছিল, সবই ক্ষিতীশবাবুকে কেন্দ্র ক'রে। আমরাও কিছু-কিছু বলছিলাম, সুরেনবাবুও অনেক কাহিনী শোনাচ্ছিলেন। সত্যভুক্তিত বিচ্ছেদ ও শোকের একটা ফিকা চেতনার আবহাওয়ায় সমস্ত ঘরটা যেন চকিত হ'য়ে উঠেছে।

ঘণ্টাখানেক কথোপকথনের পর সহসা অমরেন্দ্রনাথ একটা অদ্ভুত প্রস্তাব ক'রে বসলেন, "কি জানি কেন, বোধ হয় সুরেনবাবুর উপস্থিতির জন্যেই, আজকের এই সভার অধিবেশনের সময় নিয়ে আমাদের মনের মধ্যে মাঝে মাঝে কেমন যেন একটা গোলমাল ঠেকতে আরম্ভ করেছে। কেবলই মনে হচ্ছে, এ যেন এমন কোন একদিনের সভা যখন ক্ষিতীশবাবুর টম্‌টম্-দুর্ঘটনা আদৌ ঘটে নি। এই বিভ্রান্তি, যা নিশ্চয়ই আমাদের কিছু আনন্দ দিচ্ছে, বেশ খানিকটা বৃদ্ধি পায় যদি উপেনবাবু ক্ষিতীশবাবুর 'সেই গানটা' গান।"

সুরেনবাবু সঙ্গীতজ্ঞ এবং সঙ্গীতপ্রিয় মানুষ। মজঃফরপুরে তাঁর সহিত আমার পরিচয়ের প্রধান কারণ ছিল সঙ্গীত ও গান-বাজনার চর্চা।

গানের কথায়, বিশেষত ক্ষিতীশবাবুর 'সেই গানটা'র কথায়, তিনি উৎসুক হ'য়ে উঠলেন। ক্ষিতীশবাবুর 'সেই গান'টা কি ব্যাপার, দু-চার কথায় অমরবাবুর নিকট হ'তে অবগত হ'য়ে নিয়ে 'সেই গান'টি পাইবার জন্য তিনি আমাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করলেন। আমাদের দলেরও সকলের বিশেষ আগ্রহে গানটি আমি গাই। অমরেন্দ্রনাথের ইঙ্গিতে হার্মোনিয়ম এসে পড়ল আমার সম্মুখে। অগত্যা গান ধরলাম—'আমি তোমায় যত শুনিয়েছিলেম গান—'

চেয়ে দেখলাম অমরেন্দ্রনাথ সঙ্গে সঙ্গে চোখ বুজেছেন। ওটা ওঁর চিরকালের অভ্যাস। গান আরম্ভ হওয়ামাত্র চোখ বুজে অতি মৃদুভাবে দোল খান,—গান শেষ হ'লে চোখ খোলেন। গানের এমন নিষ্ঠাবান শ্রোতা গায়কের ভাগ্যে কদাচিৎ মেলে। অপরে গানের বিঘ্ন ঘটালে যৎপরোনাস্তি বিরক্ত ত হনই; গানের সময়ে গায়ককে বাহবা দিয়েও তিনি গানের রসভঙ্গ করেন না। সামনে ব'সে অমরবাবু চোখ বুজে দোল খাচ্ছেন দেখলে আমি গান গাইতে উৎসাহ লাভ করি।

গানের অস্থায়ী অন্তরা শেষ ক'রে সঞ্চারী ধরেছি—

"তোমার গান যে কত শুনিয়েছিলে মোরে,
সেই কথাটি তুমি ভুলবে কেমন ক'রে!"

এমন সময়ে অমরবাবুর কম্পিত মোটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "উ-উপেন-বা-আ-বু!"

আমি উত্তর দিলাম, "হুঁ।" অর্থাৎ আমিও দেখেছি। দেখেছি, ঘরের নৈঋ্ঋত কোণে রক্ষিত বেতের ঈজি-চেয়ারের উপর কখন সশরীরে এসে নিঃশব্দে বসেছেন ক্ষিতীশচন্দ্র,—এক লহমার জন্য অবশ্য,—কিন্তু সেজন্য সাদৃশ্যবোধের বিন্দুমাত্র অসুবিধা হয় নি,—একেবারে সুস্পষ্ট, কঠিন, নিটোল (solid) ক্ষিতীশচন্দ্র,—ছায়া নয়, মায়া নয়,—ভুল নয়, ভ্রান্তি নয়।

তেমনি আগেকার মতো পায়ের উপর পা দিয়ে ডান হাতের ছড়িটি উপর পায়ের উপর রেখে আমাদের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে মৃদু মৃদু হাসছেন। 'সশরীরে প্রকাশ' বলতে যদি কিছু বোঝায়, তা হ'লে একান্তভাবে তাই।

ওদিক ফরাসের উপর আড় হ'য়ে প'ড়ে মতিবাবু হাত-পা খেঁচতে আরম্ভ করেছেন—আতঙ্কে নয়, আবেগে। প্রেমসুন্দরবাবু (একদা শান্তিনিকেতন কলেজের অধ্যক্ষ প্রেমসুন্দর বসু) গম্ভীরমুখে ব'সে ঘটনার অলৌকিকতায় স্তম্ভিত হ'য়ে আছেন। মৃদুকণ্ঠে অমরবাবু ঘটনার বিষয়ে সুরেনবাবুর সঙ্গে আলাপ করছেন। আমাদের দলের মধ্যে যাঁরা সেদিন উপস্থিত ছিলেন, সকলেই এক সময়ে এক সঙ্গে ক্ষিতীশচন্দ্রকে দেখেছিলেন; দেখেন নি শুধু সুরেনবাবু। যাঁরা দেখেছিলেন, সকলের নাম আমার ঠিক মনে পড়ছে না;—অমরেন্দ্রবাবুর হয়ত মনে থাকতে পারে।

এ বিষয়ে অমরেন্দ্রনাথের অভিজ্ঞতা একটু বিচিত্র। নিমীলিত নেত্রেই তিনি ঘরের মধ্যে কোনো অলৌকিক পদার্থের উপস্থিতি অনুভব করেন। তখন চোখ খুলে চেয়ারের উপর দেখতে পান ক্ষিতীশবাবুকে। আমাদের মুখে এ ঘটনা শুনে যাঁরা প্রতিবাদ করেন, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বলেন, বেতের চেয়ারের উপর ক্ষিতীশবাবু আবির্ভূত হন নি, হয়েছিলেন আমাদের মস্তিষ্কের কল্পনাপ্রবণতার উপর; কেউ বলেন, আমাদের এই অভিজ্ঞতাটি 'ম্যাস হিপ্নোটিজ্‌ম্‌'-এর একটি অত্যুৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত; আরও অনেক কিছু বলেন। কিন্তু কথা হচ্ছে, এসব কথা, এসব যুক্তি-তর্ক আমরাও ত জানি। আমরাও এসব বলতে পারি, কিন্তু তারপরও যে মনের মধ্যে খানিকটা সংশয় থেকে যায়! আলোচ্য ঘটনাটিকে যখন একান্তভাবে মনে মনে বিশ্বাস করতে যাই, তখন সংশয় এসে তার উপর ছায়াপাত করে। আবার যখন অবিশ্বাস করতে চাই, তখন মনে হয়, তা হ'লে

উপড়ে ফেলে দাও সে দুটো নিরর্থক চক্ষু, যারা ছায়াকে কায়া দেখতে এত ওস্তাদ!

একটা কথা এই প্রসঙ্গে ব'লে রাখি। আলোচ্য ঘটনার পর, দিনের পর দিন গভীর রাত্রি পর্যন্ত ঐঘরে একা ব'সে লেখাপড়া করেছি। কেবল মাত্র বাড়ি ঘুমন্ত নয়, সারা পল্লী তখন ঘুমন্ত। মাঝে মাঝে বেতের চেয়ারের দিকে চেয়ে দেখেছি, রোমাঞ্চও হয়ত এক-আধবার হয়েছে, কিন্তু কোনো দিন কিছু আর দেখি নি। একদিন মৃদুস্বরে 'সেই গান'টাও গেয়েছিলাম, কিন্তু সেদিনও নয়।

যে সকল ঘটনার দ্বারা পরলোকের অথবা প্রেতলোকের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত না হ'লেও কতকটা 'হাইলি প্রোব্যাব্‌ল্‌' হয়, ক্ষিতীশচন্দ্রের ঘটনা ভিন্ন এমন আরও দু-চারিটি ঘটনা আমার জানা আছে। তন্মধ্যে উপস্থিত যে-দুটির কথা বলতে উদ্যত হয়েছি, তার মধ্যে একটি স্মৃতি, অপরটি শ্রুতি। যেটির সহিত আমি প্রত্যক্ষভাবে জড়িত, তার কথাই আগে বলি।

তখন আমরা ভবানীপুর কাঁসারিপাড়া রোডের একটি গৃহে বাস করি। ঠিক ক'রে বলা শক্ত, কিন্তু অনুমানিক ১৯০২ কিংবা ১৯০৩ সালের কথা হবে। ভাদ্র মাস। মাতাঠাকুরাণীর তালনবমী ব্রত উদ্‌যাপন উপলক্ষে রাত্রিকালে বিশ-পঁচিশজন ব্রাহ্মণের ভোজনের ব্যবস্থা হয়েছে। যথাসময়ে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ উপস্থিত হয়েছেন, নানাপ্রকার গল্প-গুজব চলছে। এমন সময় তাঁদের মধ্যে একজন, দ্বিজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ওরফে নাকুবাবু, হঠাৎ ব'লে বসলেন, "এ বাড়িতে ভূত আছে।"

সম্পূর্ণ লৌকিক বিষয়ের আলাপ-আলোচনার মধ্যে অকস্মাৎ আধিভৌতিক প্রসঙ্গের অবতারণায় কয়েকজন হেসে উঠলেন।

তাঁদের মধ্যে এক ব্যক্তির প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত ক'রে নাকুবাবু বললেন, "হাসা সহজ; কিন্তু পরীক্ষা ক'রে দেখার পর বোধ হয় সহজ হবে না। যেদিন পরীক্ষা করবেন, সেই দিনই প্রমাণ পাবেন। আজই করুন না, আজই পাবেন।"

এত বড় দাপটের (challenge) পর উক্ত ব্যক্তি একটু দ'মে গিয়ে বললেন, "আপনি কি ক'রে জানলেন? কারো কাছে শুনেছেন না-কি?"

ঈষৎ উষ্মার সহিত নাকুবাবু বললেন, "কারো কাছে শুনি নি মশায়, নিজের দু কানেই শোনা হয়েছে। লালমোহনবাবুরা এ বাড়িতে আসবার ঠিক আগে, এক মাস দু মাস নয়, কয়েক বৎসর আমরা এ বাড়ি ভাড়া নিয়েছিলাম।"

নাকুবাবুর পিতা করুণাসিন্ধু মুখোপাধ্যায় তখনকার দিনে কলিকাতা হাইকোর্টের একজন খ্যাতনামা উকিল। তাঁর জুনিয়ার ছিলেন আমার দাদা লালমোহন গঙ্গোপাধ্যায়। গৃহনির্মাণ ক'রে করুণাবাবুরা উঠে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা গৃহ ভাড়া নিই।

নাকুবাবুর কথা শুনে তাঁর প্রতিপক্ষ ঈষৎ প্রবল হ'য়ে উঠে বললেন, "ও! আপনি দেখেন নি, শুনেছেন?"

"কেন, শোনাটা কি কিছুই নয়? দেখাটাই সব? আমরা কি শুধু শুনেই ভুল করি, দেখে করি নে? রজ্জুতে যে সর্পভ্রম হয়, তা রজ্জু শুনে, না, দেখে?" ব'লে নাকুবাবু বিরক্তিমিশ্রিত বিস্ময়ের সহিত ইতস্তত দৃষ্টি সঞ্চালন করতে লাগলেন।

ভূতের গল্প এমনই ত মহা কৌতূহলের বস্তু, তার উপর নাকুবাবু ভূত দেখেন নি—শুনেছেন, শুনে অভ্যাগতগণের মধ্যে ঔৎসুক্য সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। নাকুবাবুর প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে ব্যগ্রকণ্ঠে এক ব্যক্তি বললেন, "আরে, রাখুন মশায়, আপনাদের দেখা আর শোনার ঝগড়া। কি শুনেছিলেন আপনি বলুন—আমরা শুনি?"

বিস্মিতকণ্ঠে নাকুবাবু বললে, "শুনেছিলাম মানে?—একদিন না-কি? প্রতিরাত্রে শুনতাম।"

পূর্বোক্ত ভদ্রলোক স্মিতমুখে বলিলেন, "আচ্ছা, কি কি শুনতেন তাই বলুন।"

এক মুহূর্ত মনে মনে কি চিন্তা ক'রে নিয়ে নকুলবাবু বলতে আরম্ভ করলেন, "আমরা ভাড়া নেওয়ার আগে যাঁরা এ বাড়ি ভাড়া নিয়ে বাস করতেন, তাঁদের একটি বছর চারেকের ছেলে ছিল, সে পড়াশুনা যতটুকু করত তার দশগুণ করত খেলা। আর, মার্বেল ছিল তার একমাত্র খেলার বস্তু। হয় একতলায়, নয় দোতলায়, সিঁড়িতে, নয় ছাতে, সর্বদাই তার মার্বেল গড়ানোর শব্দ শোনা যেত। তার খেলার সাথী ছিল না, প্রতিপক্ষ ছিল না; এক পক্ষ সে নিজে, অপর পক্ষ মার্বেল। একদিন ছেলেটি ভীষণ কলেরা রোগে আক্রান্ত হ'ল। ডাক্তার আর আত্মীয়রা মিলে দিন দুই রোগের সঙ্গে যুদ্ধ চালালে, কিন্তু ছেলেটি বাঁচল না। একদিন রাত্রি একটার সময়ে যে-ঘরে আমরা ব'সে আছি ঠিক তার উপরের দোতলার ঘরে সে মারা গেল। তারপর থেকে প্রতিদিন রাত্রি একটার সময়ে ছেলেটি ঐ ঘরে একটিবার মার্বেল ছাড়ে। শক্ত মেঝের ওপর শক্ত মার্বেল প'ড়ে তিন-চারবার শব্দ করে—ঠক্ ঠক্ ঠক্ ঠক্। অস্পষ্ট নয়, এত স্পষ্ট যে কান পেতে না থাকলেও না শুনে উপায় নেই। আজ যদি আপনাদের মধ্যে কেউ এ ঘরে একটা পর্যন্ত জেগে শুয়ে থাকেন, আজই শুনতে পাবেন।"

নাকুবাবুর কাহিনী শেষ হল। সংক্ষিপ্ত সাধারণ কাহিনী,—রোমাঞ্চকর তার মধ্যে কিছুই নেই। তবে ভূতের বাসা মাথার উপর ক'রে ভূতের গল্প শোনার মধ্যে কৌতুকের হয়ত কিছু ছিল। যে ভদ্রলোক ভূত দেখা ও শোনা নিয়ে তর্ক তুলেছিলেন, তিনি হয়ত কিছু জেরা করবার উপক্রম করছিলেন, কিন্তু আহারে ডাক পড়াতে সকলে উঠে পড়লেন।

রাত্রি এগারোটা। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ আহার সমাপন ক'রে বহুক্ষণ যে-যাঁর বাড়ি চ'লে গেছেন। বাড়ির লোকের খাওয়া-দাওয়াও হ'য়ে গেছে। চাকর-বামুনরা খেতে বসেছে। তখনো ভবানীপুরে আণ্ডার-গ্রাউণ্ড্ ড্রেন হয় নি; সদর-দরজার সম্মুখে কাঁচা নর্দমা পার হবার জন্ম খিলানের উপর সিমেণ্ট বাঁধানো পথ, তার দুই দিকে দুটি পাকা মঞ্চ। মঞ্চের উপর মুখোমুখি ব'সে আমি ও আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু শ্যামরতন চট্টোপাধ্যায় অলস কথোপকথনে রত, এমন সময়ে হঠাৎ মনে পড়ল নাকুবাবুর গল্প। বললাম, "শ্যাম, রাত্রি ত এগারোটা হ'ল—আর ঘণ্টা দুই পরে চার বৎসরের বালক-ভূতের মার্বেল খেলার পালা। নাকুবাবু ত আস্ফালন ক'রে গেলেন—শোনবার ইচ্ছে করলে আজ রাত্রেই শোনা যেতে পারবে। আজ রাতটা থেকে যাও না এখানে। ঘণ্টা দুয়েক গল্প ক'রে জেগে থেকে নাকুবাবুর বালক-ভূতের পিণ্ডদান ক'রে ঘুমানো যাবে।"

প্রস্তাবটা শ্যামরতনের ভালই লাগল। বললেন "বাড়িতে কিন্তু খবর দিতে হবে; নইলে ভাববে।"

বললাম, "অবশ্যই দিতে হবে।"

কিন্তু কে খবর দেয়? ভাগিনেয় সুশীলচন্দ্র পরিবেশন ক'রে ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছে, চাকর-বামুনদের খাওয়া শেষ হয় নি। অগত্যা পরামর্শ ক'রে আমরা দুজনেই শ্যামরতনের বাড়ি গিয়ে খবর দিয়ে এলাম যে, সে রাত্রে শ্যামরতন বাড়ি ফিরবে না।

বৈঠকখানায় ফরাসের উপর শয্যা পেতে আমরা দুজনে যখন পাশা-পাশি শয়ন করলাম তখন রাত বারোটা। সাড়ে বারোটার মধ্যে, শুধু আমাদের বাড়িই নয়, সারা পল্লী গভীর নিঃশব্দতার মধ্যে নিমজ্জিত হ'য়ে গেল। ঘরের ভিতর আমরা দুই বন্ধু পাশাপাশি শুয়ে, আর পরিশ্রান্ত

সুশীল একটা ঈজি-চেয়ারে দেহ সমর্পণ ক'রে গাঢ় নিদ্রায় নিমগ্ন। তার নিশ্বাসের উত্থান-পতনের শব্দ এবং ক্লক-ঘড়ির টক্ টক্ টক্ টক্ আওয়াজ লয় ও সুরের সাম্য রেখে ঐকতান বাজিয়ে চলেছে।

মৃদু গুঞ্জনে আমাদের গল্প চলেছে সহজ গল্পের ছন্দে ও লয়ে। মাঝে মাঝে তার মধ্যে সম পড়ছে প্রাণখোলা হাসির রবে। মনের মধ্যে ভৌতিক অভিব্যক্তির জন্য বিন্দুমাত্র প্রত্যাশা নেই, সুতরাং ভয় ত দূরের কথা, উদ্বেগও নেই। ভৌতিক প্রমাণ পরীক্ষা করবার জন্য তোড়জোড়টা নিতান্তই উপলক্ষ,—আসল লক্ষ্য নির্বিবাদে বেশ খানিকটা জমিয়ে আড্ডা দেওয়া। ঘড়িটা ছিল আমাদের মাথার শিয়রে পাশের দেওয়ালে। ঘাড় তুলে দেখলাম, একটা বাজতে দশ মিনিট। ক্ষণকাল পরে খুট ক'রে একটা শব্দ হ'ল; ঘণ্টা বাজবার মিনিট পাঁচেক আগে ঘড়ির মধ্যে যে শব্দ হয়, সেই শব্দ। আমি বললাম, "শ্যাম, সময় হয়েছে, এবার মুখ বুজে কান পাতো।" কথা বন্ধ ক'রে আমরা দুজনে উৎকর্ণ হলাম। ঘর হ'য়ে গেল একেবারে নিঃশব্দ, একমাত্র সুশীলের নাকের ফিসফিসানি আর ঘড়ির টক্ টক্ শব্দ ছাড়া।

যথাসময়ে ঢং ক'রে ঘড়িতে একটা বাজল,—আর সঙ্গে সঙ্গে এক-যোগে উপরকার দোতলার ঘরে মার্বেল পড়ার শব্দ,—ঠক্—ঠক্—ঠক্—ঠক্—ঠক্—ঠক্—ঠক্—ঠক্—মৃদু নয়, অস্পষ্ট নয়,—একেবারে সুস্পষ্ট, সজোর।

এ-দিকে ফরাসের উপর যেন বৈদ্যুতিক সংযোগে আমাদের দুজনের পা থেকে মাথা পর্যন্ত সর্বশরীরে ছম্ ক'রে কাঁটা ধ'রে গেছে,—নড়ন নেই, কথা নেই, বার্তা নেই, উর্ধ্বনাসিক হ'য়ে উভয়ে পাশাপাশি শুয়ে আছি, যেন দুটি নির্বাক নিশ্চল মাটির পুতুল। নিশ্বাস পড়ছে কি পড়ছে না, তা পর্যন্ত বোঝবার উপায় নেই। তার উপর মনের মধ্যে গভীর দুশ্চিন্তা—

হঠাৎ যদি দেখি তক্তাপোশের ধারে ধারে একটি বছর চারেকের ছেলে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে, তা হ'লে কি করা যাবে! কি করা যাবে সে কথা অবশ্য আগে-ভাগে বলা কঠিন, কিন্তু যতদূর অনুমান হয়, ওরূপ সাংঘাতিক অবস্থা উপস্থিত হ'লে বোধ করি আমাদের দুজনের সর্বপ্রথম কর্তব্য হবে একমত হ'য়ে হার্ট ফেল করা। আপাতত উভয়ের ঠিক একই মাত্রায় সমাধির অবস্থা,—বিন্দুমাত্রও ইতর-বিশেষ নেই। কোনোপ্রকার প্রস্তাব পরামর্শ না ক'রে অকস্মাৎ এরূপ একক্রিয় হবার দৃষ্টান্ত এই মতভেদ-পীড়িত বাংলা দেশে আর কখনো দেখেছি ব'লে মনে পড়ে না।

আমাদের ত এই অবস্থা, ও-দিকে ঈজি-চেয়ারের উপর পা ছড়িয়ে শুয়ে শ্রীমান সুশীলচন্দ্র নিশ্চিত সুনিদ্রায় নিমগ্ন। Ignorance is a bliss—সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। জ্ঞানের বৈমাত্র ভাই অজ্ঞানতা মানুষের পক্ষে অনেক সময়েই কল্যাণস্বরূপ। সুশীল আমাদের চেয়ে পাঁচ-ছ বৎসরের ছোট; তবু মনে হচ্ছিল, ও যদি একবার জেগে ওঠে ত ওকে অবলম্বন ক'রে আমরা দুজনে ধড়মড়িয়ে উঠে বসি। কিন্তু পরিশ্রান্ত সুশীলের প্রগাঢ় নিদ্রার মধ্যে তার সুদূর সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছিল না। আর, আমাদের দেহেও বিন্দুমাত্র শক্তি ছিল না তাকে জাগাবার।

আমাদের মতো দুজন জোয়ান যুবাপুরুষের পক্ষে মার্বেলের শব্দে অতটা ভয় পাওয়া সমীচীন হয় নি, সে কথা স্বীকার করি। কিন্তু ভয়ের মতো অযৌক্তিক ব্যাপার ত বেশি নেই,—অতি অল্প সময়েই সে যুক্তি-বিবেচনায় অনুপাত মেনে চলে। সময়বিশেষে সামান্য একটু মৃদু শব্দে যে-পরিমাণ ভীতি উৎপন্ন হয়, অনেক সময় কামান দাগলেও তত হয় না। এ কথার প্রমাণস্বরূপ ক্ষুদ্র একটি গল্প বলি।

আমরা তখন ভাগলপুরের বাইরে থাকি। আমাদের দোতলার

ঘর-দালান সব সময়ে তালা দেওয়াই থাকে, শুধু সকাল-সন্ধ্যায় তালা খুলে শরৎচন্দ্র ও মণিদাদা সেখানে লেখা-পড়া করেন। শরৎচন্দ্র অর্থাৎ পরবর্তী কালের ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র, আর মণিদাদা অর্থে আমার ছোট কাকা মহাশয় অঘোরনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র, সাহিত্যিক সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ সহোদর। এই মামা-ভাগ্নে—মণিদাদা ও শরৎচন্দ্র, শুধু সমবয়স্কই ছিলেন না, উভয়ের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। একসঙ্গে আহার, একসঙ্গে স্কুল-কলেজ যাওয়া, একসঙ্গে লেখা-পড়া করা,—সর্বদা তাঁরা একত্রে থাকতেন।

একদিন সন্ধ্যার পর দ্বিতলে উপস্থিত হ'য়ে শরৎচন্দ্র দেখেন, মণিদাদা আগেই পৌঁছে গেছেন। ঘরের মধ্যস্থলে দরজার দিকে পিঠ ক'রে ব'সে দেশলাইয়ের কাঠি দিয়ে প্রদীপের সল্‌তে ওসকাতে ওসকাতে নিবিষ্ট মনে একটা কোনো চিন্তায় মগ্ন আছেন।

শরৎচন্দ্র দেখলেন, মহাসুযোগ উপস্থিত। এ সুযোগ কিছুতেই হারানো উচিত নয়। অতি সন্তর্পণে পা টিপে টিপে মণিদাদার পশ্চাতে এসে উপবেশন করলেন, তারপর মণিদাদার বাম কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে অতিশয় মৃদু স্বরে বললেন, হা।

কানের পাশে অস্ফুট 'হা' শব্দ শুনে মণিদাদা সিদ্ধান্ত করলেন, ভূত এসে গেছে এবং অতি সন্নিকটে। হাত কেঁপে পিলসুজ থেকে প্রদীপ মাটিতে প'ড়ে ঘর হ'য়ে গেল অন্ধকার। তারপর দরজা দিয়ে পলায়নের অভিপ্রায়েই বোধ হয় বোঁ ক'রে ফিরতে গিয়ে সাংঘাতিক পরিণতি দেখা দিলে। ভূত এসে পড়ল একেবারে দুই বাহুর মধ্যে। এখন এরূপ অবস্থায় মানুষ মরিয়া হওয়া ছাড়া কিছুই হ'তে পারে না। মণিদাদাও তাই হলেন, এবং ভূতকে নিয়ে কি করা যেতে পারে সহসা ভেবে না পেয়ে, আপাতত দুই হাতে সবলে তাকে চেপে ধ'রে দুই চক্ষু বুজে

ঝাঁকানি দিতে আরম্ভ করলেন। এই ঝাঁকানিটা মহাসঙ্কটের উপলব্ধির একটা প্রকাশ ভিন্ন আর কিছুই নয়।

এদিকে বলবান মণিদাদার সবল ঝাঁকানির মধ্যে প'ড়ে ভূত বেচারার ত ওষ্ঠাগতপ্রাণ! "ও মণিমামা, আমি। ও মণিমামা, আমি শরৎ। ছেড়ে দাও।"

কে কার কথায় কান দেয়! চোখ বুজে মণিদাদা সমানে ঝাঁকানি দিয়ে চলেছেন।

"ও মণিমামা, ম'রে গেলুম ছেড়ে দাও,—আমি শরৎ।"

অবশেষে মণিদাদার কর্ণে শরতের সকাতর আবেদন প্রবেশ করল। শরৎকে ছেড়ে দিয়ে গম্ভীরস্বরে তিনি ব'লে উঠলেন, "শরৎ? হতভাগা! আমাকে তুই মেরে ফেলেছিলি!"

উত্তরে করুণ কণ্ঠে শরৎ বলেছিলেন, "তোমার কানের কাছে অল্প একটু হা করলে যদি মেরে ফেলা হয়, তা হ'লে মিনিট দশেক ধ'রে আমাকে তোমার ঐ দুর্দান্ত ঝাঁকানি দিলে কি করা হয়, তা আমি জানি নে।"

এ মন্তব্য কিন্তু শরৎচন্দ্রের অন্তরের কথা নয়। মণিদাদার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বিকট এক চিৎকার করা অপেক্ষা 'অল্প-একটু হা' করা যে ভীতি উৎপাদনের দিক দিয়ে অনেক বেশি কার্যকর, সে কথা শরৎচন্দ্রের অবিদিত ছিল না।

সে যাই হোক, আমাদের ক্ষেত্রেও যদি বছর চারেকের একটি বালককে আমাদের তক্তাপোশের ধারে বেড়িয়ে বেড়াতে দেখা যেত, তা হ'লে যে-আমরা মার্বেল পড়ার শব্দ শুনে মৃতবৎ নিস্পন্দ হ'য়ে পড়েছিলাম, সেই-আমরাই হয়ত মরিয়া হ'য়ে উঠে সেই বালকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারতাম। কিন্তু সে বিষয়ে সুযোগ উপস্থিত না

হওয়ায় অগত্যা যেমন ছিলাম, তেমনিই প'ড়ে রইলাম—দু-চার মিনিট নয়, পুরোপুরি আধ ঘণ্টা।

রাত্রি দেড়টার সময় হড়-হড় ক'রে একটা ঘোড়ার গাড়ি আসার শব্দ শোনা গেল। আমাদের গৃহসম্মুখে উপস্থিত হয়ে 'রোকো' 'রোকো' রবে আরোহী চিৎকার ক'রে উঠতেই পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনে ধড়মড়িয়ে উঠে বসলাম। জয় রামচন্দ্র! কিশোরীনাথ ঝা, থিয়েটার দেখে ফিরেছেন। কিশোরীবাবু দাদার একজন বিশিষ্ট বিহারী মক্কেল, সুরসিক ব্যক্তি এবং বয়সে বছর কুড়িক বড় হ'লেও আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। তিনি যে এ সময়ে থিয়েটার দেখে ফিরবেন, সে আশ্বাসের কথার খেয়ালই ছিল না।

উল্লসিত হ'য়ে শয্যা থেকে লাফিয়ে প'ড়ে দুদ্দাড় ক'রে ছুটে গিয়ে সদর-দরজা খুলে প্রায় অভিনন্দিত ক'রে কিশোরীবাবুকে ভিতরে নিয়ে এলাম। শ্যামরতনকে ও আমাকে দেখে কিশোরীবাবু বিস্মিতও হলেন, খুশিও হলেন। মিনিট পাঁচ-সাত কথাবার্তার পর যে-যার শয্যায় শুয়ে পড়লাম। কিশোরীবাবু শয়ন করলেন আমাদের পাশের ঘরে। উৎকট উত্তেজনা থেকে মুক্তিলাভ ক'রে দেহ শিথিল হ'য়ে গিয়েছিল—গাঢ় নিদ্রার মধ্যে নিমজ্জিত হ'তে বিলম্ব হ'ল না।

পরদিন সকালে কথাটা দাদাকে বললাম। শুনে দাদা বললেন, "মেয়েদের কাছে গল্প ক'রো না,—ভয় পাবে। অনেক বাড়িতেই মার্বেল গড়ানোর মতো শব্দ শোনা যায়। ও এমন কিছু নয়।"

কিন্তু আট-দশ দিন পরেই দাদার 'এমন কিছু নয়' বেশ একটা কিছু হ'য়ে দাঁড়াল। দাদার দ্বিতীয় জামাতা সুবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (পরবর্তী কালে পাটনা হাইকোর্টের বিচারপতি) দু-চার দিনের জন্য আমাদের বাড়ি এসেছিলেন। একদিন সকালবেলা সুবোধ আমাকে বললেন, "ছোটকাকা, কাল রাত্রে একটা ভারি আশ্চর্য ব্যাপার দেখেছিলাম।"

শোনা মাত্র আমার মনে হ'ল, এ নিশ্চয়ই মার্বেলের শব্দ সংক্রান্ত কোন ব্যাপার। সকৌতূহলে বললাম, "কি বল দেখি ?"

সুবোধ বললেন, "রাত তখন একটা-দেড়টা হবে, দোর খুলে দেখি, বারান্দায় শ্বশুর মশায়ের ঘরের দরজার সামনে একটি ছোট ছেলে দাঁড়িয়ে। প্রথমে ভাবলাম, বাড়িরই কোন ছেলে হবে; কিন্তু অত রাত্রে ছোট ছেলে কি ক'রে একা বারান্দায় বার হয় ভেবে বিস্মিতও হলাম। তারপর হঠাৎ দেখি, ছেলেটি কখন অন্তর্হিত হয়েছে; ভাল ক'রে দেখতে গিয়ে দেখি—না, দাঁড়িয়েই রয়েছে। পর-মুহূর্তেই কিন্তু ছেলেটি পুনরায় অদৃশ্য হ'য়ে গেল। গতিক ভাল নয় দেখে দরজা লাগিয়ে শুয়ে পড়লাম।" ব'লে সুবোধ মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন।

সেই দিনই দাদাকে সুবোধের অভিজ্ঞতার কথা জানালাম। দাদা অবশ্য পূর্বের মতো মেয়েদের নিকট এ কথা বলতেও নিষেধ ক'রে দিলেন; কিন্তু সেদিনের মতো 'ও এমন কিছু নয়' বলতে পারলেন না।

সুবোধের অভিজ্ঞতার এবং আমাদের অভিজ্ঞতার দুটি গল্পকে স্বতন্ত্রভাবে উড়িয়ে দেওয়া (explain away করা) যত সহজ, একত্রে তত সহজ নয়। দুটি গল্পকে সংযুক্ত ক'রে দেখলে মনে হয়, উভয়ের সমষ্টি থেকে কোন এক সত্যের সুস্পষ্ট ইঙ্গিতই পাওয়া যাচ্ছে।

এ বিষয়ে একটা কথা জানানোর প্রয়োজন আছে। মাস কয়েক পরে আবার একদিন শ্যামরতন ও আমি উভয়ে মিলে দ্বিতীয়বার পরীক্ষা করবার উদ্দেশ্যে আমাদের বৈঠকখানা-ঘরে রাত্রি একটা পর্যন্ত জেগে কাটিয়েছিলাম। আমরা দুজন ছাড়া ঘরে আর কেউ ছিল না। সেদিন কিন্তু আমরা মার্বেল পড়ার শব্দ শুনতে পাই নি।

ভৌতিক সত্তা সম্বন্ধে বিশ্বাস যাঁদের সুদৃঢ়, তাঁদের কাছে কিন্তু দ্বিতীয় দিনে মার্বেলের শব্দ না শুনতে পাওয়ায় কৈফিয়ৎ আছে। তাঁরা বলেন,

প্রেতাত্মারা একবারই শুধু তাঁদের অস্তিত্বের প্রমাণ দেন, বারম্বার পরীক্ষা দেওয়ার তামাশায় শরিক হন না।

হয়ত তাই।

আমার দ্বিতীয় গল্পটি শোনা গল্প। শোনা হ'লেও এত বিশ্বস্তসূত্রে শোনা যে, তার ঘটনা-অংশ আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি, তাৎপর্য তার যা-ই হোক না কেন। আমার মাতাঠাকুরাণী এবং মেজদাদার মুখে গল্পটি বহুবার শুনেছি।

তখন আমরা পূর্ণিয়ায় থাকি। দুটি যমজ কন্যা প্রসব করার পর মাতাঠাকুরাণীর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে। পূর্ণিয়ায় যখন শারীরিক উন্নতির কোনো লক্ষণ দেখা গেল না, তখন উন্নততর চিকিৎসা এবং বায়ুপরিবর্তনের জন্য তাঁকে ভাগলপুর নিয়ে যাওয়া হ'ল। যমজ মেয়ে দুটির লালন-পালনের সুবিধার জন্যে নিযুক্ত করা হ'ল একটি দুগ্ধবতী ধাত্রী।

কিছুকাল ভাগলপুরে অবস্থান করার পর সম্পূর্ণ সুস্থ হ'য়ে মাতা-ঠাকুরাণী মেজদাদার সহিত পূর্ণিয়ায় ফিরে চলেছেন। সাহেবগঞ্জ স্টেশনে প্রায় সমস্ত রাত্রিই অতিবাহিত করতে হবে। ভোর চারটের সময়ে ঘাটের গাড়ি ছাড়বে; সেই গাড়িতে আরোহণ ক'রে সকরিগলিঘাটে এসে স্টীমারে গঙ্গা উত্তীর্ণ হ'য়ে মণিহারীঘাটে পৌঁছে পূর্ণিয়ার রেল ধরতে হবে।

সাহেবগঞ্জ স্টেশনে ওয়েটিং-রুমে মাতাঠাকুরাণী ও মেজদাদা অপেক্ষা করেছেন। রাত্রি তখন প্রায় বারোটা, মেজদাদার দেহে ঠেলা দিয়ে জাগিয়ে মাতাঠাকুরাণী বলেন, "রমণী, বড় খুকী মারা গেছে।"

বড় খুকী অর্থে যমজ দুটি কন্যার মধ্যে বড়টি।

চমকিত হ'য়ে মেজদাদা বললেন, "সে কি কথা! তুমি কেমন ক'রে জানলে?"

মা বললেন, "সে নিজে এসে আমাকে জানিয়ে গেল।"

মেজদাদা বললেন, "তুমি স্বপ্ন দেখেছ মা। ও কিছু নয়।"

সবেগে মাথা নেড়ে মা বললেন, "না, না,—স্বপ্ন-টপ্ন ওসব কিছু নয় আমি তখন জেগে ছিলাম। বড় খুকী এসে সহজ সুরে আমাকে বললে, 'মা, আমি তোমার বড় খুকী, এখনি মারা গেলাম। তোমাকে জানিয়ে যাচ্ছি।' আমি হকচকিয়ে গেলাম। কথা বলবার সময় না দিয়ে সে চ'লে গেল।"

মার বাক্যের মধ্যে বিশ্বাসের দৃঢ়তা দেখে মেজদাদা আর কোনো প্রতিবাদ করতে পারলেন না, চুপ ক'রে রইলেন।

পরদিন বেলা দশটার সময় উভয়েই পূর্ণিয়া স্টেশনে পৌঁছলেন। স্টেশন থেকে ভাড়ায় আমাদের বাড়ি যাবার পথে মাঝখানে এক জায়গায় কাপ্তেনঘাটের পুল পড়ে। কাপ্তেনঘাটের পুলের নিম্নেই পূর্ণিয়ার শ্মশান অবস্থিত। কাপ্তেনঘাটের পুলের উপর দিয়ে যাবার সময়ে মাতাঠাকুরাণী ঝাম্পনি থেকে মুখ বাড়িয়ে দেখছেন, সৎকার করতে যারা এসেছিল, তখনো তারা সেখানে আছে কি না! বড় খুকীর মৃত্যু সম্বন্ধে এতই তাঁর সুদৃঢ় বিশ্বাস।

বাড়ি পৌঁছে মেজদাদা দেখলেন, সাহেবগঞ্জ স্টেশনে মাতাঠাকুরাণী তাঁকে যে কথা জানিয়েছিলেন—স্বপ্ন দেখেই হোক, অথবা অপর যে কোন কারণেই হোক—তা সম্পূর্ণ নির্ভুল। ঠিক তার আগের রাত্রে বারোটা আন্দাজ বড় খুকী হঠাৎ মারা গেছে। বিশেষ কোন অসুখ-বিসুখ করে নি; সকল থেকে কয়েকবার বমি করেছিল, তারপর অকস্মাৎ মৃত্যু।

আমাদের সহজ সাধারণ বিবেচনা ও বিচারশক্তির দ্বারা এ গল্পটির যৌক্তিকতা পরীক্ষা ক'রে দেখতে গেলে সহজেই হয়ত এমন কয়েকটি

দুর্বল স্থান অনুভব করা যাবে, যার উপর রীতিমতো জেরা চালানো সম্ভব। কিন্তু কথা হচ্ছে, ভৌতিক কল্পনা যদি আদৌ ভুলই হয়, তা হ'লে ইহলোকের বুদ্ধি-বিচার ধারণা-বিবেচনার মাপকাঠি দিয়ে সে কথা প্রমাণ করতে যাওয়াও ভুল হবে।

তা ছাড়া, এ গল্পের মধ্যে ভৌতিক সংস্পর্শবর্জিত এমন দুটি ব্যাপার আছে, যার রহস্য সকল বুদ্ধি-বিচার-বিবেচনাকে হার মানায়। প্রথমত, সাহেবগঞ্জে মাতাঠাকুরাণী কর্তৃক বড় খুকীর মৃত্যুসংবাদ জ্ঞাপন; দ্বিতীয়ত, ঠিক সেই একই সময়ে পূর্ণিয়ায় বড় খুকীর মৃত্যু। কোনো লৌকিক কৈফিয়তের দ্বারা এমন অলৌকিক ব্যাপারের রহস্যোদ্ঘাটন বোধ করি আজ পর্যন্ত কারো দ্বারা সম্ভবপর নয়।

সুখাদ্য, বিশেষত বাঙালীর পক্ষে পাকা রুইমাছের মতো প্রথম শ্রেণীর সুখাদ্য, সুস্থ শরীরে রুচি এবং ক্ষুধার পরিপূর্ণ সহযোগিতার মধ্যেও কিরূপ যন্ত্রণার কারণ হ'তে পারে, তার একটা তিক্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চিত করেছিলাম কলিকাতা ঝামাপুকুর লেনের একটি মেসে বাস করবার সময়ে।

তখন আমি প্রেসিডেন্সি কলেজে বি. এ. পড়ি। হাইকোর্টের দীর্ঘ পূজার ছুটি আরম্ভ হ'তেই আমাদের ভবানীপুরের বাড়ি থেকে সকলে ভাগলপুরে চ'লে গেলেন। আমার কলেজ বন্ধ হ'তে তখনো দিন কুড়ি-বাইশ দেরি। সে সময়ে সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও গিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, আমার দুই খুড়তুত ভাই, ঝামাপুকুর লেনের একটি ছাত্র-মেসে থেকে কলেজে পড়েন। যতদূর মনে পড়ে, সেই বাড়িটি সতের নম্বরের।

সুরেনদাদা ও গিরীনের সম্পর্কে সর্বদা আমি ঐ মেসে গিয়ে আড্ডা জমাতাম, বিশেষত গান-বাজনা করতাম ব'লে, মেসের সকল সদস্যেরই সঙ্গে আমার পরিচয়, এমন কি কিছু খাতিরদারিও ছিল।

আমার আত্মীয়রা ভাগলপুর যাওয়ার পর সুরেনদাদার আগ্রহে পূর্ব-ব্যবস্থা অনুযায়ী আমি তাঁর দীর্ঘ-মেয়াদি অতিথি (long-term guest) হ'য়ে তল্পি-তল্পা নিয়ে ঝামাপুকুরের মেসে এসে আশ্রয় গ্রহণ করলাম। কিছুদিনের মতো আমার সঙ্গ অবিচ্ছিন্নভাবে সুলভ হওয়ায় সুরেনদাদা ও গিরীন ভায়ার ত কথাই নেই, অপর মেম্বারগণও বিশেষ আনন্দিত হলেন।

প্রাইভেট মেসের সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী সকল মেম্বারকে একাদিক্রমে এক এক মাস মেসের ম্যানেজার, অর্থাৎ সংসারের গৃহিণী, হ'তে হয়। ভাঁড়ারের চাবি থাকে, অবশ্য আঁচলে নয়, তাঁর জামার পকেটে; টাকাকড়ি থাকে তাঁরই বাক্সে; দোকান-বাজার হয় তাঁরই খেয়াল এবং হুকুম অনুসারে; আর প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যা দুবেলা তিনিই ভাঁড়ার বার ক'রে থাকেন। মাঝে মাঝে দরকার পড়লে চাকর-বামুনকে দু-চার টাকা আগাম-প্রাপ্তির জন্য হাত পাততে হয় তাঁরই নিকট। সর্বোপরি, বাজারের টাকাকড়ির হিসাবে দু-চার পয়সা যদি কম পড়ে, অথবা মবলগ দু-চার আনা আত্মসাতের বিষয়ীভূত হয়েছে ব'লে যদি সুস্পষ্ট হ'য়ে ওঠে তা হ'লে সে কথা ক্ষমা অথবা উপেক্ষা করবার একমাত্র মালিক ম্যানেজার। সুতরাং যাঁর যখন ম্যানেজারির পালা, চাকর-বামুনদের উপর তাঁর তখন প্রভাব-প্রতিপত্তি সকলের চেয়ে বেশি। আমি যখন মেসে এসে উঠলাম, তখন চলছে সুরেনদাদার পালা। কাজে-কাজেই ম্যানেজারবাবুর অতিথিরূপে আমার আদর-যত্ন একটু বেশি হবারই কথা, হয়েওছিল অবশ্য তাই। কিন্তু সেই হ'ল আমার যন্ত্রণার প্রথম কারণ; দ্বিতীয় কারণের কথা পরে বলছি।

আমি মেসে এসে পৌছতে সুরেনদাদা পাচককে বললেন, "ঠাকুর, এ বাবু কখনও মেসে থাকেন নি। বাড়িতে থাকেন, ভাল খান-দান। তুমি একটু ভাল ক'রে—"

সুরেনদাদাকে কথা শেষ করতে হ'ল না, সম্পূর্ণ সম্মতচিত্তে ঘাড় নেড়ে ঠাকুর বললে, "সে আর আমাকে বলতে হবে না বাবু, আপনার যখন ভাই, কোনো কষ্ট হবে না বাবুর।"

প্রথম কারণ এইরূপে সৃষ্টি করেন সুরেনদাদা; তার একটু পরেই আমি করলাম দ্বিতীয় কারণের সৃষ্টি। ঠাকুরের হাতে একটি টাকা দিয়ে

বললাম, "ঠাকুর, আমি সকালে তর্পণ করি, গঙ্গাজল দরকার হয়। আজ তর্পণ ক'রে এসেছি, আজ আর দরকার হবে না; কাল থেকে দরকার হবে। তুমি যদি আমার পিতলের ঘড়াটা ক'রে এক ঘড়া গঙ্গাজল এনে দাও, তা হ'লে ঐ জলেই যে-কয়েক দিন তর্পণ এখনো বাকি আছে চ'লে যাবে। ঘড়া বড় নয়, মাঝারি।"

ঠাকুর মনে মনে হিসেব ক'রে দেখলে, ম্যানেজারবাবুর যখন ভাই, তখন তাঁর ফাই-ফরমাশের ওপর একটু পরিশ্রম দেখাতে পারলে ম্যানেজারবাবুকে খুশি রেখেও বাজারের হিসাবে আরও কিছু সুবিধা করা যেতে পারে। ঘাড় নেড়ে বললে, "এনে দোব বাবু। এ টাকায় কি আনতে হবে বলুন?"

বললাম, "আনতে কিছু হবে না। গঙ্গাজল আনবার বকশিশ দিলাম তোমাকে ও-টাকা। আবার যাবার দিন ভাল ক'রে বকশিশ দিয়ে যাব।"

মেসের ঠাকুর অনেক বাবুকে চরিয়ে যায়, কাঁচা লোক সে নয়। তবু সামলাতে পারলে না, স্মিতস্ফুরিত মুখে এবং ঈষৎ বিস্ফারিত দুই চক্ষে উগ্র আনন্দের এবং ততোধিক উগ্র বিস্ময়ের সুস্পষ্ট প্রকাশ দেখতে পেলাম। এক ঘড়া গঙ্গাজল আনবার জন্য অগ্রিম এক টাকা বকশিশ! তাও বড় নয়, মাঝারি সাইজের ঘড়া! তার উপর, যাবার দিন পুনরায় ভাল ক'রে বকশিশ দিয়ে যাবার প্রতিশ্রুতি! সে ভাল বকশিশ নিদেন পক্ষে কোন্-না টাকা-দুই ত হবে! আমি অবশ্য ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখি নি, তথাপি সুনিশ্চিতভাবে বলতে পারি, সে সময়ে ঠাকুর মনে করেছিল, সহসা তার অদৃষ্টে একটা ছোটখাটো সৌভাগ্য-যোগের উদয় হয়েছে, যার ফলে তার পুজোর সময়ের তহবিল কিছু স্ফীত করবার জন্য ভবানীপুরের রাজপুত্রগোছের এক বাবুলোক মেসে এসে উপস্থিত হয়েছেন। অবশ্য এই গান-গাওয়া আল্লা-মারা বাবুটিকে সে

অনেক সন্ধ্যায় মেসে দেখেছে, কিন্তু তখন কে জানত, অমন থানের এমন চাল!

ঠাকুর বললে, "আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন বাবু, আপনাদের খাইয়ে-দাইয়ে আমি জল আনতে চ'লে যাব। জল নিয়ে এসে তারপর খাওয়া-দাওয়া করব।"

আমি বললাম, "তার দরকার নেই, আজ যে-কোন সময়ে জল আনলেই চলবে, খাওয়া-দাওয়া সেরে তারপর যেয়ো। আর এ বেলা আমি এখানে খাব না, ভবানীপুরে চললাম, সেখানেই আহার করব। তারপর সন্ধ্যার গাড়িতে আমার আত্মীয়দের হাওড়ায় তুলে দিয়ে ফিরব রাত্রে অবশ্য এখানে খাব।"

ঘাড় নেড়ে ঠাকুর বললে, "যে আজ্ঞে।"

সন্ধ্যার পর হাওড়া থেকে ফিরে এসে দেখি, মেসে আড্ডা জমেছে,—মনে হ'ল আমার আসবার পর আড্ডা আর একটু ঘনীভূত হ'য়ে উঠল। অক্ষয়বাবু নামে মেসে একটি শৌখিন মেম্বার ছিলেন, তাঁর একটি দামী হারমোনিয়ম ছিল। সে হারমোনিয়মটি তিনি সযত্নে রক্ষা করতেন এবং সহজে কাউকে হাত দিতে দিতেন না। কিন্তু আমার হাতে হারমোনিয়মের কোনো ক্ষতি হবে না, এ বিশ্বাসটুকু তাঁর ছিল। আমি মেসে এলেই তিনি হারমোনিয়মটি বার ক'রে দিতেন এবং পীড়াপীড়ি ক'রে আমাকে গান গাওয়াতেন। যতদূর মনে পড়ছে, সুযোগমতো আমার কাছে তিনি অল্প-স্বল্প সঙ্গীত শিক্ষাও করতেন।

সেদিনও আমি আসার পর অক্ষয়বাবুর হারমোনিয়ম এসে পড়ল এবং গান আরম্ভ হ'ল। গানে ও গল্পে আসর হ'য়ে উঠল সরগরম। গানের পর গল্প এবং গল্পের পর গান চলতে চলতে রাত যখন নটা সাড়ে নটা হ'ল, ভৃত্য এসে সংবাদ দিলে আহার প্রস্তুত।

এর আগে কখনো মেস-জীবন অতিবাহিত করি নি ; এর পরেও কখনো নয়। সামাজিক সংসারের সুনির্দিষ্ট ছক থেকে বেরিয়ে অসামাজিক মেসের আলগা এলাকায় প্রবেশলাভের পর তার সূত্রপাতটি ভারি মিষ্টি লাগল। বাঁধন আছে ; কিন্তু বন্ধন নেই ; ছন্দ আছে, কিন্তু সে ছন্দে মিল বসাবার অযথা উদ্বেগ নেই। খুশি হলাম। কিন্তু কে জানত, এই খুশি হওয়ার অব্যবহিত পরেই অপ্রত্যাশিত দিক থেকে সঙ্কট দেখা দিয়ে মেসের আনন্দময় অনাবিল দিবস-প্রহরের প্রত্যাশাকে ধূসর ক'রে দেবে।

হৈ-চৈ ক'রে একতলায় নেমে এসে খাবার ঘরে প্রবেশ ক'রে আসনে আসনে যেখানে যার খুশি ব'সে পড়া গেল। এক প্রান্ত থেকে ঠাকুর অন্নের থালা পরিবেশন করতে আরম্ভ করেছে। অসাধারণ ক্ষিপ্রতা। দেখতে দেখতে সকলের সামনে ভাতের থালা ও ডালের বাটি প'ড়ে গেল। গোটা তিনেক তরকারি,—একটা ভাজা, একটা চচ্চড়ি ও একটা ঝাল-দেওয়া মাছ। মেসের বাঁধা নিয়ম অনুযায়ী প্রত্যেকের পাতে দুই খণ্ড ক'রে মাছ। তরকারিগুলি থালার দক্ষিণ দিকে স্থাপিত।

ভাত ভাঙতে গিয়ে হাত কি একটা ঠেকল! বার ক'রে দেখি, এক টুকরো মাছ। বুঝতে বাকি রইল না, 'যাবার দিনে ভাল ক'রে বকশিশ দেওয়া' যাতে সত্য সত্যই ভাল হ'তে পারে তদ্বিষয়ে ঠাকুর অবিলম্বিত ব্যবস্থা অবলম্বন করেছে। তাড়াতাড়ি মাছের টুকরোটা ভাতের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে পাশের দিক থেকে খানিকটা ভাত ভেঙে নিয়ে ডাল ঢালতে গিয়ে ডালের মধ্যেও কি একটা কঠিন পদার্থ অনুভব করলাম। প্রবল সন্দেহ হ'ল, এও হয়ত মাছেরই টুকরো। এদিক ওদিক দক্ষিণে বামে তাকিয়ে দেখলাম, ক্ষুধার প্রথম মুখে সকলেই নিজ নিজ আহারে ব্যস্ত, আমাকে লক্ষ্য করার মতো অবসর কারও তখন নেই। ডালের ভিতর থেকে কঠিন পদার্থটাকে তাড়াতাড়ি উদ্ধার ক'রে দেখি, অনুমানে একটুও

ভুল হয় নি, আর একটা মৎস্যখণ্ডই বটে। তাড়াতাড়ি সেটাকে চচ্চড়ির ভিতর চাপা দিয়ে ডাল-ভাত মেখে ভাজা দিয়ে খেতে খেতে, এ কঠিন অবস্থায় কি করা কর্তব্য তা নির্ণয়ের দুর্ভেদ্য সমস্যায় নিমগ্ন হলাম। কথাটা যদি প্রকাশ ক'রে ব'লে ঠাকুরের অসঙ্গত কাজের নিন্দা করি, তা হ'লে আমার সততা রক্ষা হয় বটে; কিন্তু ঠাকুর বেচারাকে বিপদে ফেলা হয়। অথচ, যেখানে প্রত্যেকে মাত্র দু-টুকরো ক'রে মাছ খাচ্ছে, আমি সেখানে প্রকাশ্য দু-টুকরো এবং গোপনে আরও দু-টুকরো চোরাই মাছ খাই কি ক'রে? দুশ্চিন্তায় আমার আহার মন্থরগতিতে চলেছে; অপর পক্ষে যারা ক্ষুধার স্বাভাবিক নিষ্পাপ তাড়নায় খাচ্ছে, তাদের আহার এগিয়ে চলেছে দ্রুতগতি ভরে। যা হয় একটা কিছু অবিলম্বে স্থির করা দরকার।

মনে হ'ল, ঠাকুরকে অন্তত একটা সুযোগ দেওয়া মোটের উপর সঙ্গত হবে। কালই তাকে সতর্ক ক'রে দিতে হবে, এমন অন্যায় কাজ দ্বিতীয়-বার যেন সে কিছুতে না করে। প্রথম অপরাধেই বেচারাকে ধরিয়ে দিলে নীতির দিক দিয়ে আমার পক্ষে যত বাহাদুরি দেখানোই হোক-না কেন, অন্তরের দিক দিয়ে একটু হৃদয়হীনতারও পরিচয় দেওয়া। হয় ও যদি আমাকে সন্তুষ্ট করবার অভিপ্রায়ে দুখানা মাছ চুরি ক'রে দিয়ে থাকে, তা হ'লে ওর সেই ঋণ পরিশোধ করবার উদ্দেশ্যে আমি যদি সে কথাটা আজকের মতো গোপন ক'রে যাই, তা হ'লে বোধ হয় খুব বড় একটা অপরাধ হয় না।

মনের মধ্যে নৈতিক সমর্থন পাওয়া মাত্র নিমেষের মধ্যে কার্যপদ্ধতি নির্ধারিত হ'য়ে গেল। ঝাল-দেওয়া মাছের একখানা টুকরো সকলের অলক্ষ্যে নিঃশব্দে টেনে নিয়ে যে ব্যাপার করলাম, তাকে গলাধঃকরণ পর্যন্ত বলা চলে, কিন্তু খাওয়া কিছুতেই বলা যায়

না। তার পর সামনের দিক থেকে মাছের টুকরো সমেত বেশ খানিকটা ভাত ভেঙে নিয়ে ডাল মেখে মাছ দিয়ে খেতে আরম্ভ করলাম। যত শীঘ্র সম্ভব এ মাছটারও গতি ক'রে চচ্চড়ি-ঢাকা মাছটা সন্তর্পণে বের ক'রে নিয়ে খেতে আরম্ভ করলাম। এখন বেশ খানিকটা নিশ্চিন্ত বোধ করলাম,—অবস্থা আয়ত্তে আনা গেছে। এখন যদি একান্তই কেউ আমার থালা লক্ষ্য করে, বড় জোর মনে করবে, মাছ-ভক্ত মানুষ চচ্চড়ি শেষ না ক'রেই মাছে হাত দিয়েছে।

সত্য কথা বলতে, পাকা রুই মাছের সুমিষ্ট আস্বাদ পেলাম তৃতীয় এবং চতুর্থ মৎস্যখণ্ডে; পূর্বের দুই খণ্ড নষ্ট হয়েছিল কেবলমাত্র সঙ্কট-মোচনের প্রচেষ্টায়; দুই-একটা প্রশ্নের অতি-সংক্ষিপ্ত উত্তর দেওয়া ছাড়া এ পর্যন্ত স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে কারো সঙ্গে কথা কই নি; এবার নিশ্চিন্ত উল্লসিত মনে হাস্য-কৌতুকে যোগ দিলাম। কিন্তু অনেক কৌশলে অনেক দুঃখে আজ সঙ্কট মোচন হয়েছে। এমন কুৎসিত ব্যাপারকে আর কিছুতেই প্রশ্রয় দেওয়া হবে না, ঠাকুরকে শাসন করতেই হবে।

পরদিন সকালে কিন্তু ঠাকুরকে মাছের কথা বলবার সুযোগ পেলাম না। তাকে একান্তে পেলাম একেবারে খাবার সময়ে। রাত্রিকালে সকলে একত্রে আহার করে; দিনের বেলা কিন্তু সে যার প্রয়োজনমতো যখন সুবিধে খেয়ে নেয়। সে সময়ে বেলা এগারোটার সময়ে প্রেসিডেন্সি কলেজ আরম্ভ হ'ত, বাকি সব কলেজই শুরু হ'ত সাড়ে দশটা বেলায়। সুতরাং আমি যখন খেতে বসলাম, তখন প্রায় সকল সদস্যই আহারাদি সমাপন ক'রে বেরিয়ে গেছে।

ঠাকুর থালা এনে আমার পাতের সামনে রাখলে। পরিপাটী ক'রে বাড়া অন্ন, বেশি বেশি ব্যঞ্জন, চার খণ্ড মৎস্য। তা-ও প্রত্যেক খণ্ডই বৃহদাকার, পূর্বরাত্রে যে আকারের মাছ খেয়েছিলাম তার অন্তত দেড়া।

থালা রেখে আমার সামনে ব'সে প'ড়ে স্মিতমুখে ঠাকুর বললে, বাবু, যদি রাত্রেও এখানকার মতো একটু আগে-পাছে ক'রে বসেন, তা হ'লে একটু জুৎ ক'রে খাওয়াতে পারি।"

চারখানা মাছ দেখেই মেজাজ বিগড়ে গিয়েছিল, তার উপর এই কথা শুনে পিত্ত জ'লে গেল। তথাপি নূতন লোক আমি, কতকটা নরম সুরেই বললাম, "তুমি কি মনে করছ ঠাকুর, মাছের লোভে আমি সকলের পরে খেতে বসেছি?"

সবেগে মাথা নেড়ে জিভ কেটে ঠাকুর বললে, "রাম! রাম! তাই কখনো মনে করতে পারি? মাছের আপনার কি অভাব? আপনি একা বসলে আমি একটু জুৎ পাই।"

বললাম, "কিন্তু জুৎ ত আমারও পাওয়া দরকার। কাল রাত্রে তুমি লুকিয়ে দু-টুকরো মাছ আমাকে বেশি দিয়েছিলে, তা খেতে আমার ভারি খারাপ লেগেছিল।"

অবাক হ'য়ে বিস্ফারিত নেত্রে ঠাকুর বললে, "কেন?"

ঠাকুরের কথার সুরে বুঝতে পারলাম, আমার মন্তব্যের আসল তাৎপর্যই সে গ্রহণ করতে পারে নি। চিরদিন বাবুদের বঞ্চিত ক'রে মাছ খেয়ে খেয়ে যে রসনা পাকিয়েছে, চুরি-করা মাছ খেতে কারো খারাপ লাগতে পারে, এমন কথা তার ধারণারই অতীত। ঠাকুরের কথার কোনো সোজা উত্তর না দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "আজ বাবুদের কখানা ক'রে মাছ দিয়েছিলে ঠাকুর?"

ঠাকুর বললে, "দুখানা ক'রে।"

"তা হ'লে আমাকে চারখানা কেন?"

"আপনার সঙ্গে বাবুদের তুলনা? ওঁরা হলেন মেম্বার, আপনি গেস্টো (guest)।"

"ওঁদেরও কি এমনি বড় বড় টুকরো দিয়েছিলে?"

মৃদু হেসে ঠাকুর বললে, "উনিশ-বিশ।"

"কার বিশ? আমার, না, ওঁদের?"

সোজা উত্তর না দিয়ে, বোধ করি আমাকে কিছু খুশি করবারই মতলবে ঠাকুর বললে, "আপনার জন্যে একটু বেছে-বুছে রেখেছিলাম।"

বেছে-বুছে আদৌ নয়। মাছ কোটবার সময়ে চাকরকে দিয়ে ঠাকুর বড় বড় কয়েক খণ্ড কুটিয়ে নিয়েছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই. রাত্রের জন্যও নিশ্চয় এই রকম চার টুকরো মাছ আমার জন্যে পৃথক করা আছে। এইরূপ বৃহদাকার আট টুকরো মাছের দ্বারা যে পরিমাণ ন্যায়-সঙ্গত মাছ হ'তে মেসের মেম্বারদের বঞ্চিত করেছি, তার কথা ভেবে মনের মধ্যে গভীর গ্লানি উপস্থিত হ'ল। বললাম, "শোন ঠাকুর, আমি গেস্টোই হই আর যা-ই হই, মেম্বারদের যেমন মাছ দেবে আমাকেও ঠিক তেমনিই দেবে। তুমি ত দু-টুকরো মাছ ভাতের ভেতর আর ডালের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে খালাস, আমিও না-হয় তোমার মান আর আমার নিজের মান বাঁচাবার জন্যে কোনো রকমে বাড়তি মাছ দুখানা লুকিয়ে খেলাম,—কিন্তু কাঁটা? থালার পাশে চারখানা মাছের কাঁটা যে দুখানা মাছের কাঁটার ডবল আকারে উঁচু হ'য়ে ওঠে, তার কি করবে বল? মান বাঁচাবার জন্যে মাছ না-হয় লুকিয়ে খেলাম, কিন্তু লুকিয়ে কাঁটা খেলে প্রাণ বাঁচবে কি? অতএব ওসব লুকোচুরিতে আর কাজ নেই, দু-টুকরো মাছেই আমি খুব খুশি হব, এবার থেকে তুমি আমাকে মেম্বারদের সঙ্গে ঠিক একভাবে মাছ দেবে। আপাতত তিনখানা মাছ তুলে নাও।"

সবিস্ময়ে ঠাকুর বললে, "মাত্র একখানা খাবেন!"

বললাম, "এ একখানা মাছ বাবুদের দেওয়া দুখান মাছের সমান হবে।"

"কিন্তু বাবুরা ত এখন কেউ নেই, তবে আপনার আপত্তি কিসের ?"

"সে কথা তুমি বুঝবে না ঠাকুর। তিনখানা মাছ তুমি তোল।"

কাতরকণ্ঠে ঠাকুর বলিলে, "সে তিনখানা মাছ কার মুখ দোব বাবু ? বাবুদের দেওয়া চলবে না, আমাদের মুখেও রুচবে না।"

বললাম, "তা যদি একান্তই না রোচে, তোমাদের মেসে ত একটা বৃহৎ সাইজের বেড়াল আছে, তাকে দিয়ো ; তার মুখে বাধবে না।"

পাত থেকে একখানা মাছ তুলে নিয়ে ব্যগ্রকণ্ঠে ঠাকুর বললে, "আর কোনো আপত্তি করবেন না বাবু,—আপনার কথা রাখলাম।"

পাপের ফাঁসে মানুষ যদি একবার মাথা গলায়, আর তার রক্ষা থাকে না ; নৈতিক শক্তি হারানোর ফলে পাপ যখনই টান দেয় তখনই সে অনিচ্ছা সত্ত্বেও পাপের দিকে এগিয়ে যায়, পরিপূর্ণ শক্তি দিয়ে প্রতিবাদ করতে পারে না। কাল রাত্রে চোরাই মাছ দুটি ভক্ষণ করার ফলে আমিও আমার নৈতিক শক্তি হারিয়েছিলাম, ঠাকুরের সহিত রফায় সম্মত হ'তে হ'ল।

রাত্রে খেতে ব'সে স্পষ্ট প্রতীয়মান হ'ল, সকালে ঠাকুরকে যে সমস্ত উপদেশ দিয়েছিলাম, সবই ভস্মে ঘি ঢালা হয়েছে। খানিকটা মাছ, বোধ হয় দু-টুকরোই হবে, কাঁটা বেছে চূর্ণ ক'রে চচ্চড়ির সঙ্গে মিশয়ে দিয়েছে। তা না-হয় দিক, কিন্তু প্রকাশ্যে যে দু খণ্ড পাতে দিয়েছে তার নিন্দনীয় আয়তন দেখে লজ্জায় আমার মাথা কাটা যেতে লাগল। বড় বড় আকারের আটখানা মাছ বার ক'রে নেওয়ার ফলে সাধারণ খণ্ডগুলো যেন কালকের রাতের খণ্ডর চেয়েও ছোট হ'য়ে গেছে ; আর তার দরুন উভয়বিধ খণ্ডের মধ্যে আকারের অনুপাত এমন অসঙ্গতভাবে অসম হ'য়ে দাঁড়িয়েছে যে, তা লক্ষ্য ক'রে অপর পক্ষ ক্রুদ্ধ হ'য়ে যদি প্রতিবাদ ক'রে বসে, আপত্তি করবার কিছু থাকে না।

কাল তবু সাধারণ আকারের প্রকাণ্ড টুকরো ছুটোর সহায়তার ডাল ও ভাতের মধ্যে লুকানো চোরাই মাল ছুটোকে পাচার করবার কিছু সুযোগ ছিল। আজ এই ঢিবে-ঢিবে রামটুকরো ছুটোর কি উপায় করা যায়। কাঁটার সমস্যা না হয় সমাধান করা যাবে কতক কাঁটা পাতের পাশে ফেলে আর বাকি পিছন দিকের ভাতের তলায় অলক্ষিতে চালান ক'রে। কিন্তু ভাজা ও চচ্চড়িতে হাত দেবার আগে মাছ যদি শেষ ক'রে ফেলি, তা হ'লে দেখতে শুনতে ভারি বিশ্রী হয়। কে কি দেখল, কে কি ভাবল তা জানি নে, কোনোরূপে ঘাড় গুঁজে সে রাত্রির পালা শেষ করলাম।

পরদিন সকালে উঠে ভেবে দেখলাম, ঐ উৎসাহশীল ঠাকুরকে দমন করা আমার কাজ নয়, সুরেনদাদার কাছে দরবার করা ছাড়া উপায় নেই। সুবিধামতো তাঁকে একটু নির্জনে নিয়ে গিয়ে কাতরস্বরে বললাম, "দোহাই সুরেনদাদা, তোমার ঠাকুরের হাত থেকে বাঁচাও আমাকে। নইলে কোন্ দিন মাছের কাঁটা গলায় বিঁধে হাসপাতালে যেতে হবে। উঃ! পাকা রুই মাছ যে এমন বিপজ্জনক জিনিস হ'তে পারে, আগে তা কে জানত!"

সকৌতূহলে সুরেনদাদা জিজ্ঞাসা করলেন, "কেন বল্ ত?"

আনুপূর্বিক সকল কথা সুরেনদাদার নিকট যৎপরোনাস্তি কাতরভাবে বিবৃত করলাম। কাহিনীটি মাছ খাওয়া সংক্রান্ত হ'লেও, আমার বিশ্বাস তার মধ্যে করুণরসেরই প্রাধান্য ছিল। আশা করেছিলাম, সব কথা শুনে সুরেনদাদাও সহানুভূতিশীল হবেন। কিন্তু কাহিনীটা শুনতে শুনতে তাঁর মুখ উল্লসিত হ'য়ে উঠল এবং শেষ হ'লে সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পারলাম, তাঁর ধারণা হয়েছে—আমি তাঁর কাছে প্রগাঢ় কৌতুকরসের অবতারণা করেছি। কুঞ্চিত চক্ষে ভুজভুজ ক'রে হাসতে হাসতে বললেন, "এর জন্যে

কাতর হয়েছিস? এ ত সৌভাগ্যের কথা রে! চারখানা ক'রে বড় বড় রুই মাছের টুকরো বরাত জোর না হ'লে জোটে না। যে 'আপ্ সে আতা হ্যায় উস্‌কো' আসতে দে।

সুরেনদাদার দু হাত চেপে ধ'রে বললাম, "ও-কথা ব'লে এড়িয়ে গেলে চলবে না, রক্ষা করতে হবে।"

মনে হ'ল, কাতর প্রার্থনায় সুরেনদাদার চিত্ত একটু দ্রবীভূত হয়েছে। বললেন, "আচ্ছা, ঠাকুরের সঙ্গে কথা কইব।"

কি কথা কয়েছিলেন তা সুরেনদাদাই বলতে পারেন, আমার কিন্তু মনে হ'ল, যদি কথা ক'য়ে থাকেন, তদ্দ্বারা ঠাকুরের উৎসাহ শাণিতই হয়েছে। সেদিন মেসে মাংসের পালা। রাত্রে খেতে ব'সে দেখি, আমার বাটিতে নির্বাচিত নরম নরম একরাশ মাংস গজ্ গজ্ করছে, হাড় এবং ছাল সযত্নে বাদ দেওয়া, তার উপর গোটা পাঁচ-ছয় মেটের টুকরো। মাছের পরিমাপে মাংসের হিসাব ধরা একটু কঠিন। বুঝলাম, তারই সুযোগ নিয়ে ঠাকুর মাছের ঝাল মাংসয় ঝেড়েছে। এ কথাও বুঝতে বাকি রইল না যে, ঝামাপুকুরের মেস না পরিত্যাগ করতে হ'লে 'what cannot be cured must be endured'-নীতি অনুযায়ী ঠাকুরকে সহ্য করতেই হবে।

ঠাকুরের উপর রাগ ধরে, কিন্তু একটু মায়াও হয়। তার পদ্ধতি নিকৃষ্ট, কিন্তু উদ্দেশ্য নিন্দনীয় নয়,—সে আমাকে খুশি করতেই চায়। যাবার দিন দু টাকা বকশিশে চলবে না দেখছি। কিছু উঠতেই হবে।

মৎস্য-সমস্যার দ্বারা ঝামাপুকুরের মেস কণ্টকিত ছিল বটে, কিন্তু চিত্তবিনোদনের দুটি উপায়ও সেখানে খুঁজে পেয়েছিলাম। প্রথম উপায়টি পেয়েছিলাম এক সঙ্গীতের আসরে; দ্বিতীয়টি স্কুলপথগামিনী দুটি

বালিকার অবয়বে। প্রথমটির জন্য মেস ছেড়ে দু-দশ কদম দূরে যেতে হ'ত; দ্বিতীয়টির জন্য কিন্তু পাদমেকং মেস পরিত্যাগ করবার প্রয়োজন হ'ত না,—লগ্ন অনুযায়ী মেসের বারান্দায় দাঁড়াইলেই চলত। প্রথমে সঙ্গীত-আসরের কথাই বলি।

একদিন বেচু চ্যাটার্জি স্ট্রীট হ'য়ে বাসায় ফিরছি। মেসের কাছাকাছি এসে দেখি, একটি বাড়িতে পথের ধারে একতলার বৈঠকখানায় উচ্চাঙ্গের গান-বাজনা চলেছে। বাল্যকাল থেকে সঙ্গীতের অনুরক্ত শ্রোতা,—দাঁড়িয়ে পড়লাম। বৈঠকখানায় ফরাসের উপর গাইয়ে বাজিয়ে ও শ্রোতার ভিড়ে তিল ধারণের স্থান নেই। বাইরে পথের ধারে জানলায় জানলায় পথিক ও পল্লীবাসীর জনতা। ভিতরে যখন মাঝে মাঝে গানের সমের উপর শ্রোতাদের সমবেত প্রশংসামত্ত কণ্ঠের উচ্চ ঐকরব ধ্বনিত হচ্ছে, বাইরেও তখন জনতার মধ্যে তার সাড়া উচ্ছল হ'য়ে উঠছে। বৈঠকখানা ও পথপার্শ্ব নিয়ে একটা বৃহৎ আসরের সৃষ্টি হয়েছে। ভারি জমজমাট অবস্থা।

যে গানটা চলছিল শেষ হ'লে, পথের এক ভদ্রলোকের নিকট হ'তে কিছু কিছু তথ্য সংগ্রহ করলাম। রায়সাহেব হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের গৃহের কর্তা থেকে আরম্ভ ক'রে ছোট ছোট ছেলেরা পর্যন্ত সকলেই সঙ্গীতের বিশেষ অনুরাগী; দু-চার দিন অন্তর প্রায়ই সঙ্গীতের বৈঠক বসে; তখনকার দিনের কয়েকজন খ্যাতনামা গাইয়ে-বাজিয়ে, যথা—কানা শরৎ, কায়েত শরৎ, ভোলানাথ বাঁড়ুজ্জে, সুশে (সুশীল) বাঁড়ুজ্জে প্রভৃতি নিয়মিত এসে আসর জমান।

পরবর্তী গান আরম্ভ হ'ল। প্রথমে কিছুক্ষণ চলল আলাপ, তারপর সহসা এক সময় শুরু হ'য়ে গেল বিলম্বিত লয়ের খেয়াল। তানে-বাঁটে গমকে-মীড়ে সার্গমে গান হ'তে লাগল অলঙ্কৃত। বিশুদ্ধ রাগের

অভিজাত চালের সহিত বাঁয়া-তবলার অপরূপ সংগত মিশ্রিত হ'য়ে সৃষ্টি করলে এক বিচিত্র স্বরলহরী, যা মাঝে মাঝে খণ্ডিত হ'তে লাগল শ্রোতৃবর্গের অদমনীয় স্বতঃস্ফূর্ত বাহবা এবং সম দেওয়ার রবে। বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে গান যখন শেষ হ'ল, তখন রাত্রি নটা বেজে গেছে।

আর দেরি করা চলে না। ওদিকে মেসে সকলের আহারকার্য যদি শেষ হ'য়ে গিয়ে থাকে, তা হ'লে ত মাছের কাঁটা বাগিয়ে ঠাকুর আমার অপেক্ষায় ব'সে আছে। একা অসহায় অবস্থায় তার হাতে পড়লে নাকালের আর সীমা থাকবে না। দ্রুতপদে মেসের দিকে অগ্রসর হলাম।

যে কয়েকদিন ঝামাপুকুরের মেসে ছিলাম, তার মধ্যে পাঁচ-ছয় দিন সঙ্গীতের আসর বসেছিল। সর্বদা খবর রাখতাম এবং আসর আরম্ভ হ'লেই যথাস্থানে উপস্থিত হ'য়ে পদচারণ আরম্ভ করতাম। সেদিন বোধ হয় আমার পালার চতুর্থ দিন। গান চলছে, যথানিয়ম ধীরে ধীরে পায়চারি করতে করতে গান শুনছি, এমন সময় একটি ভদ্রলোক আমার নিকট উপস্থিত হ'য়ে বললেন, "আপনি ত দেখি প্রায়ই আসেন!"

মৃদু হেসে বললাম, "তা আসি।"

"গান-বাজনা ভালবাসেন বুঝি?"

বললাম, "বাসি।"

"তবে আসরে গিয়ে বসুন না, এখনো ত জায়গা রয়েছে। গানের আসরে শ্রোতার ত আটক নেই।"

তা হয়ত নেই; কিন্তু জানা নেই, শোনা নেই, সম্পর্ক নেই, হঠাৎ গিয়ে হাজির হব, তারপর কেউ যদি গম্ভীরভাবে মুখ তুলে তাকিয়ে দেখে ব'লে বসে, "কি চাই এখানে?" তা হ'লে এমন তাল কেটে যাবে

যে, পথে দাঁড়িয়েও গান শোনা আর চলবে না। নিজের মান নিজের হাতে রাখাই ভাল।

ভদ্রলোককে বললাম, "ভেতরে গিয়ে বসলে ইচ্ছামতো ওঠা চলবে না। এখানে কোনো অসুবিধে নেই।"

ঘণ্টা ছুই কান ভ'রে গান শুনে প্রসন্নচিত্তে মেসে ফিরলাম।

সুদীর্ঘ সাতচল্লিশ-আটচল্লিশ বৎসর অতীতের কথা, কিন্তু সে সঙ্গীত-আসরের স্মৃতি মনে পড়লে এখনো যেন তার গভীর-মিষ্ট স্বর-ঝঙ্কার কানের মধ্যে শুনতে পাই।

ঝামাপুকুরের মেসের দ্বিতীয় আকর্ষণের কথা হচ্ছে পূর্বোক্ত শ্লেটপুস্তকহস্তা বিলম্বিতবেণী ছুটি স্কুল-বালিকার কথা। এবার সৎসাহসের সহিত সেই বিচিত্র ও আপাতগোপনীয় কাহিনী বলি।

সকালে আহারের পর একদিন মেসের দ্বিতলের বারান্দায় দাঁড়িয়ে অলস অন্যমনস্কভাবে পথের লোক-চলাচল দেখছি। মেসের প্রায় সকলেই বেরিয়ে গেছে, অবশিষ্ট আমিও মিনিট দশেক পরে কলেজ রওনা হব। এমন সময়ে দেখি, পশ্চিম দিক থেকে বই-শ্লেট হাতে দুটি মেয়ে আসছে। হঠাৎ চেতনা যেন সজাগতর হ'য়ে উঠল; আর মেয়ে দুটি যতক্ষণ দৃষ্টিপথে রইল, পথের বাকি সকল বস্তুই হ'য়ে গেল অবান্তর।

মেয়ে দুটি যুবতী নয়, কিশোরীও নয়—নিতান্তই 'অলপ বালিকা-বয়সী'; বড়টির বয়স বছর দশেক, ছোটটির বয়স বছর আষ্টেক। কিন্তু এজন্য আক্ষেপ করবার কোনো হেতু নেই,—তখনকার দিনই ছিল ঐ বয়সের। সেকালে মেয়েদের বিবাহ হ'ত এগার-বারো বৎসর বয়সে, সুতরাং প্রাগ্‌বিবাহ কালের যা কিছু করণীয় ছেলেদের সবই সারতে হ'ত আট দশ বৎসর বয়সের মেয়েদের অবলম্বন ক'রে। এখনকার যুবকেরা ফ্রকপরিহিতা যে-সব মেয়েকে খুকী ব'লে সম্বোধন করে, আমাদের কালের ছেলেরা সেই বয়সের মেয়েদের মনে মনে সখী ব'লে সম্বোধন করত, আর রাত্রে লুকিয়ে লুকিয়ে তাদের নামে কবিতা লিখত। তখনকার দিনের কোনো এক কবি যে 'পাতা-ঢাকা ফুল'কে লক্ষ্য ক'রে লিখেছিলেন—

আমারো নয়ন রয়েছে এখনো
তোমার স্বপনে মুগ্ধ।
পাতা-ঢাকা ফুলে অলির মতন
হৃদয় আমার লুব্ধ।

হলফ নিয়ে বলতে পারি, সে পাতা-ঢাকা ফুলের বয়স বছর বারোর অধিক কখনই ছিল না। তখনকার দিনে আমাদের অলিধর্মী মন কলিরই ভজন গাইত।

এটা নিতান্তই রুচির কথা। এক যুগে ফল ভাল লাগে, এক যুগে ফুল; এক যুগে ফুল ভাল লাগে, আর এক যুগে কুঁড়ি। আমাদের যুগ ছিল কলিকার যুগ; আমাদের হৃদয়বৃত্তি, আমাদের কাব্যরসোৎসাহ আলোড়িত হ'ত কলিকাকে কেন্দ্র ক'রে। ফুলকে কেন্দ্র ক'রে আলোড়িত হবার সুযোগ আমাদের কালে দুর্লভ ছিল। কলি যখন ফুল হ'য়ে ফুটত, তখন তাকে নিয়ে কাব্য রচনা করা যেত না—বড় জোর বলা চলত—

যে আমার যৌবনের ছিল সহচরী,
আশার কনকরেখা, হৃদয়ের রাণী,
পরস্ত্রী সে কাছে আসে মাতৃরূপ ধরি'
সসম্ভ্রমে চেয়ে দেখি, সরে নাকো বাণী।

নিশ্চেতন মনে, বোধ করি কতকটা চেতন মনেও, একটা আগ্রহ বাসা বেঁধেছিল। আহারের পর মাঝে মাঝে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াতাম তিন-চার দিন পরে আবার একদিন মেয়ে দুটিকে দেখতে পেলাম। একদিন বৈকালের দিকে দেখি, মেয়ে দুটি পূর্ব দিক হ'তে পশ্চিম দিকে চলেছে,—সম্ভবত স্কুল থেকে বাড়ির দিকে। কেমন যেন একটা নেশা ধ'রে গেছে। সুযোগ পেলেই অপেক্ষা ক'রে থাকি; কখনো দেখতে পাই, কখনো পাই নে।

একদিন হাতে-নাতে ধরা প'ড়ে গেলাম সুরেনদাদার কাছে। সেদিন কি কারণে মনে নেই সুরেনদাদা বাড়ি ছিলেন। মেয়ে দুটি যাচ্ছে, আমি

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখার কার্য চালাচ্ছি, এমন সময় সুরেনদাদা পাশে এসে দাঁড়িয়ে বললেন, "কি দেখছিস ?"

বললাম, "পথ।"

"শুধু পথ ?—আর কিছু নয় ?"

হেসে বললাম, "আরো কিছু।"

ধরা এবং ধরা-পড়া দুইই হ'য়ে গেল। সুরেনদাদা বললেন, "বেশ দেখতে, না ?"

দুটি কারণে স্বীকার করতে হ'ল। প্রথমত, বেশ দেখতে না হ'লে আমার চক্ষু দুটির গুরুতর দোষারোপ করতে হয়, মেয়ে দুটিকে অত আগ্রহের সহিত দেখার সর্বপ্রধান কৈফিয়ৎ থেকেই তা হ'লে নিজেকে বঞ্চিত করি; দ্বিতীয়ত, 'বেশ নয়' বললে সুরেনদাদাই বা সে কথা বিশ্বাস করবেন কেন ?

সুরেনদাদা বললেন, "বোধ হয় দুই বোন।"

বললাম, "আমার ত 'বোধ হয়'ও মনে হয় না। দুটির মধ্যে নানান প্রভেদকে জড়িয়ে এমন এক অভেদ আছে, যা একমাত্র দুই বোনের মধ্যেই থাকা সম্ভব।"

সুরেনদাদা আমার বিচার সমর্থন করলেন।

এ ঘটনার পর আরও কয়েক দিন মেয়ে দুটিকে দেখবার সুযোগ লাভ করেছিলাম।

একটা কথা ভাবছি। আমার এই কাহিনী শুনে পাঠকগণ, বিশেষত সুরুচিসম্পন্না পাঠিকাগণ, একটু অস্বস্তি বোধ করছেন না ত ? এমন কথা তাঁরা ভাবছেন না ত যে, মেসের বারান্দা থেকে স্কুলপথগামিনী দুটি নিরীহ বালিকাকে বারংবার দেখার মধ্যে কি এমন সঙ্গত আচরণের পরিচয় দেওয়া হয়েছিল, আর সেই কথা এত দিন পরে এমন ফলাও

ক'রে লিপিবদ্ধ করার মধ্যে কি এমন বাহাদুরি প্রকাশ করাই বা হচ্ছে? —এমন কথা তাঁরা যদি সত্য সত্যই ভাবেন তা হ'লে আমার বক্তব্য হবে, বাহাদুরি প্রকাশ করা কিছুই হচ্ছে না,—যে মানুষ সত্তর বৎসর বয়সে পদার্পণ করে, তার দেহের চামড়াই শুধু আলগা হয় না; মন, মুখ, সঙ্গে সঙ্গে কলম পর্যন্ত আলগা হ'য়ে যায়। আর আচরণের বৈধতা সম্বন্ধে বলতে পারি, এ বিষয়ে আমি যোগ্যতম ব্যক্তির অভিমত গ্রহণ করেছিলাম। তিনি আমার আচরণের বৈধতার সপক্ষে সার্টিফিকেটই শুধু দেন নি—সকল কথা শুনে বেশ একটু পুলকিতও বোধ ক'রেছিলেন।

কিন্তু সে যাই হোক, এ বিষয়ে একটু নৈর্ব্যক্তিক আলোচনা হ'লে মন্দ হয় না। কথাটার একটা যুক্তিমূলক মীমাংসা হওয়া দরকার।

প্রশ্ন হচ্ছে, একজন পুরুষের পক্ষে অপর এক পুরুষের প্রতিভাব্যঞ্জক বীরত্বদীপ্ত সুশ্রী মুখের প্রতি বারংবার দৃষ্টিপাত ক'রে খুশি হওয়া যদি অবৈধ না হয়, তা হ'লে সেই পুরুষের পক্ষে কোনো সুন্দরী তরুণীর মুখমণ্ডলে বালার্কের আভা এবং নীলপদ্মদ্বয়ের লীলা দেখে খুশি হ'য়ে একাধিকবার দৃষ্টিপাত করলে অবৈধ আচরণ হবে কেন? আমাকে যদি এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হয় আমি বলতে বাধ্য হব, অবৈধ হবে না। অবৈধ হবে ব'লে মনে করলে, সে মনে করবার মধ্যে এমন এক দুর্বল অসুস্থ মনোবৃত্তির পরিচয় দেওয়া হয়, যা প্রত্যেক নীতিবোধসম্পন্ন ভদ্রব্যক্তির পক্ষে লজ্জার কারণ হওয়া উচিত। শরৎ-প্রভাতের শিশির-ভেজা গাছের প্রথম স্থলপদ্মের প্রতি পথিকের বারংবার দৃষ্টিপাত যদি দোষের না হয়, সুন্দরী তরুণীর সুঠাম দেহবল্লরীর মুখপদ্মের প্রতি বিমুগ্ধ দৃষ্টিপাতই বা দোষের হবে কেন? দোষ যদি একান্তই কারো হয় ত একমাত্র সেই বিধাতারই হবে, যিনি মানুষের চক্ষে ভাল বস্তুকে ভাল লাগবার শক্তি মুক্তহস্তে দান করেছেন।

এই প্রসঙ্গ নিয়ে কয়েকবারই আমার সুন্দরী তরুণীদের সহিত রীতিমত বচসা হয়েছে এবং প্রতিবারই আমি উপরি-উক্ত যুক্তির সাহায্যে তাঁদের পরাস্ত করেছি। যখনকার কথা বলছি সে সময়ে আমাকেও তরুণ বলা চলত। অবশ্য বচসা যা-কিছু ঘটেছিল বাস্তব-জীবনে তার একটিও ঘটে নি; প্রত্যেকটি ঘটেছিল আমার অন্তরলোকে। কিন্তু অন্তরলোক ব'লে উপেক্ষা করবার কোনও হেতু নেই। সে-লোকে যা-কিছু বিচার অথবা সিদ্ধান্ত হয়, সবই ন্যায় এবং যুক্তির সাহায্যে হয়; সুতরাং সে-লোকের জয়-পরাজয়ের ভিত্তিও খুব দৃঢ়।

বচসা অন্তরলোকে ব'লেও তার সূত্রপাত কিন্তু প্রতিবারই হ'ত বহির্জীবনে। পথ চলতে চলতে হয়ত কোনো মৃগনয়নার সহিত বারকয়েক দৃষ্টিবিনিময় ঘ'টে গেল, অমনি তিনি আমার অন্তরলোকে প্রবেশ ক'রে ভ্রূভঙ্গসহকারে আমাকে তিরস্কার করলেন, "ভারি অসভ্য মানুষ ত আপনি!"

উত্তর দিলাম, "প্রমাণ না পেলে স্বীকার করব না।"

"বার বার আমার দিকে তাকাচ্ছিলেন কেন?"

বললাম, "কারণ আছে।"

"কি কারণ, বলতে হবে।"

জিজ্ঞাসা করলাম, "বাড়িতে আয়না আছে?"

"আছে।"

"বাড়ি ফিরে গিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়াবেন, আয়নার মধ্যে কারণ খুঁজে পাবেন। ঝগড়া যদি একান্তই করতে হয়, আমার সঙ্গে না ক'রে সেই বিধাতাপুরুষের সঙ্গে করবেন, যিনি আপনাকে এমন ক'রে সৃষ্টি করেন নি, যাতে একবার আপনার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে দ্বিতীয়বার করতে প্রবৃত্তি হয় না।"

প্রতিবারই এই, অথবা এইরূপ যুক্তি দেখানোর পর তরুণীরা নিরুত্তরে আমার অন্তরলোক পরিত্যাগ করেছিলেন, যুক্তির দ্বারা কতকটা খুশি হ'য়েই বোধ হয়।

এই প্রসঙ্গে আমার বক্তব্যের সমর্থনে দুটি সাক্ষী তলব করবার অভিপ্রায় করেছি। দুজনেই আমাদের দেশের দুই মহাকবি। একজন আধুনিক কালের, অপরে প্রাচীন যুগের। বলা বাহুল্য, একজন রবীন্দ্রনাথ এবং অপর জন কালিদাস।

যদি আমার ধারণা ভুল হয়, তা হ'লে নিশ্চয়ই ক্ষমাপ্রার্থী হব; কিন্তু আমার বেশ মনে পড়ছে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর কোনো পুস্তকে, সম্ভবত 'ইয়োরোপ-যাত্রীর ডায়ারি'তে লিখেছিলেন, 'আমার অভিভাবকগণ যাই মনে করুন না কেন, সুন্দর মুখ আমার ভাল লাগে, সে কথা স্বীকার করবই।' যদি আমার ভুলই হ'য়ে থাকে, অর্থাৎ এমন ধরনের কথা তিনি না-ই লিখে থাকেন, তা হ'লেও আমার সবিনয় নিবেদন হবে, এ সত্য এমন ক'রে প্রকাশ করবার শক্তি ও সৎসাহসের অভাব রবীন্দ্রনাথের মধ্যে ছিল না।

আমার দ্বিতীয় সাক্ষী কবি কালিদাস, সুন্দর মুখ দেখে শুধু খুশি হ'য়েই নিরস্ত হন নি, তদুপলক্ষে কাব্য-রচনাও করেছিলেন। একদিন অপরাহ্ণ সময়ে উজ্জয়িনীর পথ দিয়ে তিনি রাজসভায় যোগদান করবার অভিপ্রায়ে চলেছেন, এমন সময়ে সামনা-সামনি দেখা হ'য়ে গেল এক নীলনয়না কিশোরীর সঙ্গে।

চমকে উঠে থমকে দাঁড়িয়ে কবি বললেন, "এ কি আশ্চর্য ব্যাপার!"

ততোধিক চমকিত হ'য়ে মেয়েটি জিজ্ঞাসা করলে, "কি?"

কালিদাস বললেন,

"কুসুমে কুসুমোৎপত্তি শ্রূয়তে ন চ দৃশ্যতে,
বালে, তব মুখাম্বুজে কথং ইন্দিবরদ্বয়ং ?"

[কুসুম 'পরে কুসুম ফোটা সম্ভব ত নয়,
তোমার মুখপদ্মে কেন ইন্দিবরদ্বয় ?]

ফুলের ওপর ফুল ফোটে, এমন কথা শোনাও যায় না, দেখাও যায় না। কিন্তু বালিকে, তোমার রক্তবর্ণ মুখপদ্মের ওপর দুটি নেত্র-নীলপদ্ম ফুটল কি ক'রে ?

এই অপরিমেয় কাব্যপ্রশস্তির প্রসাদে হর্ষে ও লজ্জায় মেয়েটি পাশ কাটিয়ে পালাবার উপক্রম করছিল, এমন সময়ে কবি কালিদাস বললেন,

"দৃষ্টিং দেহি পুনর্বালে, হরিণায়তলোচনে,
শ্রূয়তে হি পুরা লোকে বিষস্য বিষমৌষধম্।"

[পুন ফিরে চাও বালা, অয়ি মৃগলোচনে,
গরলই সক্ষম শুধু গরলের মোচনে।]

হে হরিণনয়না বালিকা, একবার ফিরে চাও। দৃষ্টিদান ক'রে তুমি আমাকে বিষে জর্জর করেছ, আর একবার দৃষ্টিদান করলে বেঁচে উঠতেও পারি, কারণ, শোনা যায় বিষই বিষের ঔষধ।

এই কাতর প্রার্থনায় সদয় হ'য়ে হরিণনয়না পুনরায় দৃষ্টি দান করেছিলেন কি-না, বর্তমান ক্ষেত্রে সে প্রশ্ন অবান্তর। যে পরিমাণ সাক্ষী-সাবুদ আমি উপস্থাপিত করলাম, তাতে আমার মামলায় আমি ডিক্রি পেতে পারি ব'লে মনে করি।

অপর পক্ষ অবশ্য বলতে পারেন, অনেক সাধু-সন্ন্যাসী স্ত্রীলোকের মুখে দৃষ্টিপাত করেন না; একান্ত প্রয়োজন হ'লে করেন পায়ে। আমার মনে হয়, এরূপ আচরণের মধ্যে সবলতার পরিচয় পাওয়া

যায় না। পৌরাণিক যুগের ইতিহাস পর্যালোচনার ফলে সাধু-সন্ন্যাসীরা অবগত আছেন যে, তৎকালীন বিরাট মুনি-ঋষিগণের পক্ষেও স্ত্রীলোকের মুখ নিরাপদ বস্তু ছিল না। সুন্দরী রমণীর মুখ চোখে পড়া, আর সঙ্গে সঙ্গে যোগভঙ্গ ও পতন। মহর্ষি বিশ্বামিত্র প্রমুখ বড় বড় ঋষিগণ এ বিষয়ে এমন দৃষ্টান্ত স্থাপিত করেছেন যে, একটা কথাই দাঁড়িয়ে গেছে—মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ। সেই পরবর্তী কালের সতর্ক সাধু-সন্ন্যাসীগণ রমণীর মুখপদ্ম নিরীক্ষণ করেন না; একান্ত প্রয়োজন হ'লে মুখপদ্ম থেকে দূরতম স্থান পাদপদ্মে দৃষ্টিপাত করেন। আমরা সাংসারিক প্রাণী, আমাদের যোগও নেই, যোগভঙ্গের উদ্বেগও নেই। রাণীর মুখপদ্ম দেখে যদিই বা আমরা ঘায়েল হই, তথাপি লেখাপড়া-আপিস-আদালতের সঙ্গে যোগরক্ষা ক'রেও চলি। সুতরাং সাধু-সন্ন্যাসীগণের নজির আমাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।

দেখতে দেখতে আমার দিন কুড়ি-বাইশের স্বল্পায়ু মেস-জীবন শেষ হ'য়ে এল। তর্পণ করতাম, সেইজন্য সঙ্গে পাঁজি ছিল। দুই-এক দিন এদিক-ওদিক দেখে একটা দিন পাওয়া গেল, যেদিন তিথি নক্ষত্র যোগিনী প্রভৃতি সকলেই একযোগে বলছে, সাবধান! বেরিয়েছ, কি মরেছ! তখন আমাদের সত্যসন্ধিৎসু মন সকল প্রকার মিথ্যা সংস্কারের পাশ ছিন্ন ক'রে মুক্ত হবার জন্য ব্যগ্র। ঠিক করলাম, ঐ দিনেই যাত্রা আরম্ভ ক'রে জ্যোতিষ শাস্ত্রের একটা শাখার সত্যাসত্যের বিষয়ে পরীক্ষা নিতে হবে; তাতে জীবনান্ত হয়, সেও ভাল।

যথাদিনে ঠাকুর-চাকরকে বকশিশ দিয়ে খুশি ক'রে, যে-সকল বন্ধু-বান্ধব তখনও বাড়ি যান নি তাঁদের কাছে বিদায় নিয়ে অপরাহ্নকালে সুরেনদাদা, গিরীন ও আমি—আমরা তিন ভাই, একখানা ঘোড়ার গাড়ি ক'রে হাওড়া স্টেশনের অভিমুখে রওনা হলাম।

যে-রকম উৎকট অশুভ দিন, হাওড়া স্টেশন ত বহু দূরের কথা, হ্যারিসন রোড কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে পৌঁছেই ঘোড়ার উচিত ছিল মুখ থুবড়ে প'ড়ে গাড়ি উল্টে দিয়ে আমাদের আহত ক'রে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে আশ্রয় নিতে বাধ্য করা। তৎপরিবর্তে দেবী যোগিনী আমাদের সম্মুখে অবস্থান ক'রে পথ দেখিয়ে চললেন, এবং অশুভ তিথি ও প্রতিকূল নক্ষত্র আমাদের যাত্রা যাতে নির্বিঘ্ন ও রাত্রি যাতে সুপ্তিময়ী হয় তদ্বিষয়ে আত্মনিয়োগ করলেন।

কাজে কাজেই পরদিন সকালে আমরা তিনজনে সুস্থ শরীরে বহাল তবিয়তে ভাগলপুরে পৌঁছে গৃহে উপনীত হলাম।

আত্মীয়স্বজনের পরিপূর্ণ সমাবেশে গৃহ তখন আনন্দে উচ্ছলিত হচ্ছে।

বছর দেড়েক পরের কথা।

তখন 'বসন্ত জাগ্রত দ্বারে'। লোকের মুখে মুখে শুনলাম, আমার জীবনেও নাকি বসন্ত জাগ্রত হবার উপক্রম করেছে। কেউ তার পাপিয়ার তান শুনতে পাচ্ছে, কেউ অশোকগুচ্ছের লাল পতাকার সঞ্চালন দেখছে, কেউ বা মলয় হিল্লোলের শীতল স্পর্শ অনুভব করছে। আমি অনুভব করতে লাগলাম বসন্তকালের সেই ক্রমবর্ধমান উষ্ণতা, যা ধীরে ধীরে নিদাঘের প্রদাহের মধ্যে নিয়ে গিয়ে ঘাম ঝরাতে থাকে। জীবন চলছিল এ পর্যন্ত বেশ একটা সহজ যতির ছন্দে, হঠাৎ তার মধ্যে এ কি যতিভঙ্গের উৎপাত! চিরদিনের চার-চার-তিন-তিনের দুলকি চাল থেকে তিন-দুই-চার-পাঁচের কদম চালে প'ড়ে হোঁচট খেতে খেতে মারা যেতে হবে দেখছি। না, ও-কার্য কিছুতেই করা হবে না। বিবাহ এখন মাথায় থাক্।

বেঁকে বসলাম। কিন্তু সে বাঁকা সরল রেখার এত কাছ-বরাবর চলতে লাগল যে, প্রতিপক্ষ বোধ হয় সেটাকে 'মুখের লজ্জা' বিবেচনা ক'রে তার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করলেন না। কালো মেঘের ধারে ধারে যেমন সূর্যকিরণের রূপালী আভা প্রকাশ পায়, আমার 'না'-এর পাশে-পাশে তেমনি তাঁরা 'বহুৎ আচ্ছা'র সোনালী প্রভা দেখতে লাগলেন।

বউদিদি বললেন, "তোমার বিয়ের ফুল ফুটেছে উপীন।"

বললাম, "ভারি আশ্চর্য ফুল ত বউদি, যা গাছ জন্মাবার আগেই ফোটে।"

বউদিদি বললেন, "হ্যাঁ, এ আশ্চর্য ফুল গাছে ফোটে না, অদৃষ্টে ফোটে।"

আজকাল মেয়েদেরও বিয়ের ফুল ফোটে না;—অর্থাৎ ফুটেও অনেক সময়ে বিয়ে হয় না—আবার না ফুটলেও অনেক সময় হয়। আমাদের সময় কিন্তু ছেলেদেরও বিয়ের ফুল ফুটত। তখনকার দিনের ছেলেরা আজকালকার মেয়েদের চেয়েও অনেক বেশি মেয়েলি ছিল। তারা প্রথমে কন্যাপক্ষের কাছে যোগ্যতার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'ত, তারপর মুখ বুজে অভিভাবকদের পছন্দ-করা পাত্রীকে বিয়ে করত। তাই বিয়ের রাত্রে তাদের দেখে বাসর-ঘরের মেয়েরা বলত, বর, না, চোর!

আজকাল মেয়ে দেখতে এসে পাত্রপক্ষ যদি মেয়েকে প্রশ্ন করে, আমরা তাদের বর্বর ব'লে মনে করি। আমাদের কালে কিন্তু অনেক সময়ে পাত্রীপক্ষ পাত্র দেখতে এসে পাত্রকে প্রশ্নবাণে ক্ষতবিক্ষত করত। পরীক্ষার ফলাফলের উদ্বেগে শুধু পাত্রেরই নয়, পাত্রের অভিভাবকদেরও, হৃৎকম্প হ'তে থাকত। কোনো রকমে উৎরোতে পারলে হয়। বলতে লজ্জা এবং কৌতুক দুই-ই অনুভব করছি, একবার আমিও ঐরূপ পরীক্ষার মধ্যে পড়বার উপক্রম করেছিলাম। তখন আমাকে অনূঢ় অবস্থা থেকে উদ্ধার করবার জন্য ঘরে-বাইরে উৎসাহশীল ব্যক্তিদের প্রচেষ্টা চলেছে। সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক বন্ধুবর শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় একদিন আমাকে বললেন, "শুনছি, তোমাকে নাকি রায়বাহাদুর অমুক দেখতে আসবে?"

বললাম, "সেই রকম ত আমিও শুনছি।"

"সাবধান! ও-ভদ্রলোকের বড্ড কোয়েস্চন জিজ্ঞাসা করবার অভ্যাস আছে। বাড়ি গিয়ে নামতা মুখস্থ করতে আরম্ভ ক'রে দাও।"

শুনে আমি ত নিরপরাধ সৌরেনের উপরই খাপ্পা হ'য়ে উঠলাম, "চালাকি নাকি! কোয়েস্চন করবে কি রকম?"

হাসতে হাসতে সৌরেন বললে, "ভারি কোয়েস্চন করা রোগ ঐ ভদ্রলোকের।"

বাড়ি এসেই আমার ভগ্নীপতি শরৎদাদার সঙ্গে বোঝাপড়া করলাম। তিনিই এ বিবাহ-প্রস্তাবে আমাদের দিকে প্রধান উৎসাহী। সৌরেনের কাছে যা শুনেছিলাম ব্যক্ত ক'রে উত্তপ্ত কণ্ঠে বললাম, "বাড়ি ব'সে অবশ্য কথার দ্বারা অভদ্রতা প্রকাশ করব না; কিন্তু পরীক্ষার মতো কোনো কিছুর সূত্রপাত দেখলেই বিনা বাক্যব্যয়ে স্থানত্যাগ করব। পরীক্ষা দিয়ে বি. এ. পাস করা যায়, বিয়ে করা চলে না।"

তখনকার যুগে আমাদের আত্মমর্যাদার চেতনা ইংরেজ গভর্মেণ্টকে অবলম্বন ক'রে সব দিকে সবলে জাগ্রত হ'তে আরম্ভ করেছে। সুতরাং এ হেন অপমান কিছুতেই সহ্য করা হবে না।

দিন দুই পরে আমার ডাক পড়ল আমাদের বৈঠকখানায়। উপস্থিত হ'য়ে দেখি, একটা কোন বিষয়ে নিয়ে রায়বাহাদুর দাদার সহিত উৎসাহ ভরে আলোচনা করছেন।

আমি প্রবেশ করতেই আলোচনা পরিত্যাগ ক'রে আমার প্রতি মনোযোগী হলেন।

যুক্তকরে ঈষৎ নতমস্তকে নমস্কার জানিয়ে একটা চেয়ারে উপবেশন করলাম।

ক্ষণকাল তীক্ষ্ণ নেত্রে আপাদমস্তক আমাকে পর্যবেক্ষণ ক'রে রায়বাহাদুর বললেন, "নাম কি তোমার?"

বললাম, "উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।"

"নামের আগে শ্রী দাও না?"

বললাম, "নিজের নামে দিই নে, অপরের নামে দিই।"

"প্রেসিডেন্সি কলেজে পড় ?"

বাহুল্য প্রশ্ন। জানেন প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ি, তবু যাই হোক, সাধারণ আলাপ-আলোচনার মামুলি প্রশ্ন, আপত্তি করবার কারণ নেই। বললাম, "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"কে কে প্রোফেসার ?"

কয়েকজন অধ্যাপকের নাম করলাম।

"সন্ধ্যা-আহ্নিক কর ?"

"না।"

"গায়ত্রী মনে আছে ?"

"আছে।"

"সূর্যের অষ্টনাম কি, বলতে পার ?"

বুঝতে পারছি, প্রশ্নগুলি ক্রমশ সাধারণ আলাপ-আলোচনার গণ্ডি অতিক্রম ক'রে আপত্তিকর এলাকার দিকে অগ্রসর হচ্ছে, তথাপি এ প্রশ্নটাও সাধারণ আলাপের প্রশ্ন মনে ক'রে বললাম, "না, বলতে পারি নে।"

ভদ্রলোক এবার একটু বিরাম গ্রহণ করলেন—বোধ হয় উপক্রমণিকা-ভাগ শেষ ক'রে মূল প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হবার চেষ্টায়। এক মুহূর্ত মনে মনে কি ভেবে নিয়ে আমার দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে বললেন, "আচ্ছা What is the goal of human life—এ বিষয়ে তোমার মন্তব্য ইংরিজীতে দু-চার মিনিট বল দেখি।"

প্রশ্ন শুনে এবং আমার মুখে বিদ্রোহের রক্ত-পতাকা দর্শন ক'রে শরৎদাদার বুঝতে বাকি ছিল না, সঙ্কটের কাল উপস্থিত হয়েছে। বিস্ফোরণের পূর্বেই তাড়াতাড়ি তিনি বললেন, "ও-সব কথা অনুগ্রহ

ক'রে জিজ্ঞাসা করবেন না। ও বলেছে, বিয়ে করবার জন্য পরীক্ষা দেবে না। পরীক্ষা যা দেবার ইউনিভার্সিটিতেই দেবে।"

এ রকম সবল প্রতিবাদ ভদ্রলোকের অভিজ্ঞতায় বোধ করি এই প্রথম। অভিমানের গাঢ় ছায়া মুখমণ্ডলে ঘনিয়ে এল। ঈষৎ ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন, "না, না, পরীক্ষার উদ্দেশ্যে আমি ও-কথা জিজ্ঞাসা করি নি। এ বিষয়ে তোমার অভিমত কি, তাই জানতেই চাইছিলাম। ইউনিভার্সিটি যাদের ছাপ মেরে দিচ্ছে, তাদের পরীক্ষা করার কোনও মানে হয় না।"

দু-চার মিনিট গল্প ক'রে শীঘ্রই আর একদিন আসবার কথা জানিয়ে ভদ্রলোক বিদায় গ্রহণ করলেন।

যোগেন্দ্রনাথ দত্ত নামে হাইকোর্টের এক উকিল সে সময়ে ঘরে উপস্থিত ছিলেন। তিনি ছিলেন দাদার জুনিয়ার এবং সেই সূত্রে প্রতিদিনই আমাদের বাড়িতে তাঁর যাতায়াত ছিল। রায়বাহাদুর প্রস্থান করবামাত্র তিনি আমার প্রতি কঠিন দৃষ্টিপাত ক'রে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠলেন।

"বে বে-এশ্‌ করেছ! যদি উত্তর দিতে তোমাকে ফু-ফু-উল্‌ বলতাম।"

স্মিতমুখে দাদা বললেন, "ভদ্রলোক কৈফিয়ৎ দিলেন, কিন্তু ইংরিজীতে কেন জানতে চেয়েছিলেন, সেই আসল কথারই কৈফিয়ৎ দিলেন না।"

খুশি হ'য়ে আমি কক্ষ পরিত্যাগ করলাম।

যে ঘটনার কথা বললাম, সামাজিক রীতিনীতির পরিবর্তনের দিক দিয়ে খুব বেশি দিনের কথা নয়; কিন্তু এই অল্প দিনের মধ্যে এমন পরিবর্তন ঘটেছে যে, রায়বাহাদুর ত দূরের কথা, কোনো রাজাবাহাদুরও

বোধ হয় আজকাল একজন মেয়েকেও এমন প্রশ্ন করতে সাহস পান না।

এ ঘটনার কিছুকাল পরে ঘটকরূপে আমার জীবনে আবির্ভূত হলেন বন্ধুবর স্বয়ং সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়। পাত্রীটি কলিকাতা ঝামাপুকুরের মেয়ে। "বন্ধু ঘটকের প্রতি" নাম দিয়ে কবিতা রচিত ক'রে ছন্দোবদ্ধ প্রতিবাদ করলাম। প্রতিবাদের আন্তরিকতার বিষয়ে আমার নিজেরই খুব বিশ্বাস ছিল না; কিন্তু প্রতিবাদ একটা না করলেও শোভন হয় না, নিজেকেই নিতান্তই সুলভ এবং লঘু প্রতিপন্ন করা হয়। যতদূর মনে পড়ে, কবিতাটি চতুর্দশপদী সনেট জাতীয় ছিল। তার মাঝখানের গোটা চারেক লাইন মনে পড়ছে,—

আপন কৌতুক ল'য়ে আপনার মনে
হা রে রে অবোধ, তুমি করিতেছ খেলা!
এ ধারে যে মোর চারু নিকুঞ্জ-কাননে
ধড়াধ্বড় পড়িতেছে বড় বড় ঢেলা।

প্রকৃতপক্ষে নিকুঞ্জ-কাননে খুব বড় বড় ঢেলা যে পড়ে নি, সে বিষয়ে আমার সাক্ষ্য গ্রহণ করা যেতে পারে; ও-কথার পনের আনাই বোধ হয় বিনয়।

প্রতিবাদের শেষ দুই ছত্রও মনে আছে,—

এই যে ভবানীপুর, অতি চমৎকার!
ঝামাপুকুরের দিকে যেয়ো নাকো আর।

কিন্তু এই দুটি লাইন দিয়ে সনেট যখন শেষ করছিলাম, তখন মাথার উপরে বিধাতা-পুরুষ হাসছিলেন। 'যেয়ো নাকো আর' বললেই যদি হ'ত!

সৌরেনের ঘটকালি সফল হ'ল না; প্রতিবন্ধক হ'ল মর্ত্যধামের কেউ নয়, আকাশের গ্রহ-নক্ষত্র।

কয়েক মাস পরে কিন্তু পাত্রীপক্ষের গৃহ থেকে পাকা দেখা সেরে এসে সুরেনদাদা আমাকে বললেন, "ওরে, কোন্ বাড়িতে তোর বিয়ে হচ্ছে জানিস?"

বললাম, "কোন্ বাড়িতে?"

"ঝামাপুকুরের মেসে থাকতে তুই যে বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে গান শুনতিস, সেই বাড়িতে। আর, কার সঙ্গে হচ্ছে জানিস?"

"কার সঙ্গে?"

"মেসের বারান্দা থেকে যে-দুটি স্কুলের মেয়েকে দেখতিস, তাদের বড়টির সঙ্গে।"

আশ্চর্য! এমন যোগাযোগ? যে গাছ, তারই ফুল! লোকে যে বলে মৎস্যযোগ শুভযোগ, সে কথা তা হ'লে নিতান্ত মিথ্যা নয়!

মেসে থাকতে মৎস্যের মহিমা একটুও বোঝা যায় নি।

কয়েক দিন পরে ঝামাপুকুর লেনের সেই গানের আসরে গিয়ে যখন আসন গ্রহণ করলাম, তখন সত্যই মনে হ'ল, Truth is সময়ে সময়ে stranger than fiction!

যে অঘটনঘটনকুশল দৈব পথের জনতা থেকে আমাকে কুড়িয়ে নিয়ে ঝামাপুকুর লেনের সেই বহু আকাঙ্ক্ষিত সঙ্গীত-আসরের পীঠস্থানেই এক রূপান্তরিত আসরে সর্বপ্রধান ভূমিকায় স্থাপিত করেছিল, সেই অভিন্ন দৈবই সেদিনের তারিখটিও বেঁধে দিয়েছিল অষ্টমাক্ষর যতির সহজ পয়ার ছন্দে। সাধারণ-লোকরঞ্জনের অনভিপ্রেত কোনো এক প্রাচীন কবিতা থেকে দুটি পদ উদ্ধৃত করলে সে কথা প্রতীয়মান হবে,—

চিরদিন সেই দিন রহিবে স্মরণ,
তেরশ' এগার সাল তেইশে শ্রাবণ।

'স্মৃতিকথা'য় ব্যবহৃত তারিখগুলির নির্ভুলতা সম্বন্ধে আমি সব সময়ে সুনিশ্চিত প্রতিশ্রুতি দিতে পারি নে—এমন ধরনের কথা 'স্মৃতিকথা'র ভূমিকা-অংশে বলেছি। ছন্দ ও মিলের কঠিন সূত্রে গ্রথিত তেরশ' সালের এই তেইশে শ্রাবণ তারিখটি আমি কিন্তু অসংশয়িতচিত্তে ঐতিহাসিককে উপহার দিতে পারি। কিন্তু এক নগণ্য ব্যক্তির তুচ্ছ জীবনের সামান্য একটা তারিখের উপহার ইতিহাসের কোন্ কাজেই বা লাগবে? তবে নাকি ঐতিহাসিকেরা তারিখ নিয়ে ভেল্কী খেলতেও পারেন। সামান্য ঘটনার তারিখও তাঁরা সময়ে সময়ে অসামান্য ঘটনার প্রমাণ অথবা অপ্রমাণের কাজে ব্যবহার ক'রে থাকেন। মিথ্যার অতি-স্ফীত রঙচঙে বেলুনকে সত্যের একটা কঠিন আলপিন দিয়ে চুপ্‌সে দিতেও সময়ে সময়ে তাঁদের দেখা যায়।

যে সময়ে আমরা কৌমার অবস্থার বেড়া ডিঙিয়ে জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রবেশ করেছিলাম, রোম্যান্টিক যুগ তখনো সম্পূর্ণভাবে বিদায় গ্রহণ করে নি; তখনো সে-বেচারা দূরে দাঁড়িয়ে পিছন ফিরে যাই-যাই

করছিল। একটা অতি-অবাস্তব বাস্তবপ্রিয়তা দৈত্যের ন্যায় আবির্ভূত হ'য়ে তখনো তাকে গলায় হাত দিতে দেশান্তরিত করতে সক্ষম হয় নি। চন্দ্রকিরণ এবং মলয়-সমীরণকে কাব্যজগতে অপাংক্তেয় ক'রে দিয়ে চিমনির ধোঁয়া এবং কাঁকড়ার খোলার মহিমা প্রতিষ্ঠিত হ'তে তখনো কিছু বিলম্ব ছিল।

বিবাহ-ক্ষেত্রেও তখন কতকটা একই ধরনের অবস্থা। বিবাহের দিনে বরেরা ব্যাণ্ড বাজিয়ে, বাজি পুড়িয়ে, চতুর্দোলায় চ'ড়ে বিয়ে করতে যায়। তাদের অঙ্গের চুমকি-জরি শিল্পকার্যখচিত রক্তবর্ণ মখমলের কাটা পোশাক ও নকল মুক্তার মালাশোভিত মাথায় উষ্ণীষ দেখে মনেই হয় না, তারা বাংলা দেশের বাঙালী বর, যাদের স্কুল-কলেজ অথবা অফিস-আদালতের সহিত কোন প্রকার সংস্রব থাকা সম্ভব। মনে হয়, সুদূর পাঞ্জাব অথবা রাজপুতনার কোন যুবরাজ বাংলা দেশের কন্যাকে বিবাহ করবার অভিপ্রায়ে শোভাযাত্রা সহকারে কন্যা-গৃহাভিমুখে চলেছে। চতুর্দোলার উপর বরের দুই পার্শ্বে দুই নর্তকীবেশসজ্জিত বালক লীলায়িতভাবে চামর ঢোলাচ্ছে; আর, পিছন দিক হ'তে যতটা সম্ভব আত্মগোপন ক'রে ঐরূপ অপর এক বালিকা-বালক ধীরে ধীরে ব্যজন করছে, যাতে-না যুবরাজের বরচন্দনের তিলকাঙ্কন ঘর্মাক্ত হ'য়ে নষ্ট হ'য়ে যায়। কখনো-সখনো বরের দক্ষিণ হস্তে তরবারিও দেখা যেত। তবে কোষের মধ্যে সব সময়ে যে তরবারি থাকত, সে কথা হলফ নিয়ে বলা যায় না।

আমাদের যুগ ছিল জীবনের সর্বক্ষেত্রে পরিবর্তন সাধনের যুগ। আড়ম্বর ও অবাস্তবের ভার থেকে মুক্ত হ'য়ে জীবনকে সহজ ও সরল ক'রে নিয়ে সুন্দর করা ছিল আমাদের অন্যতম আদর্শ। সুতরাং, চুমকি-জরিশোভিত লাল মখমলের কাটা পোশাকের দ্বারা দেহকে লাঞ্ছিত করবার

আমি যে ঘোরতর বিরোধী ছিলাম, সে কথা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে। তাই তার সুদূরতম সম্ভাবনার লক্ষণ দেখা মাত্র বিদ্রোহের লাল পতাকা ওড়ালাম। কাটা পোশাক প'রে যাত্রার দলের নকল রাজকুমার সেজে জীবনের একটা গুরুতর ভূমিকায় অবতীর্ণ হব না, সে কথার মধ্যে সংশয়ের কোনো অবকাশ ছিল না। একটা প্রবল অসহযোগ পদ্ধতি অবলম্বনের ভয় দেখিয়ে কাটা পোশাক থেকে আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হলাম, তার খাতিরেই খানিকটা আত্মসমর্পণ করতেও বাধ্য হলাম। সন্ধি মাত্রেরই ভিত্তি হচ্ছে 'নাও এবং দাও' নীতি। সুতরাং আমাকেও দিতে হ'ল শোভাযাত্রায় সম্মতি। তবে শোভাযাত্রাতেও একটা রফার মতো হ'ল; বাদ পড়ল চতুর্দোলা, তৎপরিবর্তে স্বীকার পেতে হ'ল জুড়ি গাড়িতে। তবে মাছের অভাবে মাছের ঝোলের যেমন অর্থ হয় না, তেমনি কাটা পোশাকের অভাবে চতুর্দোলারও বিশেষ কোনো অর্থ ছিল না। চতুর্দোলা বাদ দেওয়ানোতে আমাকে বিশেষ কিছু বেগ পেতে হয় নি।

সুদীর্ঘ ছেচল্লিশ বৎসর অতীতের কথা। বৃহদকার দুই ওয়েলার-ঘোড়াবাহিত প্রকাণ্ড এক ল্যাণ্ডো গাড়ির উপর মিতবর সহ সমাসীন হ'য়ে ব্যাণ্ড ও ব্যাগপাইপ বাজিয়ে, দক্ষিণে ও বামে দুই পার্শ্বে ও সম্মুখের তোরণে অ্যাসেটিলিন গ্যাসের শত শত উজ্জ্বল আলোক জ্বালিয়ে, পশ্চাতে এক সার ফিটন্ গাড়িতে আরূঢ় আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পাত্র মিত্রের দ্বারা অনুসৃত হ'য়ে ভবানীপুর থেকে রওনা হওয়া গেল মাইল চারেক দূরবর্তী ঝামাপুকুরের পথে। গতিলাভোৎসুক কিন্তু আকৃষ্টবল্গা অশ্বদ্বয়ের অধীরোদ্ধত পদক্ষেপের শব্দে রাজপথ মুহুর্মুহু চকিত হ'য়ে উঠছে। ফুট-পাথে ফুটপাথে সমুৎসুক দর্শকের ভিড়; পথপার্শ্বস্থ সৌধবাতায়নসমূহে পুরসুন্দরীদের জনতা। তাঁদের মধ্যে কোনো রমণী, অজ ও ইন্দুমতীর

বিবাহের পর শোভাযাত্রা কালের ন্যায়, তাঁর প্রসাধিকার হাত থেকে অর্ধেক অলক্তকরঞ্জিত পদ টেনে নিয়ে 'উৎসৃষ্টলীলাগতি' হ'য়ে গবাক্ষ পর্যন্ত সমস্ত পথ কাঁচা আলতার দ্বারা রঞ্জিত করতে করতে ছুটে এসেছিলেন কি-না বলতে পারি নে; কিন্তু অনেকেই যে 'ত্যক্তান্যকার্যা' হ'য়ে সব কিছু পিছনে ফেলে রেখে বাতায়নদেশে উপস্থিত হয়েছিলেন, সে কথা নিঃসংশয়ে বলা চলে।

সেদিন ঐরূপ বিচিত্র ও অনভ্যস্থ অবস্থার কেন্দ্রস্থলে নিজেকে স্থাপিত দেখে মনের গতি কিরূপ হয়েছিল, তা ঠিক স্মরণ হয় না; আজকাল কিন্তু সেদিনকার উদ্ভট অভিযানের কথা চিন্তা ক'রে মনের মধ্যে শুধু লজ্জাই বোধ করি নে, বেশ একটু সপুলক কৌতুকরসও অনুভব করি। তবে এ কথাও সত্য যে, আজকের দিনে যে কথা মনে ক'রে হাস্য সংবরণ করা কঠিন হয়, ছেচল্লিশ বৎসর পূর্বের পরিবেশ ও আবহাওয়ার মধ্যে তাই হয়ত শরীরে আনন্দের রোমাঞ্চ সৃষ্টি করত। দশ ভরি স্বর্ণের যে চন্দ্রহার আজ নারীগণের নিকট কুরুচির পরিচায়ক ব'লে নিন্দিত, ষাট বৎসর পূর্বে সেই চন্দ্রহারই হয়ত তাঁদের নিকট গর্ব এবং ঈর্ষার সামগ্রী ব'লে পরিগণিত হ'ত।

ঘণ্টা দেড়েক পরে অভিযান শেষ হ'ল। গাড়ি এসে দাঁড়াল সঙ্গীত-স্মৃতিবিজড়িত পূর্বপরিচিত বাড়ির দ্বারদেশে।

চতুর্দোলার দিন গত হয়েছে; জুড়ি চৌঘুড়িও আজকাল আর দেখা যায় না। এখন বর আসে মোটর গাড়ি চ'ড়ে। স্থলযানের মধ্যে মোটরকার আধুনিকতম হ'লেও মধ্যযুগের সংস্কার ও প্রভাব থেকে সে নিজেকে মুক্ত করতে পারে নি। বিবাহের রাত্রে পত্র-পুষ্প দিয়ে সে নিজেকে সজ্জিত করে, কখনো বা কঞ্চি-বাখারি-লতাপাতা-পুষ্পের সাহায্যে নিজের দেহকে রূপান্তরিত ক'রে ময়ূরপঙ্খি অথবা রাজহংসের আকারে

তার সর্বাঙ্গ বেষ্টিত ক'রে বৈদ্যুতিক আলোর মালা জ্বালায়। পঁচিশ-ত্রিশ হাজার টাকার মূল্যবান মোটরকার, তার অন্তরের মধ্যে পরাক্রান্ত দৈত্যের মতো শক্তিশালী এঞ্জিন, প্রতি ঘণ্টায় সে অবলীলাক্রমে সত্তর-পঁচাত্তর মাইল দৌড় দিতে সক্ষম। কিন্তু তবু যেন তার মধ্যে সেই প্রাণবত্তা, সেই মহিমা নেই, যা থাকত চার-পাঁচ হাজার টাকা মূল্যের জুড়ি গাড়ির মধ্যে। কন্যাগৃহের দ্বারদেশে এসে জুড়ি গাড়ি দাঁড়াত; অশ্বযুগলের রাশ টেনে ধ'রে তকমা-উর্দি-পাগড়ির দ্বারা সুসজ্জিত কোচম্যান পিছন দিকে হেলে পড়ত; তথাপি বেগবান তেজিস্বী অশ্বদ্বয়ের অস্থিরতার দাপটে গাড়ি আগুপাছু ঈষৎ হেলতে-দুলতে থাকত; তারই মধ্যে সন্তর্পণে বরকে নামিয়ে নিতে হ'ত।

আজকাল কন্যাগৃহের সম্মুখে মূল্যবান মোটরকার এসে দাঁড়ায়। চাবি টিপে এঞ্জিন বন্ধ ক'রে দিয়ে শোফার তাকে একেবারে নিষ্প্রাণ জড়পদার্থে পরিণত করে। তার না থাকে ক্ষুরাঘাতের শব্দ, না পাওয়া যায় তার হ্রেষার ধ্বনি। সেই নিঃশব্দ নিস্তেজ মোটর হ'তে যে বর অবতরণ করে, তারও কতকটা সেই একই অবস্থা। যা-কিছু উত্তেজনার হেতু অথবা আনন্দের কারণ, পূর্বাহ্নেই তা চুকিয়ে দিয়ে আজ বেচারা এসেছে স্কন্ধে জোয়াল ধারণ করতে। আজ থেকে দায়িত্বের গুরুভার শকট টানাই তার প্রধান কর্তব্য হবে। এতদিন বিনা টিকিটে যে আনন্দ উপভোগ ক'রে এসেছে, আজ তার মাশুল চোকাবার পালা। এখন থেকে তার পাওনা বড় বেশি কিছু আর রইল না, দিতে হবে কিন্তু অনেক কিছু। দরজির বিল, শাড়ি-ব্লাউজের মূল্য, সিনেমার টিকিট, সাবান-পাউডার-সেণ্ট-ব্রুমের চাহিদা,—সব কিছুর জন্য এখন থেকে তাকে ঘোরাতে হবে নিজের বাক্সের চাবি।

বিবাহের দিন-দুই পরে ফুলশয্যা নামে একটা অনুষ্ঠান আছে।

আজকাল ফুল আছে, শয্যাও আছে,—কিন্তু ফুলশয্যা নেই। সে বস্তু শেষ হ'য়ে গেছে চতুর্দোলা এবং জুড়ি গাড়ির বরদের আমলে। অদেখাকে দেখবার আনন্দ, অজানাকে জানবার কৌতূহল, অপরিচিতকে পরিচিত করবার উত্তেজনা আজকালকার ফুলশয্যার কক্ষে অপরিজ্ঞাত সামগ্রী।

সেই জন্য এখনও অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তির মতে আত্মীয়-স্বজনের দৌত্যের ফলে যে বিবাহ, সেই বিবাহই উৎকৃষ্টতম বিবাহ। কারণ, সে বিবাহে, ইট চুন এবং সুরকিরূপে, প্রেম পরিচয় দায়িত্বজ্ঞান যুগপৎ ক্রিয়াশীল হবার সুযোগ লাভ ক'রে যে সুদৃঢ় ভিত্তি রচনা করতে সমর্থ হয়, তার উপর নির্মিত হ'তে পারে দাম্পত্য-জীবনের নির্ভরযোগ্য সৌধ। ইউরোপের School of Wisdom-এর প্রেসিডেণ্ট Count Hermann Keyserlingও কতকটা এই ভাবের মত পোষণ করেন। তাঁর লিখিত একটি পুস্তকে তিনি বলেছেন, "Marriages arranged by experienced relatives are usually happier than love marriages"।

তা তিনি যাই বলুন না কেন, স্মৃতিকথা লিখতে ব'সে তত্ত্বকথা আর বেশি বাড়িয়ে কাজ নেই। তেরশ' এগার সাল তেইশে শ্রাবণ তারিখে রচিত একটি কবিতা এখানে প্রকাশ ক'রে বর্তমান অধ্যায়ের শেষ করি। কোনো কবিতার খাতার ছিন্নপত্ররূপে কবিতাটি দীর্ঘকাল একটি বাক্সর মধ্যে আত্মগোপন ক'রে বাস করছিল। মাত্র কয়েকদিন পূর্বে পুরাতন কাগজপত্রের অনুসন্ধানকালে দৈবক্রমে কবিতাটির সন্ধান পাই। কবিতাটি এইরূপ—

অচঞ্চল জীবনের স্বল্প সুখ-দুখ
আজিকে হে দয়াময় হয়েছে বিমুখ
অশান্ত চপল এ কি তরঙ্গ-আঘাতে !

প্রাতঃকাল হ'তে সন্ধ্যা, সন্ধ্যা হ'তে প্রাতে
যে চাঞ্চল্য বহিতেছি হৃদয়ের মাঝে,
উদ্দাম সঙ্গীত যাহা মর্ম মাঝে বাজে,
নহে তাহা প্রতি দিবসের! এ কি ভ্রান্তি!
এ কি তীব্র উৎপীড়ন, এ কি মহাক্লান্তি!
দাও প্রভু, ফিরাইয়া সেই মনোহর
সুখ-দুখ-বিজড়িত দিবস-প্রহর।
সেই শান্ত জীবনের মৃদু স্রোতে ভাসা,
অল্প দুখে কাঁদা, সেই অল্প সুখে হাসা।
এ চাঞ্চল্য জীবনে ত ভাল লাগে নাকো,
এই সুখ দিয়া যদি শান্তি দূরে রাখ!

এ কবিতা সম্বন্ধে আমার এইমাত্র বক্তব্য যে, সেই সুখচঞ্চল দিবসের তীব্র উৎপীড়নের বিরুদ্ধে যে সুতীব্র অস্পৃহা কবিতাটির মধ্যে উচ্ছ্বাসের সহিত ব্যক্ত করা হয়েছে, তার অকপটতা সম্বন্ধে কেউ যদি সন্দেহ করেন, তা হ'লে হয়ত খুব বেশি আপত্তি করা চলবে না। দ্বিতীয়ত, উক্ত 'তীব্র উৎপীড়নে'র পরিবর্তে পুনরায় 'শান্ত জীবনের মৃদু স্রোতে ভাসবার' জন্য কবিতাটির মধ্যে 'দয়াময়ে'র প্রতি যে সনির্বন্ধ পীড়াপীড়ি করা হয়েছিল, তৎপ্রতি কর্ণপাত ক'রে 'দয়াময়' নির্দয় হন নি।

আমার জানত, ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রাথমিকতম রচনা কি, মাঝে মাঝে আমাকে এই প্রশ্নের সম্মুখীন হ'তে হয়। এ প্রশ্নের উত্তরে আমি সর্বদাই বলি, একটি কবিতা। উত্তর শুনে অনেকেই বিস্মিত হন। কি আশ্চর্য! শরৎচন্দ্রও কবিতা লিখেছিলেন নাকি?

কিন্তু এ কথায় প্রকৃতপক্ষে বিস্মিত হবার তেমন কিছু নেই। খ্যাতনামা বহু লেখকের সাধনার ইতিহাস অনুসন্ধান করলে আমরা দেখতে পাই, তাঁদের সাহিত্য-সাধনার সূত্রপাত হয়েছিল কবিতা রচনার দ্বারা। অবশ্য, সময়মতো তাঁরা কাব্যলক্ষ্মীকে প্রণাম জানিয়ে গদ্য-নারায়ণের সমৃদ্ধতর এলাকার মধ্যে প্রবেশ করেছিলেন বটে, কিন্তু সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন কবিতা-সাধনাকালে আহৃত ছন্দ, লয় এবং ওজন সম্বন্ধে সুতীক্ষ্ণ জ্ঞান, গদ্য রচনার কালে যা পদে পদে তাঁদের কাজে লেগেছিল। সতর্ক লেখক মাত্রেই অবগত আছেন, গদ্যও একেবারে ছন্দোবর্জিত বস্তু নয়। একটি বাক্য রচনার পর কান যেন কেমন খুঁতখুঁত করতে আরম্ভ করেছে, কোথায় যেন ওজনের কেমন একটু ঘাটতি প'ড়ে আছে। একটু অভিনিবেশের ফলে যথাস্থানে যথোপযুক্ত শব্দটি সংযোজিত হওয়া মাত্র পরিপূর্ণতার মহিমায় কান খুশি হ'য়ে উঠল। এমন অভিজ্ঞতা পাকা প্রবীণ লেখকের নিকটও বিরল নয়।

গদ্য-রচনাতে ছন্দ এবং মাত্রা সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের অতিসূক্ষ্ম চেতনা যে ছিল, ঈষৎ ধৈর্যের সহিত তাঁর কোনো একটা পাণ্ডুলিপি পরীক্ষা ক'রে দেখলেই তা ধরা পড়ে। এমন অনেকবার দেখা গেছে, সামান্য একটা, হয়ত দুই অক্ষরের, ক্ষুদ্র শব্দকে বাক্যের একই স্থানে বার বার দুবার

যোগ ক'রে দুবারই কেটেছেন, তারপর তৃতীয়বার সেই শব্দটিকেই বাক্যের অন্য এক জায়গায় স্থাপন ক'রে তবে নিরস্ত হয়েছেন।

ছন্দ এবং মাত্রা বিষয়ে এই জ্ঞান শরৎচন্দ্র কবিতা রচনার দ্বারা অর্জন করেছিলেন, এমন কথা অবশ্য আমি বলছি নে; কারণ, আমি তাঁর একটিমাত্র কবিতারই সন্ধান পেয়েছিলাম। কিন্তু এ কথাও সত্য, যে কবিতাটির সন্ধান পেয়েছিলাম সেটি শরৎচন্দ্রের প্রথম চেষ্টার ফল ব'লেও মনে হয় না। তার মধ্যে শৈশবের অপরিণতির লক্ষণের চেয়ে কৈশোরের কতকটা সুপরিণতিরই লক্ষণ ছিল ব'লে মনে হয়। সুতরাং আলোচ্য কবিতাটির রচনাকালের পূর্বেও শরৎচন্দ্র কবিতা রচনার বিষয়ে খানিকটা হাত পাকিয়েছিলেন, সে কথা অনুমান করা যেতে পারে। সংসারে সতত ক্ষয়কর যে শক্তি সর্বদা ক্রিয়াশীল থেকে নিঃশব্দে অনিবার গতিতে সমস্ত বস্তুকে ধ্বংসের পথে টেনে নিয়ে চলেছে, কে বলতে পারে তার কবলে প'ড়ে যে কবিতাটির অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দেহ, এবং যে কবিতাগুলির অস্তিত্ব আমি অনুমান করছি,—সবগুলিই সেই একই ধ্বংসের পথের পথিক হয় নি!

কবিতা রচনার কথা বাদ দিলেও, শরৎচন্দ্রের ন্যায় কবিতার অনুরাগী পাঠক খুব বেশি দেখা যায় না। রবীন্দ্রনাথের বড় বড় কবিতা এমন বিস্ময়জনকভাবে তাঁর মথস্থ ছিল যে, পুস্তকের সাহায্য কিছুমাত্র না গ্রহণ ক'রেও নির্ভুলভাবে তিনি সেগুলি আবৃত্তি ক'রে যেতে পারতেন। পরলোকগত সুকবি বন্ধুবর সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র শরৎচন্দ্রের সম্মুখে উপস্থিত হ'লে আর রক্ষা থাকত না। অমনি শরৎচন্দ্র ব'লে উঠতেন, 'এই যে! মৈত্র মহাশয় যাবে সাগরসঙ্গমে!' তারপর আরম্ভ হ'য়ে যেত রবীন্দ্রনাথের সুদীর্ঘ "দেবতার গ্রাস" কবিতার নির্ভুল আবৃত্তি। এমন ঘটনা আমি অন্তত বার তিনেক দেখেছি। একবার আমরা কয়েকজনে এক সাহিত্য-

সম্মেলনে যোগ দেবার জন্ত ফরিদপুরে চলেছি। ট্রেনে একখানা কামরা আমাদের জন্তে রিজার্ভড্ ছিল। শিয়ালদহ স্টেশনে উপস্থিত হ'য়ে দেখি, সুরেনবাবু সর্বাগ্রে এসে জিনিসপত্র গোছাচ্ছেন। আমার মিনিটখানেক পরে উপস্থিত হলেন শরৎচন্দ্র। কামরার ভিতর প্রবেশ ক'রে সুরেন-বাবুকে দেখেই শরৎচন্দ্র উচ্ছ্বাসের সহিত ব'লে উঠলেন, "এই যে! মৈত্র মহাশয় যাবে সাগরসঙ্গমে!" তারপরই আরম্ভ হ'য়ে গেল—

"গ্রামে গ্রামে সেই বার্তা রটি গেল ক্রমে
মৈত্র মহাশয় যাবে সাগরসঙ্গমে
তীর্থস্নান লাগি।"

জিনিসপত্র গোছানোর হাঙ্গামায় আবৃত্তি বাধা পেল,—'নৌকা দুটি ঘাটে প্রস্তুত' হবার পরই তা থেমে গেল। কিন্তু তখন কে ভেবেছিল, থেমে গেল সাময়িকভাবে? ঐ কবিতাটি আবৃত্তি করবার স্পৃহা শরৎচন্দ্রের মনের মধ্যে গোপনে অপেক্ষা ক'রে ছিল। মিনিট কুড়ি-বাইশ পরে গাড়িও ছাড়া, আর সঙ্গে আরম্ভ হ'য়ে গের—

"পুণ্যলোভাতুর
মোক্ষদা কহিল আসি, 'হে দাদাঠাকুর,
আমি তব হব সাথী'।"

এবার কিন্তু অনেক ধীরে ধীরে, অর্থাৎ কতকটা আপনার মনে। আর, বোধ হয় সমস্তটাও শেষ হ'ল না, খানিকটা এগিয়ে কথাবার্তা-আলাপ-আলোচনার মধ্যে আবৃত্তি থেমে গেল। সেদিন কামরায় আমরা পাঁচজন ছিলাম—শরৎচন্দ্র, হুমায়ুন কবির, লাল মিঞা, সুরেনবাবু এবং আমি।

শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের লেখার, বিশেষত রবীন্দ্র-কাব্যের, কত বড় ভক্ত ছিলেন তার প্রমাণে একটি ক্ষুদ্র গল্প বলি।

১৯২১ সাল। মাসটা ঠিক মনে পড়ছে না। আমি তখন বিশেষ কোনো কারণে শিবপুরে বাস করছি। প্রিন্স্ অব ওয়েলসের কলিকাতা আগমন উপলক্ষে হরতাল হয়েছে। যতদূর মনে পড়ে, আমাদের আমলের সেই প্রথম হরতাল। তার পূর্বে শান্ত সংযত ভিক্টোরিয়া-যুগ নির্বিবাদে অতিবাহিত হয়েছে। পরিপূর্ণ হরতাল,—যান-বাহন, হাট-বাজার, দোকান-পসার সমস্ত বন্ধ।

শরৎচন্দ্রের সহিত সে সময়ে প্রতিদিনই মিলিত হতাম। সেই হরতালের দিনে সকাল আটটা সাড়ে আটটা আন্দাজ নগ্নপদে শরৎচন্দ্র আমাদের বাসায় এসে উপস্থিত। বললেন, "উপীন, শুনছি, হাওড়া স্টেশনে ভারি দুরবস্থা। ট্রেনে ট্রেনে বহু লোক না জেনে এসে পড়েছে। শিশুরা দুধ পাচ্ছে না, ছেলেমেয়েরা খাবার পাচ্ছে না, স্ত্রীলোকেরা বাড়ি যাবার গাড়ি পাচ্ছে না।—যাবে যদি কোনো কাজে লাগতে পারি?"

দ্বিরুক্তি করলাম না। "চল" ব'লে খালি পায়ে শরতের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম। শিবপুর থেকে হাওড়া স্টেশন সুদীর্ঘ পথ, দুজনে নানাবিধ গল্প করতে করতে পথ চলতে লাগলাম।

হাওড়া স্টেশনের নিকট বাকল্যাণ্ড ব্রিজে উপস্থিত হওয়ার পর শরৎচন্দ্র আমাকে একটি প্রশ্ন করলেন, "আচ্ছা বল ত, আমাদের ভারতবর্ষের সকল কবির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের স্থান কি, অর্থাৎ প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ থেকে আরম্ভ ক'রে শততম পর্যন্ত একশ' স্থানের মধ্যে কোন্ স্থানটি তিনি অধিকার ক'রে আছেন?"

ক্ষণকাল চিন্তা ক'রে দেখে বললাম, "ঠিক করতে পারছি নে। তুমি যখন প্রশ্নকর্তা, তখন উত্তরও তুমি নিশ্চয় জানো। তুমিই বল, রবীন্দ্রনাথের স্থান কি?"

শরৎ বললেন, "দ্বিতীয়। আচ্ছা, রবীন্দ্রনাথ যদি দ্বিতীয় হন, তা হ'লে প্রথম কে তা বল ?"

একটু ভেবে বললাম, "এ প্রশ্ন আরও কঠিন ঠেকছে। এর উত্তরও তুমি দাও।"

শরৎচন্দ্র বললেন, "প্রথম বেদব্যাস।"

খুশি হ'য়ে, একটু বিস্মিত হ'য়েও, জিজ্ঞাসা করলাম, "বাল্মীকি ?"

শরৎচন্দ্র বললেন, "অনেক নীচে,—অনেক নীচে। এঁদের দুজনের অনেক নীচে।"

"কালিদাস ?"

কালিদাসও অনেক নীচে।" ব'লে শরৎচন্দ্র বললেন, "প্রথম থেকে দ্বিতীয়র যে দূরত্ব, দ্বিতীয় থেকে তৃতীয়র দূরত্ব তার কয়েকগুণ বেশি।'

মনে মনে একটা দর্প ছিল, আমার মতো রবীন্দ্র-ভক্ত খুব বেশি সুলভ নয়; আমার পাশে শরৎচন্দ্রের পরিচয় পেয়ে বেশ খানিকটা নিষ্প্রভ হ'য়ে গেলাম।

যে কথা নিয়ে এ অধ্যায় আরম্ভ করেছিলাম, কথায় কথায় সে কথার শেষ ভাগটুকু বলতে প্রায় ভুলে যাবার উপক্রমই করেছি। শরৎচন্দ্রের যে কবিতাটি আমার পড়বার সৌভাগ্য হয়েছিল, তার আয়তনের চিত্র আমার মানসপটে এখনো সুস্পষ্টভাবে অঙ্কিত হ'য়ে আছে। শরৎচন্দ্রের হাতের মুক্তার মতো সুন্দর ছোট ছোট অক্ষরে বেগুনে কালিতে লেখা ফুলস্ক্যাপ কাগজের একদিকেই শেষ করা ত্রিশ-বত্রিশ লাইনের একটি কবিতা। একমাত্র প্রথম লাইন ছাড়া তার অন্য কিছুই আমার মনে নেই। প্রথম লাইনটি হচ্ছে, 'ফুলবনে লেগেছে আগুন'।

মাত্র দশ অক্ষরের একটি অতি ক্ষুদ্র লাইন, কিন্তু অসাধারণ না

হ'লেও একেবারে সাধারণও নয়। ফুলবনে আগুন লাগার কল্পনার মধ্যে নূতনত্বই শুধু নেই, এমন একটু মর্মান্তিকতার স্পর্শ আছে যা আমাদের মনকে সহজেই আহত করে। গোলাপ, মালতী, মল্লিকা, অপরাজিতা অগ্নির দহনে চড়্ চড়্ ক'রে পুড়ে যাচ্ছে, এ সত্যই একটা করুণ ট্র্যাজেডি, ফুলবন যদি উপমার ফুলবন হয়, তা হ'লেও।

শরৎচন্দ্রের 'ফুলবনে লেগেছে আগুন' কবিতার সমসাময়িক আর একটি লেখা আমার মনে পড়ে। সেটি ক্রিকেট ম্যাচ খেলা সংক্রান্ত একটি ছোট গল্প। কাহিনীর বিস্তারিত বিবরণ মনে নেই; তবে এটুকু মনে আছে, দুই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী সম্প্রদায়ের মধ্যে যৎপরোনাস্তি উত্তেজনার সহিত খেলা শেষ হ'ল। খেলা শেষ হ'ল মাঠে, কিন্তু মাঠের বাইরে প্রচণ্ড মারামারির মধ্যে চলল তার জের। গুরুতরভাবে আহত হ'লে কি হবে, মাঠে এবং মাঠের বাইরে, উভয় স্থানেই, গল্পের নায়ক জ্যোতিষচন্দ্র যথাক্রমে ক্রীড়ানৈপুণ্য এবং সাহসিকতার পরিচয়ের দ্বারা পাঠকদের বিস্ময় ও প্রশংসা অর্জন করতে সমর্থ হয়েছিল।

আমার বেশ মনে পড়ে, একখানা ফুলস্ক্যাপ কাগজকে তিনবার ভাঁজ করলে, অর্থাৎ সাধারণ এক্সারসাইজ বুককে একবার ভাঁজ করলে, যে আকার হয়, সেই আকারের ঘরে-বাঁধা খাতার দশ-বারো পৃষ্ঠায় গল্পটি শেষ হয়েছিল।

বহুদিনের কথা, কিন্তু আমার যেন মনে হয়, 'ফুলবনে লেগেছে আগুন' কবিতা এবং জ্যোতিষচন্দ্রের গল্প—দুটি লেখাই শরৎচন্দ্র লিখেছিলেন বেগুনে রঙের কালিতে। এ দুটি লেখা যখন লিখিত হয় তখন ফাউণ্টেন পেনের সৃষ্টি হয় নি, অন্তত আমাদের দেশে চলন হয় নি; সুতরাং সে সময়ে বেগুনে রঙের কালি কতকটা দুষ্প্রাপ্য ছিল ব'লেই মনে হয়। তথাপি সে দুটি লেখার কথা চিন্তা করলে বেগুনে কালিতে লিখিত ব'লেই যেন মনে পড়ে। পরবর্তী কালে, ফাউণ্টেন পেনের যুগে, শরৎচন্দ্রকে

প্রায়ই বেগুনে রঙের কালি ব্যবহার করতে দেখা যেত। বেগুনে রঙের কালির প্রতি তাঁর একটু পক্ষপাত ছিল ব'লেই মনে হয়।

আমাদের বাল্যকালে ভাগলপুরে এক শ্রেণীর মনসাগাছ থেকে আমরা পাকা মনসাফল সংগ্রহ করতাম। বাইরে থেকে দেখতে ফলগুলি কৃষ্ণবর্ণের মনে হ'ত, কিন্তু ভিতরে পাওয়া যেত গাঢ় লালবর্ণের, কতকটা বেগুনে রঙের, এক প্রকার ঘন নির্যাস। ছোট ছোট ফলগুলির অগ্রভাগ ছুরি দিয়ে কেটে ফেললে তৎক্ষণাৎ সেগুলি একযোগে বেগুনে কালি এবং দোয়াতে পরিণত হ'ত। পরম আনন্দের সহিত আমরা সেই দোয়াতে ষ্টিল পেন চুবিয়ে চুবিয়ে লেখার কার্য চালাতাম; উপকারিতার দিক দিয়ে সে বেগুনে কালির তেমন কিছু মূল্য ছিল ব'লে মনে হয় না। এক-একটা ফল একদিনেই শুকিয়ে শেষ হ'য়ে যেত, সুতরাং পরিশ্রম ঠিক পোষাত না। প্রকৃতির পণ্যশালা থেকে বিনা পয়সায় বেগুনে কালির দোয়াত ছিঁড়ে নিয়ে আসা আমাদের একটা কৌতুক ও শখের ব্যাপার ছিল। কিন্তু পয়সা দিতে না হ'লেও ভিন্ন প্রকারে আমাদিগকেও শখের মাশুল জোটাতে হ'ত বড় কম নয়। কণ্টকসঙ্কুল মনসাগাছের সুদীর্ঘ কাণ্ডের শীর্ষদেশ থেকে কষ্টে এবং কৌশলে ফলগুলি আহরণ করতে অনেক সময়ে ক্ষতবিক্ষত হ'তে হ'ত। শরৎচন্দ্র ও তাঁর সমসাময়িক বন্ধুবান্ধবেরাও শখ ক'রে আমাদের মতো মনসাফলের বেগুনে কালি ব্যবহার করতেন, সে কথা যেন মনে পড়ে। কিন্তু সেই মনসাফলের রঙ থেকেই শরৎচন্দ্রের বেগুনে কালির প্রতি অনুরাগ জন্মেছিল কি-না, সে কথা বলা কঠিন।

যত দূর অনুমান হয়, শরৎচন্দ্র সাহিত্য-সাধনা আরম্ভ করেন পনের-ষোল বৎসর বয়সকালে। কিন্তু পাঠক-সমাজে তাঁর যথার্থ আত্মপ্রকাশ হয় বহু বিলম্বে, ১৩১৯ সালের ফাল্গুন-চৈত্র মাসে 'যমুনা' মাসিক পত্রিকায়

তাঁর "রামের সুমতি" নামক সন্ত-রচিত গল্প প্রকাশিত হওয়ার পর। সে সময় তাঁর বয়ঃক্রম ৩৬ বৎসর।

ষোল বৎসর বয়স থেকে আরম্ভ ক'রে ছত্রিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত শরৎ-চন্দ্রের সাহিত্য-অভিযানের এই বিশ বৎসরের সুদীর্ঘ পথখানি ভারি বিচিত্র এবং কৌতূহলোদ্দীপক। একটু লক্ষ্য ক'রে দেখলে এর মধ্যে পাওয়া যায় তাঁর সাহিত্য-জীবনের কয়েকটি প্রধান সময়-পর্ব এবং গুটি-দুয়েক গুরুত্বপূর্ণ চিহ্নস্থলী (Landmark)।

প্রথম অর্থাৎ আদি পর্বের বিস্তৃতি বৎসর দুয়েকের অধিক হবে ব'লে মনে হয় না। এই পর্ব-কালে শরৎচন্দ্র 'ফুলবনে লেগেছে আগুন' কবিতা, জ্যোতিষচন্দ্রের গল্প এবং সম্ভবত এই ধরনের আরও কিছু কবিতা ও গল্প রচিত ক'রে হাত মকৃশ করেন। এই সময়ের লেখাগুলি সংরক্ষণের উপযুক্ত নয় বিবেচনা ক'রে, হয় শরৎচন্দ্র নিজেই স্বেচ্ছায় নষ্ট করেছিলেন, অথবা অবহেলা-অনাদরে তারা নিজেরাই দৃষ্টিপথের অন্তরালে আত্ম-গোপন করেছিল।

এই আদি পর্বের অব্যবহিত পরের আট বৎসর কালকে বলা যেতে পারে শরৎচন্দ্রের সাহিত্য-জীবনের উদ্যোগ পর্ব। উদ্যোগ পর্বের শেষ হয়েছিল ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে, যখন শরৎচন্দ্র সহসা সংসার পরিত্যাগ ক'রে বৎসর দুয়েকের জন্য নিরুদ্দেশ যাত্রা করেছিলেন। এই আট বৎসর ব্যাপী উদ্যোগ পর্ব যাৎপরোনাস্তি বিচিত্র এবং গুরুত্বপূর্ণ সময়। কারখানায় যেমন লোকচক্ষুর অগোচরে সামগ্রী উৎপন্ন হ'য়ে জমা থাকে ভাণ্ডার-শালায়, তারপর সময়মতো একদিন বাজারে মুক্তিলাভ করে; ঠিক সেই প্রকারে এই পর্বকালে 'বোমা,' 'কোরেল,' বড়দিদি,' 'চন্দ্রনাথ,' 'দেবদাস' 'কাশীনাথ' প্রভৃতি গল্প ও উপন্যাস শরৎচন্দ্র কর্তৃক রচিত হ'য়ে বহুকাল পাঠকচক্ষুর অন্তরালে অজ্ঞাতবাস ক'রে ছিল। এগুলির মধ্যে সাধারণ

পাঠক সমাজে প্রথম প্রকাশ লাভ করে 'বড়দিদি' ১৩১৪ সালের 'ভারতী' পত্রিকার বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসের তিন সংখ্যায়। বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার লেখায় লেখকের নাম প্রকাশিত হয় নি। আষাঢ় সংখ্যায় উপন্যাস সমাপ্তির সহিত লেখকের নাম দেখা গেল—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

'ভারতী'তে প্রকাশিত 'বড়দিদি' উপন্যাস সম্বন্ধে একটি বেশ কৌতুকপ্রদ ঘটনা ঘটেছিল। 'বড়দিদি'র প্রকাশকালে নব পর্যায় 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশিত হচ্ছিল। রবীন্দ্রনাথ উক্ত পত্রের সম্পাদক এবং শৈলেশচন্দ্র মজুমদার কার্যাধ্যক্ষ। বৈশাখ সংখ্যায় 'ভারতী'তে 'বড়দিদি' উপন্যাস পাঠ ক'রে অতিশয় অপ্রসন্ন চিত্তে শৈলেশবাবু জোড়াসাঁকোয় রবীন্দ্রনাথের গৃহে উপস্থিত হলেন। রবীন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ার পর ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলিলেন, "এ কাজ আপনি কেন করলেন ?—না না, এমন কাজ করা আপনার কখনই উচিত হয় নি।"

শৈলেশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। রবীন্দ্রনাথ শৈলেশচন্দ্রকে বিশেষ স্নেহ করতেন। শৈলেশচন্দ্রের মুখে এমন অকস্মাৎ অভিযোগের ইঙ্গিত শুনে বিস্মিত হ'য়ে তিনি বললেন, "বল কি হে! কি এমন অন্যায় কাজ আমি করেছি ?"

শৈলেশচন্দ্র বললেন, "আপনার নিজের কাগজকে বঞ্চিত ক'রে অমন লেখাটা আপনি 'ভারতী'তে দিলেন ?"

ততোধিক বিস্মিত হ'য়ে রবীন্দ্রনাথ বললেন, "কোন্ লেখা শৈলেশ ? কই, আমি ত 'ভারতী'তে কোনো লেখা দিই নি! কোন্ লেখার কথা তুমি বলছ ?"

এ কথার পর ঈষৎ বিমূঢ় হ'য়ে শৈলেশচন্দ্র বললেন, "কেন, 'বড়দিদি' ?"

শৈলেশচন্দ্রের কথা শুনে রবীন্দ্রনাথ সহাস্যে বললেন, "না হে, ও-

লেখা; আমার নয়। কিন্তু কার লেখা বল ত? ভারি চমৎকার লেখা!"

এ প্রশ্নের উত্তরে শৈলেশচন্দ্রের কি আর বলবার থাকতে পারে? বিস্ময়বিমূঢ় কণ্ঠে মৃদুস্বরে শুধু বললেন, "আপনার লেখা নয়!"

'বড়দিদি' যে রবীন্দ্রনাথের লেখা নয়, সে বিষয়ে শৈলেশচন্দ্র বোধ হয় সম্পূর্ণ নিঃসংশয় হয়েছিলেন আষাঢ় সংখ্যার 'ভারতী'তে শরৎচন্দ্রের নাম প্রকাশিত হওয়ার পর।

১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে শরৎচন্দ্রের নিরুদ্দেশ যাত্রা থেকে আরম্ভ ক'রে ১৯০২ সালে ডিসেম্বর মাসে অথবা ১৯০৩ সালের জানুয়ারি মাসে রেঙ্গুন যাত্রা পর্যন্ত আড়াই বৎসর তিন বৎসরের সময়কে নৈষ্কর্ম্যের পর্ব বলা যেতে পারে। এই সময়ের মধ্যে, একমাত্র কুন্তলীন-পুরস্কার-প্রতিযোগিতার জন্য "মন্দির" নামক গল্প রচনা ভিন্ন শরৎচন্দ্র আর কোনও সাহিত্য-সৃষ্টি করেন নি।

এই নৈষ্কর্ম্যের পর্ব বর্মা প্রবাসকালেও সঞ্চারিত হয়েছিল। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত যে বারো-তেরো বৎসর শরৎচন্দ্র বর্মায় ছিলেন, তার অধিকাংশই অতিবাহিত হয়েছিল সাহিত্যকে, অন্তত সাহিত্য-সৃষ্টিকে, বিস্মৃত হ'য়ে থেকে। ১৯০৭ সালে 'ভারতী'তে 'বড়দিদি' উপন্যাস প্রকাশিত হবার পর আমাদের চিঠি-পত্রে তার প্রভূত প্রশংসার কথা অবগত হ'য়ে শরৎচন্দ্রের সহিত্য-প্রচেষ্টা হয়ত খানিকটা উজ্জীবিত হয়েছিল, কিন্তু সেও এমন কিছু উল্লেখযোগ্য নয়। ১৯১২ সালের শেষভাগে শরৎচন্দ্র যখন কলিকাতায় আসেন, তখন তাঁর কাছে মাত্র 'চরিত্রহীন' উপন্যাসের কয়েকটি পরিচ্ছেদ এবং সম্ভবত 'নারীর মূল্য' নিবন্ধ দেখেছিলাম। শরৎচন্দ্র অবশ্য আমাকে বলেছিলেন, 'ঈশ্বরের মূল্য,' 'ধর্মের মূল্য,' 'সমাজের মূল্য,' 'পুরুষের মূল্য' ইত্যাদি নামে

বারোটা বিভিন্ন বিষয়ের 'মূল্য' লেখার তাঁর কল্পনা ছিল। তন্মধ্যে পাঁচ-ছয়টা লিখেও ছিলেন, কিন্তু আগুন লেগে সবগুলিই নষ্ট হয়, শুধু 'নারীর মূল্যই'ই রক্ষা পায়।

কিছু পূর্বে শরৎচন্দ্রের বিংশবর্ষব্যাপী সাহিত্য-অভিযানের প্রসঙ্গে যে দুইটি চিহ্নস্থলীর উল্লেখ করেছিলাম, তার প্রথমটি হচ্ছে ১৩১০ সালের ভাদ্র মাসে প্রকাশিত কুন্তলীন-পুরস্কারের প্রথম-পুরস্কার-প্রাপ্ত বেনামি গল্প "মন্দির"; এবং দ্বিতীয়টি ১৩১৪ সালে 'ভারতী'তে প্রকাশিত উপন্যাস 'বড়দিদি'।

আমার মনে হয়, সাধারণ পাঠকের অগোচরে নিজের লেখার মূল্য যাচাই ক'রে নেবার উদ্দেশ্যে "মন্দির" গল্পটি শরৎচন্দ্র নিজের নামে না পাঠিয়ে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের নামে কুন্তলীন-পুরস্কার-প্রতিযোগিতায় প্রেরণ করেছিলেন। গল্পটি প্রথম পুরস্কার লাভ করা সত্ত্বেও বেনামিবশত সাহিত্য-সমাজে তদ্দ্বারা শরৎচন্দ্রের নাম প্রচারিত হ'তে পারে নি বটে, কিন্তু তিনি যে আপন মনের মধ্যে কতকটা আত্মপ্রত্যয় লাভ করতে সমর্থ হয়েছিলেন, তদ্বিষয়েও সন্দেহ নেই। প্রতিযোগিতায় যতগুলি লেখক অবতীর্ণ হয়েছিলেন, একজন বিচক্ষণ সাহিত্যিকের বিচারে, তন্মধ্যে তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক—এ আশ্বাসের মূল্য নিতান্ত কম ছিল না।

'বড়দিদি' যখন 'ভারতী'তে প্রকাশিত হয়, তখন শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্র-মোহন মুখোপাধ্যায় 'ভারতী'র অন্যতর সম্পাদক। সুরেনদাদার নিকট হ'তে পাণ্ডুলিপি প্রাপ্ত হ'য়ে তিনি 'ভারতী'তে 'বড়দিদি' প্রকাশিত করেন।

"মন্দির" এবং 'বড়দিদি' শরৎচন্দ্রের প্রথম প্রকাশিত রচনা। ঐ দুটির প্রকাশের দ্বারা সাহিত্য-সৃষ্টি বিষয়ে তাঁর যথেষ্ট উৎসাহিত হবার কথা

ছিল। কিন্তু স্বভাবত-অলস শরৎচন্দ্র 'বড়দিদি' প্রকাশিত হবার পর দীর্ঘ পাঁচ বৎসর কাল নিশ্চিন্ত নিশ্চেষ্টতার মধ্যে নিদ্রিত ছিলেন। ১৩১৯ সালে তাঁর নব অধ্যায়ের নূতন প্রচেষ্টার সদ্য-লিখিত গল্প 'রামের সুমতি' 'যমুনা'য় প্রকাশিত হ'ল; এবং তারপর শরৎ-সাহিত্য-গগনে দ্রুতগতিতরে একটির পর একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক ফুটে উঠতে লাগল। বিস্ময় এবং আনন্দের সহিত বাঙালী পাঠক দেখলে, বাংলা সাহিত্যের একটা দিক আলোকিত হ'য়ে উঠেছে।

কোন্ অবস্থার ভিতর দিয়ে এই অদ্ভুত ব্যাপার সম্ভব হয়েছিল, এবার সেই কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনী বলি।

১৯

১৯১২ সালের শেষভাগ। তখন আমরা ভাবানীপুরে কাঁসারীপাড়া রোডের বাড়িতে বাস করি। কিছুকাল পূর্বে আইনের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছি। ১৯১৩ সালের সূত্রপাতেই ভাগলপুরে গিয়ে ওকালতি ব্যবসায়ে নিযুক্ত হব, অন্তরে বাইরে তারই সুর ভাঁজছি। এতদিন দাদার মক্কেলদের নিয়ে আড্ডা দিয়েছি, ফুর্তি করেছি, থিয়েটার দেখেছি; এবার নিজের মক্কেলদের পেষণ ক'রে তৈল বার করতে হবে। কঠিন কথা।

সন্ধ্যার পর একদিন বাড়ি ফিরতে চাকর একটা ছোট কাগজ হাতে দিলে। প'ড়ে দেখি শরতের লেখা। অতি ক্ষুদ্র দু-চার লাইনের চিঠি। তার সম্পূর্ণ বাণী এখনও আমার স্পষ্ট মনে আছে। চিঠিখানা ঠিক এই রকম,—

প্রিয় উপীন,

কয়েকদিন হ'ল রেঙ্গুন থেকে এসেছি। তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসে দেখা পেলাম না। আর একদিন আসব। ইতি

শরৎ

শরৎ এসেছিল, অথচ দেখা হ'ল না! মনটা একেবারে বিগড়ে গেল। চাকরকে প্রশ্ন ক'রে জানলাম, বাড়ির ভিতর না গিয়ে চিঠিখানা তাকে লিখে দিয়ে বাইরে-বাইরেই সে চ'লে গেছে। অযথা চাকরের উপর খাপ্‌পা হয়ে উঠলাম—"হতভাগা, বাবু কবে আবার আসবে, কোথায় থাকে,—এসব কথা লিখিয়ে নিলি নে কেন?"

সাধারণত ভৃত্যের পক্ষে এসব কথা নিজের বিবেচনায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে লিখিয়ে নেবার কথা নয়; অসুবিধেয় প'ড়ে এ নিতান্তই আমার আপন রাগের কথা, সুতরাং এই অসঙ্গত দাবির প্রতিবাদ করা চলত। কিন্তু তখনকার দিনের ভালমানুষ চাকর, মৌনের দ্বারা অপরাধ খানিকটা স্বীকার ক'রে নিয়ে অপ্রতিভ নেত্রে আমার দিকে চেয়ে রইল। ভাবটা, সত্যই, লিখিয়ে না-নেওয়াটা ভারি অন্যায় হ'য়ে গেছে।

বললাম, "এবার বাবু এলে আমি যদি তখন বাড়ি না থাকি তা হ'লে বাবুকে বাড়ির ভিতর নিয়ে যাবি, আর বাবুর কাছ থেকে বাবুর কলকাতার ঠিকানা লিখিয়ে নিবি। ঠিকানা, ঠিকানা! ঠিকানা কি জিনিস, বুঝিলি?"

ঘাড় নেড়ে ভৃত্য বললে, "হাঁ দাদাবাবু, সমঝা। পতা লিখা লেঙ্গে।"

বললাম, "হাঁ, হাঁ, পতা। পতা লিখিয়ে নিস।"

শরৎ এসে দেখা না ক'রে ফিরে গেছে শুনে বাড়ির লোকেরাও খুব দুঃখিত হলেন। তাঁদেরও সতর্ক ক'রে দিলাম, আমার অনুপস্থিতিকালে সে যদি আসে, তা হ'লে অন্তত তার ঠিকানাটাও যেন লিখে নেওয়া হয়।

ভারি রাগ হ'তে লাগল শরতের উপর। এমন বে-আক্কেলে মানুষও ভূভারতে থাকে! আর একদিন আসব! কবে আসবে, কোন্ সময়ে আসবে, না জানলে একজন পুরুষমানুষের পক্ষে সমস্ত দিন বাড়ি ব'সে প্রতীক্ষা করা কি সম্ভব? দেখা হ'লে তার সঙ্গে এ অবিবেচনার জন্যে রীতিমতো হুজ্জোৎও লাগাতে হবে।

দিনকয়েক একটু সতর্ক হ'য়ে রইলাম। পরদিন সন্ধ্যাকালে না বেরিয়ে বাড়ি ব'সেই কাটালাম। দুই-একদিন বেশি বিলম্ব না ক'রে বাড়ি ফিরলাম। কিন্তু কদিনই বা এ-রকম ক'রে পারা যায়? দিন পাঁচ-সাত পরে একদিন বাড়ি ফিরে দেখি, ঠিক সেই একই কাহিনী!

শরৎ এসে, আমি বাড়ি নেই শুনে, প্রথম দিনের মতো একটা ছোট চিঠি লিখে চাকরের হাতে দিয়ে স'রে পড়েছে। চিঠিখানা এই রকম,—

প্রিয় উপীন,

আজও এসে তোমার দেখা পেলাম না। শীঘ্রই রেঙ্গুনে ফিরে যাচ্ছি। এ যাত্রায় বোধ হয় তোমার সঙ্গে দেখা হ'ল না। ইতি

শরৎ

চিঠি প'ড়ে যুগপৎ ভৃত্যের উপর এবং শরতের উপর পিত্ত জ্ব'লে উঠল। সতর্জনে ভৃত্যকে বললাম, "উল্লুক কোথাকার! এবারও বাবুর পত্তা লিখিয়ে নিস নি?"

এই অন্যায় মন্তব্যের প্রতিবাদে ক্ষুব্ধকণ্ঠে অথচ ঈষৎ দর্প সহকারে ভৃত্য বললে, "জরুর লিখ লিয়া। ঠিকসে পঢ়িয়ে, উসমে জরুর লিখা হোগা।"

তিন লাইনের ওটুকু ক্ষুদ্র চিঠি আর কত ঠিকসে পড়ব! বুঝলাম, ঠিকানার জন্য ভৃত্য অনুরোধ করেছিল, কিন্তু ঠিকানা লেখবার অভিনয় ক'রে শরৎ তাকে প্রতারিত ক'রে গেছে; ইচ্ছা ক'রেই ঠিকানা দেয় নি। সে যাই হোক। সুদূর বর্মা দেশ থেকে কলকাতায় এসে শরৎ ফিরে যাবে, অথচ তার সঙ্গে আমার দেখা হবে না,—এর চেয়ে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা আর কি হ'তে পারে! কি কারণে, তা ঠিক নির্ণয় ক'রে বলা শক্ত, শরতের প্রতি আমাদের—বিশেষত সুরেনদাদা, গিরীন ও আমি—আমাদের এই তিন ভাইয়ের, লৌহ-চুম্বকের আকর্ষণের মতো একটা দুর্বার আকর্ষণ ছিল। চুম্বক অবশ্য শরৎ, আমরা লৌহ। কিন্তু লৌহ হ'লেও, সময়ে সময়ে প্রমাণ পাওয়া যেত চুম্বকও লৌহের দ্বারা একই মাত্রায় আকৃষ্ট হ'য়ে থাকে। অস্থিরচিত্তে ভাবতে লাগলাম, কি উপায়ে শরৎচন্দ্রের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে, কেমন ক'রে তার ঠিকানা সংগ্রহ

করি! দ্বিতীয় চিঠির মর্মানুযায়ী মনে হয় রেঙ্গুনে ফিরে যাবার পূর্বে আর সে ভবানীপুরের বাড়িতে সম্ভবত আসবে না। কি করা যায়! কার কাছে যাওয়া যায়!

হঠাৎ মনে পড়ল প্রভাসের কথা। প্রভাস শরৎচন্দ্রের মধ্যম ভ্রাতা, কিছুকাল পূর্বে সে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগদান করেছে। যতদূর মনে পড়ে, তখনো সে প্রভাস ব্রহ্মচারী, তখনো স্বামী বেদানন্দ হয় নি। প্রভাসের কথা খেয়াল হ'তেই মনটা আশার আনন্দে ভ'রে উঠল। প্রভাস নিশ্চয়ই শরতের সন্ধান দিতে পারবে।

কিছুমাত্র কালক্ষয় না ক'রে পরদিনই সকাল সকাল আহারাদি সেরে বেলুড় মঠের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। মঠে উপস্থিত হ'য়ে প্রভাসকে খুঁজে বার করতে বিলম্ব হ'ল না। দূর থেকে আমাকে দেখতে পেয়ে দ্রুতপদে আমার কাছে এসে প্রভাস বললে, "দাদা তোমাদের ভবানীপুরের বাসায় দু দিন গেছল উপীনমামা। একদিনও তোমার দেখা পায় নি।"

বললাম, "যেমন তোর দাদার-বুদ্ধি! কবে যাবে, কোন্ সময়ে যাবে, আগে থেকে জানা না থাকলে কেমন ক'রে আমার দেখা পেতে পারে? আমি কি সংসারের কনে-বউ যে, দিনরাত বাড়ি[illegible] হ'য়ে থাকব! সে ত আমাদের ঠিকানা জানে, একখানা পোস্টকার্ড লিখেও ত খবর দিতে পারত? দে, তার ঠিকানা দে, আমিই তার সঙ্গে দেখা করব।"

প্রভাস বললে, "তোমার সেখানে গিয়ে কাজ নেই উপীনমামা, তোমার কষ্ট হবে। তার চেয়ে একটা দিন আর সময়ে ঠিক ক'রে দিয়ে যাও, আমি দাদাকে তোমার কাছে পাঠিয়ে দোব।"

উত্তরে শরতের ইতিপূর্বে দুই দিনের কাহিনী প্রভাসকে জানিয়ে বললাম, "আমি অত কাঁচা লোক নই যে, ভবানীপুর থেকে বেলুড় মঠ—

এই দীর্ঘ পথ এসে ধ্রুব পরিত্যাগ ক'রে একটা অধ্রুব নিয়ে বাড়ি ফিরব। দিন-সময় ত ঠিক ক'রে দিয়ে যাব, কিন্তু তোমার দাদা যা অদ্ভুত মানুষ, হয়ত ঠিক-করা দিনের পূর্বদিন গিয়ে আগের দু-দিনের মতো একটা ছোট্ট চিঠি লিখে রেখে আসব, 'আজও তোমার দেখা পেলাম না'!"

শরৎ যে ঠিক এই রকমই অদ্ভুত মানুষ, সে কথা প্রভাস অস্বীকার করতে পারলে না,—কোনো উত্তর না দিয়ে নিঃশব্দে মৃদু মৃদু হাসতে লাগল।

পকেট থেকে কাগজ পেন্সিল বার ক'রে বললাম, "কি ঠিকানা বল্?"

এবারও ঠিকানা দিতে প্রভাস আপত্তি করলে; বললে, "সে ভারি গোলমেলে জায়গা উপীনমামা, বিশ্রী গলি-ঘুঁজির পথ; খুঁজে বার করতে তোমার কষ্ট হবে।"

এবার বিরক্তিমিশ্রিত কণ্ঠস্বরে বললাম, "তোর পাকামি রাখ্ প্রভাস। বালক-কাল থেকে এতটা বয়স পর্যন্ত কলকাতায় কাটল, এখন একটা ঠিকানা-পাওয়া বাড়ি খুঁজে বার করতে কষ্ট পেতে হবে! কোন্ জায়গায় শরৎ, [illegible]"

প্রভাস বললে, "হাওড়ায়।"

"হাওড়া চিনি। হাওড়ার কোন্ অঞ্চলে?"

"খুরুট রোডের কাছে একটা গলিতে।"

"খুরুট রোড জানি। গলির নাম জানিস?"

"জানি।"

"বাড়ির নম্বর?"

"জানি।" প্রভাসের মুখে অভ্যাসন্ন পরাজয়ের মৃদু কৌতুকের হাসি।

কাগজ-পেন্সিল তার হাতে দিয়ে বললাম, "নে, লিখে দে।"

গেরুয়া বসন পরিধান ক'রে প্রভাস সাধু হ'তে পারে, আমিও ত নিতান্ত অসাধু নই, তা ছাড়া সম্পর্কে তার মাতুল, বয়সেও এক-আধ বছরের বড়, সুতরাং বেশিক্ষণ সে প্রতিরোধ চালাতে পারলে না,—ঠিকানা লিখে দিলে।

ঠিকানা পকেটস্থ ক'রে প্রসন্ন চিত্তে স্টেশনে পৌঁছে ট্রেন অবলম্বন ক'রে হাওড়ায় পৌঁছলাম। তারপর সরাসরি শিবপুরের ট্রামে উঠে ব'সে আরোহীদিগকে জিজ্ঞাসা করতে করতে যথাসময়ে খুরুট রোড়ের মোড়ে এসে অবতরণ করলাম। প্রভাসের নির্দেশ অনুযায়ী খুরুট রোডে প্রবেশ ক'রে খানিকটা পথ অগ্রসর হ'য়ে ডান দিকে অভিপ্রেত গলিটি পাওয়া গেল। গলিতে প্রবেশ ক'রে নম্বর দেখতে দেখতে উপনীত হলাম একটি পুরাতন দ্বিতল গৃহের সম্মুখে। গলির নাম এবং গৃহের নম্বর যখন অবিকল মিলে গেছে, তখন ঠিক স্থানে পৌঁছেছি সে বিষয়ে সন্দেহ রইল না। বহুপরিচিত স্থানে যেমন অবলীলাক্রমে উপনীত হওয়া যায়, ঠিক তেমনি-ভাবেই এসে পড়েছি যথোদ্দিষ্ট স্থানটিতে। কোথায় ফেলে এসেছি প্রভাসের গোলমেলে জায়গার গলি-ঘুঁজির পথ, তা কিছুই বলতে পারি নে।

ঠুক্ ঠুক্ ক'রে ধীরে ধীরে দরজার কড়া নাড়লাম।

ভিতর থেকে কণ্ঠস্বর এল, "দরজা খোলা আছে।"

দরজা ঠেলে ভিতরে একটু প্রবেশ ক'রে জিজ্ঞাসা করলাম, "শরৎচন্দ্র চাটুজ্জে এখানে থাকেন ?"

"কে শরৎচন্দ্র চাটুজ্জে বলুন ত ?"

বললাম, "দিন পনের-ষোল হ'ল বর্মা থেকে এসেছেন ?"

"ও! তাই বলুন, দাদাঠাকুর !"

চাটুজ্জে মশায় এখানে এসে যে দাদাঠাকুর হয়েছেন তা কেমন ক'রে জানব? জিজ্ঞাসা করলাম, "তিনি বাড়ি আছেন?"

"আছেন।"

"তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্তে এসেছি। একটু ডেকে দিলে ভাল হয়।"

ঈষৎ উচ্চকণ্ঠে লোকটি হাঁক দিলে, "দাদাঠাকুর! তোমার সঙ্গে এক ভদ্রলোক দেখা করতে এসেছেন।" কিন্তু কোনো সাড়াশব্দ না পেয়ে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বললে, "আপনি ওপরে চ'লে যান না। দোতলার বারান্দায় উঠে বাঁ হাতে গেলেই কোণের দিকে দাদাঠাকুরের ঘর দেখতে পাবেন।"

দোতলার সিঁড়ি দেখা যাচ্ছিল। সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় উঠে শরতের কক্ষের সম্মুখে উপস্থিত হ'য়ে দেখি, ভূমিতলে প্রশস্ত শয্যার উপর ইতস্তত বই-খাতা-পত্র ছড়ানো, তার মধ্যস্থলে উপবেশন ক'রে শরৎ অবনত মুখে কি লিখছে। একটু চমকিত ক'রে দেবার অভিপ্রায়ে নিঃশব্দে জুতা খুলে সন্তর্পণে কক্ষে প্রবেশ করলাম। শব্দ কিছুই করি নি, কিন্তু দ্বারপথ অতিক্রম ক'রে যাওয়ার ফলে ঘরের আলোছায়ার যেটুকু ইতরবিশেষ হয়েছিল তার দ্বারাই সচেতন হ'য়ে শরৎ মুখ তুলে চেয়ে দেখলে। আমি অবশ্য আমার কোনো কৌশলের দ্বারা শরৎকে চমকিত করতে পারি নি; কিন্তু পারলে যতটুকু পারতাম শুধু আমার উপস্থিতিই বোধ করি তার চতুর্গুণ চমকাতে সমর্থ হ'ল। আমার প্রতি দৃষ্টিপাত মাত্র চমকিত হ'য়ে সে বললে, "এ কি! তুমি এখানে কি ক'রে এলে?"

শয্যার উপর সামনা-সামনি ব'সে প'ড়ে বললাম, "অনেক কৌশলে আর অনেক কষ্টে।...কিন্তু সে কথা যাক, তোমার এ কি কাণ্ড বল দেখি?"

"কিসের কাণ্ড ?"

"খুরুট রোড় থেকে ভবানীপুর এই দীর্ঘ পথ গিয়ে লিখে রেখে আস, 'আবার একদিন আসব।' তারপর কবে আসবে, কখন আসবে কিছুমাত্র না লিখে এসেও আবার একদিন হঠাৎ গিয়ে দেখা পাও না,—সেই কাণ্ডর কথা বলছি।"

এক কথায় শরৎ এ প্রসঙ্গের শেষ করলে। বললে, "দেখা পাই নে সেটা তোমার-আমার বরাত। কিন্তু যাই যে, তাতে কোনও ভুল হয় না। দেখা পাব মনে ক'রেই ত যাই ; দেখা পাব না মনে ক'রে কেউ কখনো এতটা পথ কষ্ট আর পয়সা খরচ ক'রে গিয়ে থাকে ?"

এ রকম উদ্ভট যুক্তি একমাত্র কৌতুকপরায়ণ শরৎই সৃষ্টি করতে সমর্থ। বললাম, "বাঃ ! চমৎকার কৈফিয়ৎ !"

কিন্তু এ প্রসঙ্গের কৈফিয়তের জন্য আমি একটুও ব্যস্ত ছিলাম না, এর চেয়ে অধিকতর কৌতূহলোদ্দীপক অনেক প্রসঙ্গ অপেক্ষা ক'রে ছিল।

দেখলাম, আট-দশটা ফাউণ্টেন পেন ইতস্তত ছড়ানো রয়েছে। কোনোটার নিব তীক্ষ্ণ, কোনোটার তীক্ষ্ণতর, কোনোটা বা ততোধিক তীক্ষ্ণ ; কোনোটায় ব্লু-ব্ল্যাক কালি, কোনোটায় বেগুনে, কোনোটা বা সবুজ রঙের।

জিজ্ঞাসা করলাম, "এতগুলো কলম একসঙ্গে বার ক'রে কি কর শরৎ ?"

মৃদু হেসে শরৎ বললে, "ও আমার একটা শখ। যখন যেটা ভাল লাগে তখন সেটায় লিখি।"

"এখন কোন্‌টায় লিখছিলে ?"

একটা কলম তুলে ধ'রে শরৎ বললে, "এইটেতে।"

"কি লিখছিলে ?"

"চরিত্রহীন।"

"সে কোন্ পদার্থ ?"

"উপন্যাস।"

"কতটা লিখেছ ?"

"গোটা পাঁচ-ছয় পরিচ্ছেদ হবে।" ব'লে শরৎ 'চরিত্রহীনে'র পাণ্ডুলিপির স্লিপগুলো আমার হাতে দিলে।

পড়তে পড়তে মুগ্ধ হ'য়ে গেলাম। ছাড়তে আর কিছুতে পারি নে; অথচ শরৎ মাঝে মাঝে এক-আধটা কথা তুলছে, তারও ঠিকমতো উত্তর দেওয়া হ'য়ে উঠছে না।

অত মনোযোগ সহকারে আমাকে পড়তে দেখে শরৎ বললে, "কি উপীন, অত মন দিয়ে পড়ছ, ভাল লাগছে না-কি ?"

বললাম, "অত্যন্ত।"

"এখনি শেষ পর্যন্ত পড়বে ?"

"পড়তে পারলে ত ভাল হয়।"

"কিন্তু ফুরাতে ত অন্তত ঘণ্টা দেড়েক সময় লাগবে, ততক্ষণ আমি কি করি ?"

"তুমি যেমন লিখছিলে, লেখো।"

মাথা নেড়ে শরৎ বললে, "সামনে কাউকে বসিয়ে রেখে লেখা হয় না। তার চেয়ে এক কাজ কর,—ওটা তুমি আজ নিয়ে যাও, কাল বৈকালে আমি না-হয় গিয়ে নিয়ে আসব অখন।"

'চরিত্রহীনে'র পাণ্ডুলিপি পড়তে পড়তে একটা মতলব মাথার মধ্যে প্রবেশ করতে আরম্ভ করেছিল। বললাম, "এর চেয়ে উত্তম প্রস্তাব আর কিছু হ'তে পারে না। তবে কাল আমি বাড়ি থাকব না, কাল

তুমি যেয়ো না। পরশু আমিই বেলা একটা-দেড়টা আন্দাজ এখানে আসব।"

শরতেরও এ প্রস্তাব ভাল লাগল। বললে, "তুমি পরশু যতক্ষণ না আসছ, আমি কোথাও বেরুব না। 'চরিত্রহীন' প'ড়ে কিন্তু তোমার অকপট মতামত আমাকে জানানো চাই।"

তথাস্তু!

খানিকক্ষণ গল্পগুজব ক'রে, চা-খাবার খেয়ে, গোটা দুয়েক স্লিপ শরতের লেখার সুবিধার জন্য ফেলে রেখে বাকী স্লিপগুলো কাগজ মুড়ে সযত্নে বেঁধে নিয়ে উঠে পড়লাম। সকাল দশটার সময়ে বাড়ি থেকে বেরিয়েছি, আর এখন বেলা চারটে বেজে গিয়েছে।

শরৎ আমাকে ট্রাম পর্যন্ত এগিয়ে দিতে চলল।

হাওড়া থেকে যখন ভবানীপুর পৌছলাম তখন সন্ধ্যা হ'য়ে গেছে। আর একদফা চা ও খাবার খেয়ে 'চরিত্রহীনে'র পাণ্ডুলিপি নিয়ে পড়তে বসলাম। রাত্রি নয়টা আন্দাজ নৈশ আহারের ডাক পড়ল। ও-কার্য শেষ হওয়া মাত্র পুনরায় পড়া আরম্ভ ক'রে দিলাম।

এক নিশ্বাসে যাকে বলে, প্রায় সেই ভাবেই পাণ্ডুলিপি যখন শেষ করলাম, তখন রাত্রি বারোটা বেজে গেছে। যতদূর মনে পড়ে পাণ্ডুলিপিতে প্রথম পরিচ্ছেদ থেকে আরম্ভ ক'রে উপর্যুপরি পাঁচ ছয় পরিচ্ছেদ ছাড়া আরও ত্ব-একটি বিচ্ছিন্ন পরিচ্ছেদও পেয়েছিলাম। মাঝে মাঝে ত্ব-চার পরিচ্ছেদ টপ্‌কে গিয়ে একটা পরিচ্ছেদ লিখে ফেলবার অভ্যাস শরৎচন্দ্রের ছিল। কোন উপন্যাসের মাঝ বরাবর ক্রমান্বয়ে লিখে এসে কখনো কখনো হয়ত একেবারে শেষের দিকে একটা অধ্যায় লিখে ফেলতেন। ওরূপ করবার কারণ জিজ্ঞাসা করলে বলতেন, 'হঠাৎ কোনো এক জায়গার কতকগুলো ঘটনা আর সংলাপ মনের মধ্যে একটু বিস্তারিতভাবে এসে পড়লে লিখে ফেলে জমা ক'রে রাখি।' উপন্যাসের কাহিনী (plot) বিশেষ স্পষ্ট এবং বিস্তারিতভাবে মনের মধ্যে ছকা থাকলে তবেই এভাবে বিচ্ছিন্ন পরিচ্ছেদ লেখা এবং পরে যথাস্থানে একসূত্রে গেঁথে দেওয়া সম্ভব হ'তে পারে।

'চরিত্রহীনে'র সূত্রপাত পাঠ ক'রে মুগ্ধ হলাম। অবশ্য 'বড়দিদি' এবং অন্যান্য লেখায় শরৎচন্দ্রের সাহিত্য-প্রতিভার পরিচয় যথেষ্ট পাওয়া গিয়েছিল; কিন্তু এ লেখার মধ্যে শিল্পশৈলীর সুপরিণতির যে বলিষ্ঠ নিদর্শন পাওয়া গেল, তা সত্যই অপূর্ব। একজন মেসের ঝিকে অবলম্বন ক'রে 'চরিত্রহীনে'র গল্প আরম্ভ হয়েছে। অবশ্য সে মেসের ঝি

যে আমাদের নিত্যপরিচয়ের সাধারণ মেসের ঝি নয়, তা সাবিত্রীর প্রতি প্রথম দৃষ্টিপাতেই বোঝা গিয়েছিল। কিন্তু তা হ'লেও সাবিত্রী যে একেবারে 'সতী-সাবিত্রী' নয়, সে কথা বুঝতেও বাকি ছিল না। একজন মেসের ঝি উপন্যাসের নায়িকা অথবা উপনায়িকা হ'তে চলেছে—শরৎচন্দ্রের এই দুঃসাহস, এবং একজন শিল্পীর পক্ষে সৎসাহস, দেখে খুশি হলাম। এতদিন বাস্তব জগতের পঙ্কের উপরেই পঙ্কজিনীকে ফুটতে দেখে এসেছি, এবার সাহিত্য-জগতেও সেই ব্যাপার ঘটতে চলল। 'পঙ্কের মাঝে যে ছিল মলিন করিলে তাহারে পঙ্কজিনী'—শরতের বিষয়ে এত বড় কথা বলবার উপকরণ পাওয়া গেল।

পরদিন সকালে চা-পানের পর আর-একবার 'চরিত্রহীনে'র পাণ্ডুলিপি নিয়ে বসলাম। গত রাত্রে যে কয়েকটা স্থান বিশেষভাবে ভাল লেগেছিল, সেগুলোর উপর আর একবার ভাল ক'রে চোখ বুলিয়ে নিয়ে, কাল হাওড়ায় শরৎচন্দ্রের বাসায় অবস্থানকালে মনের মধ্যে যে মতলব দেখা দিয়েছিল, তার সফলতার বিষয়ে এক রকম নিঃসন্দেহ হলাম। জহুরীর কষ্টিপাথরের উপর এ লেখা খাঁটি সোনা ব'লে স্বীকৃত না হ'য়ে যাবে না। পরীক্ষা ক'রে দেখতেই হবে।

বেলা দুটো আন্দাজ 'চরিত্রহীনে'র পাণ্ডুলিপি বগলদাবায় চেপে জহুরীর গৃহাভিমুখে রওনা দিলাম। উত্তর কলিকাতায় রামধন মিত্রের লেনে তিনি বাস করেন, নাম সুরেশচন্দ্র সমাজপতি।

তখনকার দিনে সুপ্রসিদ্ধ 'সাহিত্য' নামক মাসিকপত্রের সুযোগ্য সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতির নিন্দা-সুখ্যাতির কথা, বিশেষত নিন্দার কথা, কল্পনা ক'রে নবীন লেখকেরা কাঁটা হ'য়ে থাকতেন। বিস্তৃত সমালোচনা সুরেশচন্দ্র সাধারণত করতেন না; কিন্তু অতি সংক্ষিপ্ত যেটুকু করতেন, মৌমাছির হুলের মতো, তা সূক্ষ্ম ছিদ্রপথ দিয়ে অন্তরে

প্রবেশ ক'রে জ্বালা ধরিয়ে দিত। মৌমাছির হুলের সঙ্গে তুলনা করলাম এই কারণে যে, সুরেশচন্দ্রের সমালোচনায় সমালোচিত লেখকের জন্য যেমন থাকত হুল, অপর সকলের জন্য তেমনি থাকত মধু। চটকদার ভাষা এবং চটুল ভঙ্গীর গুণে সুরেশচন্দ্রের সমালোচনা এমন মুখরোচক এবং উপাদেয় বস্তু হ'ত যে, 'সাহিত্য' আসা মাত্র মোড়ক খুলে প্রথমেই আমরা মাসিক-সাহিত্য-সমালোচনার কয়েক পৃষ্ঠা প'ড়ে ফেলতাম। কোন হতভাগ্য লেখককে সুতীক্ষ্ণ শরাঘাতে কি রকম মাত্রায় জর্জরিত করা হয়েছে, দেখবার জন্য আমাদের কৌতূহলের অন্ত থাকত না।

আমাকে বিদ্ধ করবার অভিপ্রায়ে একবার সমাজপতি মহাশয় অন্তত মিনিট পাঁচেক সময় ব্যয় ক'রে একটি সুদীর্ঘ বাণ নির্মিত করেছিলেন; সে কথা আজও ভুলতে পারি নি। 'ভারতী' পত্রিকায় "বিভ্রম" নামে আমার লিখিত একটি ছোটগল্প প্রকাশিত হয়েছিল। গল্পটি সুরেশচন্দ্রের মোটামুটি প্রশংসা অর্জন করতে সমর্থ হ'লেও, তার একটি দুর্বল স্থান লক্ষ্য ক'রে শরত্যাগ করতে তিনি ইতস্তত করেন নি। গল্পটির মধ্যে দুটি শব্দকে আমি সন্ধিযুক্ত ক'রে এক ক'রে দিয়েছিলাম, যে-দুটির মধ্যে সন্ধি না হওয়াই হয়ত ভাল ছিল। আমার সেই দুটি শব্দের সামান্য সন্ধিকে ব্যঙ্গ করবার অভিপ্রায়ে তিনি পাঁচ-ছয়টি শব্দবিশিষ্ট একটি তিন হাত লম্বা অসঙ্গত সন্ধি রচিত করেছিলেন। তার প্রথম অংশটা আমার মনে আছে, 'যদ্যপ্যাপনারৈরূপ'; অর্থাৎ যদ্যপি আপনারা ঐরূপ। সমস্তটার অর্থ, যদ্যপি আপনারা ঐরূপ উদ্ভট সন্ধি করেন, তা হ'লে তা নিয়ে আমাদের বিপদে পড়তে হবে—এই ধরনের কিছু। শরাঘাত আমাকে কিন্তু ঘায়েল করতে পারে নি; মোটের উপর খুশিই হয়েছিলাম, অমন চমৎকার একটি কৌতুকজনক বস্তু সমাজপতি মহাশয়কে রচিত করতে বাধ্য ক'রে।

সে সময়ে সমাজপতি মহাশয়ের সহিত আমাদের ভবানীপুর সাহিত্য-সমিতির সদস্যদের, বিশেষত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, প্রমথনাথ সেন, শ্যামরতন চট্টোপাধ্যায়, নলিনীমোহন শাস্ত্রী ও আমি—এই কয়জন সদস্যের বিশেষ দহরম-মহরম। কয়েকবার তিনি আমাদের সমিতির উৎসবাদিতে সভাপতি ও বিশেষ অতিথিরূপে আমন্ত্রিত হওয়ার ফলে পরস্পরের মধ্যে ঘনিষ্ঠ পরিচয় এবং অন্তরঙ্গতা ত স্থাপিত হয়েছিলই, তা ছাড়া আমাদের সমিতির মুখপত্রিকা হস্তলিখিত মাসিক 'তরণী'র বাঁধানো খাতাগুলি থেকে পাতা ছিঁড়ে ছিঁড়ে তিনি তাঁর 'সাহিত্য' পত্রের উদরপূর্তির জন্য ছাপাখানায় সোজা চালান দিতে আরম্ভ করেছিলেন ব'লে, তাঁর ওপর খানিকটা আদর-আবদার খাটাবার পথও আমরা খুঁজে পেয়েছিলাম।

রামধন মিত্র লেনে সমাজপতি মহাশয়ের গৃহে যখন পৌঁছলাম, তখন তিনি তাকিয়া হেলান দিয়ে মনোযোগ সহকারে একটা লেখা পাঠ করছেন; আমাকে দেখে খুশি হ'য়ে বললেন, "এস, এস। খবর কি বল?"

শয্যার উপর ব'সে প'ড়ে বললাম, "খবর ভাল, বোধ হয় খুশি করতে পারব আপনাকে।"

জাত সম্পাদক,—আমার কথা শুনে এবং হাতে খবরের কাগজ মোড়া পুলিন্দা দেখে বুঝেছেন, পুলিন্দার মধ্যে মাল আছে এবং সেই মালের মধ্যেই খুশি হবার কারণের সম্ভাবনা থাকতে পারে। হাত বাড়িয়ে আমার হাত থেকে বাণ্ডিলটা নিয়ে বললেন, "কই দেখি, কি এনেছ!"

বাণ্ডিল খুলে হাতের লেখা দেখে সমাজপতি মহাশয় বোধ হয় প্রথম দফা খুশি হলেন। সুন্দর হাতের লেখা লোভনীয় তোরণ, যার ভিতর দিয়ে পাঠকচিত্ত সহজেই লেখার মধ্যে প্রবেশ করে। সমাজপতি মহাশয়

পড়তে আরম্ভ করলেন, আমিও তীক্ষ্ণনেত্রে তাঁর মুখে-চক্ষে উৎসাহ-নৈরাশ্যের রেখাঙ্কণ পাঠ করবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হলাম।

প্রথম পৃষ্ঠার অর্ধেকটা পাঠ করবার পর মনে হ'ল যেন তাঁর ললাটদেশ ঈষৎ দীপ্ততর হ'য়ে উঠছে; পাতা ওল্টাবার সময় এমন একটু ক্ষিপ্রতার সহিত ওল্টালেন, যার মধ্যে উৎসাহের পরিচয় আছে ব'লে মনে হয়। দেখতে দেখতে কয়েক পাতাই পড়া হ'য়ে গেল। বোধ করি, প্রথম পরিচ্ছেদ শেষ ক'রে আমার দিকে চেয়ে দেখে বললেন, "এ কার লেখা? তোমার যে নয়, তা বুঝতেই পারছি। এত নাম থাকতে নিজের নাম নিশ্চয়ই উপন্যাসে ব্যবহার করবে না।"

মৃদু হেসে বললাম, "ঐটেই যদি আমার লেখা না হওয়ার একমাত্র প্রমাণ হ'ত তা হ'লে খুশি হতাম। আমার লেখা যে নয়, তার আরও গুরুতর প্রমাণ লেখার মধ্যে আছে। এ লেখার লেখক আমার ভাগ্নে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।"

বিস্মিতকণ্ঠে সমাজপতি বললেন, "শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়? নতুন লেখক?"

বললাম, "একেবারে নতুন নয়। বছর পাঁচেক আগে 'ভারতী'তে 'বড়দিদি' নামে ওর একটা ছোট উপন্যাস তিন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। সে সময়ে হঠাৎ একজন অত্যন্ত শক্তিশালী লেখকের আবির্ভাবে চতুর্দিকে বেশ একটু সাড়া প'ড়ে গিয়েছিল।" আমার শেষোক্ত মন্তব্যের সমর্থনে 'বড়দিদি' সম্বন্ধে শৈলেশচন্দ্র মজুমদার এবং রবীন্দ্রনাথের মধ্যে আলাপ-আলোচনার গল্পটাও করলাম।

'বড়দিদি' উপন্যাসের কথা সমাজপতি মহাশয়ের মনে পড়ল কি-না বলতে পারি নে, জিজ্ঞাসা করলেন, "পাঁচ বছরের মধ্যে আর কোনো লেখা কোথাও বের হয় নি?"

বললাম, "না।"

"অলস-প্রকৃতির মানুষ না-কি ?"

"ভারি খেয়ালি মানুষ ; আলস্যটাও তার একটা খেয়ালের মধ্যে। যখন আলস্য করতে আরম্ভ করে তখন ক্ষুধা-তৃষ্ণাও তাকে তৎপর করতে পারে না।"

"কোথায় থাকেন ভদ্রলোক ?"

"বর্মায়, রেঙ্গুনে।"

"কি করেন সেখানে ?"

"ডেপুটি একাউণ্টেণ্ট জেনেরেল্‌স্‌ অফিসে চাকরি করে।"

"তোমাকে লেখা পাঠিয়ে দিয়েছেন ?"

বললাম, "না, কয়েকদিন হ'ল সে এখানে এসেছে। তার হাত থেকেই লেখা পেয়েছি।"

সমাজপতি মহাশয়ের দুই চক্ষু উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল। উল্লসিত কণ্ঠে বললেন, "এখানে এসেছেন তিনি ? কোথায় থাকেন এখানে ?"

বললাম, "হাওড়ায়।"

"আমার সঙ্গে দেখা করিয়ে দাও উপেন।"

বললাম, "সেই মতলবেই ত আপনার কাছে এসেছি। আপনি অনুগ্রহ ক'রে ঐ অলস মানুষটিকে একটু যদি উৎসাহ দেন।"

সমাজপতি মহাশয় বললেন, "উনি নিজে আমাকে যে রকম উৎসাহ দিয়েছেন, তাতে আমি ওঁকে আমার সাধ্যমতো উৎসহ দিতে ছাড়ব না। এই কাজই দিবারাত্র করছি উপেন। এ কথা ভাল ক'রেই বুঝবে, যে-লেখক একটা পাতাও এমন অপূর্ব ভঙ্গীতে লিখতে পারে, বিধাতার হাত থেকে লেখক হবার বর নিয়েই সে এসেছে। কবে শরৎবাবুকে নিয়ে আসবে বল ?"

বললাম, "কাল এই সময়ে আপনার সুবিধে হবে?"

প্রসন্নমুখে সুরেশচন্দ্র বললেন, "নিশ্চয়ই হবে। তাই এসো। লেখাটা আজ আমার কাছে থাক্, রাত্রে সবটা প'ড়ে ফেলব। কি বল?"

বললাম, "লেখাটা আপনাকে দিয়ে যাবার জন্যেই এনেছিলাম। আপনি যে আমার সামনেই এতটা প'ড়ে ফেলবেন, তা আশা করি নি।"

উঠে প'ড়ে বললাম, "শরৎকে আপনার কথা কি বলব বলুন?"

মুহূর্তকাল চিন্তা ক'রে সহাস্যমুখে সুরেশচন্দ্র বললেন, "বলবে, বাংলা দেশের একজন শক্তিমান লেখককে আমি সাদরে আহ্বান করছি।"

বললাম, "এ কথা শুনলে সে হয়ত আসবে না, কাগজ কলম নিয়ে লিখতে ব'সে পড়বে।"

স্মিতমুখে সুরেশচন্দ্র বললেন, "আর একটা কথা উপেন।"

"বলুন।"

"এ লেখাটি 'সাহিত্যে' প্রকশিত হওয়া চাই।"

বললাম, "নিশ্চয় হবে। আপনি চাইলে সে না দিয়ে পারবে না।"

প্রসন্ন মনে বেরিয়ে এলাম। কাজ অর্ধেক পথ এগিয়েছে। এই অবুঝ অলস মানুষটিকে লোকচক্ষুর সমক্ষে টেনে বার করতেই হবে—যেন তেন প্রকারেণ।

পরদিন প্রত্যূষে উঠে দেখি, রাত্রির মধ্যে কোথা থেকে একরাশ হাল্কা ধূসর মেঘ এসে সারা আকাশ ছেয়ে ফেলেছে। বৃষ্টি তখনো পড়ছিল না বটে, কিন্তু যে-কোন মুহূর্তে পড়তে পারে, আবহাওয়ার মধ্যে তার ইঙ্গিত।

সকাল সকাল আহারাদি সেরে বেলা দশটা আন্দাজ বেরিয়ে পড়লাম। শরতের বাসায় যখন পৌঁছলাম, তখন বেলা প্রায় বারোটা।

আমি যে অত শীঘ্র আসব, শরৎ তা প্রত্যাশা করে নি। কারণ কাল একটা-দেড়টার সময়ে আসবার কথা ব'লে গিয়েছিলাম। শরৎ বললে, "কি উপীন, এত সকাল-সকাল এসেছ, খাওয়া-দাওয়া ক'রে এসেছ ত ?"

বললাম, "খাওয়া-দাওয়া না ক'রে ভবানীপুর থেকে খুরুট রোডে বারোটার সময়ে হাজির হই, এত কাঁচা লোক নই। তোমার খাওয়া হয়েছে ?"

শরৎ বললে, "মিনিট দশেক হ'ল হয়েছে। সাধারণত এত শীঘ্র খাই নে, একটার আগে প্রায়ই হয় না, তুমি আসবে ব'লে আজ একটু সকাল-সকাল সেরে নিয়েছি।"

বললাম, "ভালই করেছ; চল, বেরিয়ে পড়ি।"

বিস্মিত কণ্ঠে শরৎ বললে, "এই দুপুরবেলায় কোথায় যাবে ?—ভবানীপুরে ?"

হাসি মুখে বললাম, "কোনো পুরে নয়, একেবারে বাজারে। বাজারে তোমার অত্যন্ত অখ্যাতি রটেছে, নিজের কানে শুনবে চল।"

মৃদু হেসে শরৎ বললে, "আমার মতো লোকের বাজারে অখ্যাতি রটবে, সেটা এমন কিছু বিচিত্র নয়। কিন্তু রহস্য রেখে আসল কথাটা ব'লে ফেল।"

বললাম, "শ্যামবাজারের রামধন মিত্তির লেনের একটি বাড়িতে তোমার তলব পড়েছে,—সমন ধরাতে এসেছি।"

কৌতূহল সহকারে শরৎ জিজ্ঞাসা করলে, "কার বাড়িতে বল ত?"

"সুরেশ সমাজপতির বাড়িতে।"

"'সাহিত্য'-সম্পাদক সুরেশ সমাজপতি?"

"হ্যাঁ।"

তাচ্ছিল্যের সঙ্গে শরৎ বললে, "ওর বাড়ি আমি কেন যেতে গেলাম, ওর সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক!"

বললাম, "সম্পর্ক এখনো নেই, কিন্তু শীঘ্রই হবে।"

"কিসের সম্পর্ক?"

"লেখক-সম্পাদকের সম্পর্ক। সমাজপতি মহাশয় 'সাহিত্যে' তোমার লেখা বার করবার জন্যে উৎসুক।"

ভ্রূ কুঞ্চিত ক'রে শরৎ বললে, "আমি লিখি, কেমন ক'রে সে জানলে? তুমি বলেছ বুঝি?"

বললাম, "শুধু বলিই নি, পড়িয়েছি।"

শরতের দুই চক্ষু বিস্ফারিত হ'য়ে উঠল। [illegible] কণ্ঠে বললে, "কি পড়িয়েছ উপীন? 'চরিত্রহীন' নয় ত?"

বললাম, "তা ছাড়া আর কি পড়াব?"

আমার কথা শুনে শরতের মুখমণ্ডলে একটা আর্ত বিহ্বলতার ভাব ফুটে উঠল। কাতর কণ্ঠে বললে, "না না উপীন, এ তুমি অন্যায় কাজ করেছ, এ কাজ একটুও ভাল কর নি।"

কপট রোষের ভাব দেখিয়ে বললাম, "'বড়দিদি' প্রকাশিত হওয়ার পর দীর্ঘ পাঁচ বৎসর চুপ ক'রে নিঃশব্দে ব'সে থেকে তুমিই বা কি এমন ভাল কাজ করেছ শুনি? এতটা কাল বাংলা দেশের পাঠকদের সৎসাহিত্য থেকে বঞ্চিত ক'রে যে গুরুতর অপরাধ করেছ, তার জন্যে তোমার শাস্তি পাওয়া উচিত। তোমার মতো অলস আর ভীতু লোককে জবরদস্তি ক'রে ঘরের কোণ থেকে টেনে না বের করলে কি উপায় আছে বল?"

"কিন্তু ঘরের কোণ থেকে টেনে বের ক'রে তুমি একেবারে পথে বসালে উপীন!"

বললাম, "সেও ভাল, কিন্তু ঘরের কোণ ভাল নয়। পথে বসলে পথিকেরা তোমাকে দেখে খুশি হবে।" তারপর কতকটা ব্যগ্রকণ্ঠে বললাম, "শোন শরৎ, পথে বসানোই বল, আর যাই বল, পরশু তোমার এখানে ব'সে 'চরিত্রহীন' পড়তে পড়তে এই ধরনের কিছু করবার সঙ্কল্প আমার মনে উদিত হয়েছিল। সেই কথা ভেবেই আজ আমার এখানে আসবার ব্যবস্থা সেদিন ক'রে গিয়েছিলাম। পরশু বাড়ি গিয়ে রাত বারোটা পর্যন্ত জেগে 'চরিত্রহীনে'র পাণ্ডুলিপি শেষ ক'রে কি যে ভাল লাগল তা কি আর বলব! সে ভাল লাগার মধ্যে আত্মীয়-প্রীতির খাদ যে নেই, সে কথা যাচাই করবার জন্যে কাল বৈকালে বাংলা দেশের সবচেয়ে কঠিন কষ্টিপাথর সুরেশ সমাজপতির কাছে গিয়েছিলাম। তিনি তোমার 'চরিত্রহীনে'র প্রথম পরিচ্ছেদটি শেষ ক'রে আমাকে আশ্বস্ত করেছেন যে, আমার ভাল লাগার মধ্যে আত্মীয়-প্রীতির খাদ নেই। তাঁরই হুকুমে আমি তোমাকে তাঁর কাছে নিয়ে যেতে এসেছি।"

আমার কথা শুনে শরতের মুখে বিহ্বলতার চিহ্ন ফুটে উঠল; আর্তকণ্ঠে সে বললে, "এর চেয়ে তুমি যদি আমার ফাঁসির হুকুম আনতে,

সে বরং ভাল ছিল। আমার কোমরে দড়ি বেঁধে টানাটানি করলেও আমি যাব না উপীন। ও-লোকটার প্রতি আমার যে শ্রদ্ধা নেই তা নয়, কিন্তু ওকে আমি বিষম ভয় করি। অতবড় দুর্মুখ মানুষ ভূভারতে আর নেই। দোহাই তোমার, ওকে দিয়ে আমাকে বকুনি খাওয়াবার ব্যবস্থা ক'রো না।"

বললাম, "তোমার বিষয়ে সুরেশ সমাজপতি কি বলেছেন শুনবে?"

শরৎ বললে, "শুনে কোনো লাভ নেই। বুঝতেই পেরেছি খুব ভাল ভাল কথা বলেছে, কিন্তু বাগে পেলে বকুনি দিতেও ছাড়বে না।" এক মুহূর্ত চুপ ক'রে থেকে বললে, "কি হবে সুরেশ সমাজপতির মতামত শুনে? তার চেয়ে তোমার কেমন লাগল, তাই বল?"

বললাম, "'চরিত্রহীন' নিয়ে এত দৌড়োদৌড়ি ছুটোছুটি করছি, তবুও বলতে হবে আমার কেমন লাগল?"

শরৎ বললে, "তোমার যদি ভাল লেগে থাকে তাই যথেষ্ট। সুরেশ সমাজপতির মতামতের জন্যে আমি ব্যস্ত নই।"

কি বিপদেই না পড়লাম এই অবুঝ অচল খামখেয়ালী লোকটিকে নিয়ে! বললাম, "জান, সে ভদ্রলোক ব'সে আছেন বাংলা দেশের শক্তিমান সাহিত্যিক ব'লে তোমাকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে?"

অত্যন্ত সহজ সুরে শরৎ বললে, "এখন আর ব'সে নেই, এতক্ষণে শুয়ে পড়েছে। তুমিও শুয়ে প'ড়ে একটু গড়িয়ে নাও, কিংবা এ দুদিনে 'চরিত্রহীন' যতটুকু লিখেছি, প'ড়ে ফেল। আমি ততক্ষণ একটু তামাক খাবার যোগাড় দেখি।" ব'লে একটা চামড়ার কেস থেকে 'চরিত্রহীনে'র পাণ্ডুলিপি বার ক'রে আমার সম্মুখে রেখে উঠে পড়ল।

কি উপায় করা যায় এই মহাস্থাবর এঞ্জিনকে নিয়ে, উৎসাহ-বাষ্পের শত তাড়না সত্ত্বেও যে তার চাকা ঘোরাতে চায় না! একটা বালিশ

টেনে নিয়ে হেলান দিয়ে 'চরিত্রহীন' পড়তে আরম্ভ করলাম। শেষ পর্যন্ত শরৎকে সুরেশ সমাজপতির গৃহে নিয়ে যেতেই হবে তদ্বিষয়ে মনে মনে নিজেকে শক্ত ক'রেও নিলাম।

ক্ষণকাল পরে কাঠের নলওয়ালা একটা ফরসি নিয়ে এসে আমার সামনে ব'সে শরৎ নির্বাক হ'য়ে তামাক খেতে লাগল। পাণ্ডুলিপির গোটা-কয়েক পাতা প্রায় শেষ হ'য়েই এসেছিল। দু-চার মিনিট পরে একেবারে শেষ ক'রে চামড়ার কেসের ভিতর রেখে দিলাম।

তামাক খেতে খেতে শরৎ জিজ্ঞাসা করলে, "যেটুকু পড়লে, কেমন লাগল তোমার ?"

বললাম, "ফিরে এসে বলব।"

বিস্মিতকণ্ঠে শরৎ বললে, "ফিরে এসে বলবে ? কোথা থেকে ফিরে আসবে হে ?"

"সমাজপতির বাড়ি থেকে।"

"সেখানে আজ যাবে না-কি ?"

ঈষৎ গভীর স্বরে বললাম, "অতি অবশ্য যাব। সেখান থেকে তোমার 'চরিত্রহীনে'র কপি ফিরিয়ে নিয়ে তোমাকে দিয়ে যেতে হবে।"

তামাক খাওয়া বন্ধ ক'রে আমার দিকে তীক্ষ্ণ নেত্রে চেয়ে শরৎ বললে, "'চরিত্রহীনে'র কপি সমাজপতির কাছে আছে না-কি ?"

বললাম, "থাকাই ত উচিত। কাল পাণ্ডুলিপির শুধু প্রথম পরিচ্ছেদটুকু আমার সামনে পড়েছিলেন, বাকিটা রাত্রে শেষ ক'রে রাখবার কথা। প্রথম পরিচ্ছেদ প'ড়েই ত তোমাকে শক্তিমান বলেছেন, সবটুকু পড়ে কোন্ মান্ বলেন দেখা যাক।"

শরতের ওষ্ঠাধরে মৃদু হাস্যের রেখা দেখা দিলে ; বললে, "মর্তমান না

বললেন। কিন্তু যাই বলুন না কেন, আর কোনো দিন গিয়ে না-হয় শুনো,—বৃষ্টি আসতে পারে, আজ সকাল-সকাল বাড়ি ফিরে যাও।"

বললাম, "কথা না রাখবার মতো প্রবল বৃষ্টি হবে ব'লে মনে হচ্ছে না। তোমার লেখাটা ত ফিরিয়ে নিই, তারপর আকাশের অবস্থা অনুযায়ী হাওড়ায় আসা-না-আসা বিবেচনা করা যাবে। তবে সাধ্যমতো আজই তোমাকে ফিরিয়ে দিয়ে যাব। রোজ রোজ আসার চেয়ে একদিনেই কাজ শেষ করতে পারলে ভাল হয়। আচ্ছা, উঠি তা হ'লে। সম্ভবত আবার আসছি।" ব'লে উঠবার উপক্রম করলাম।

হাত দিয়ে আমাকে বসিয়ে দিয়ে শরৎ বললে, "অনেকক্ষণ বেরিয়েছ, চা-খাবার খেয়ে যাও।"

বললাম, "বেলা দেড়টার সময়ে চা-খাবারের কোনও প্রয়োজন দেখছি নে। ফিরে এসে খাব।"

আমার কথা শুনে এবার শরৎ হেসে ফেললে। বললে, "আচ্ছা, তাই খেয়ো। বিষম মোড়লের হাতে পড়া গেছে দেখছি!" তারপর ফরসিটা সরিয়ে রেখে উঠে দাঁড়াল।

বললাম, "তুমি উঠছ কেন?"

"চল, তোমাকে এগিয়ে দিয়ে আসি।"

সহজ সুরে শুধু বললাম, "চল।" বেতো ঘোড়া যখন চলবার উপক্রম করেছে, তখন আর তাকে বেশি তাড়না দিতে নেই।

শরৎ জামা পরলে, গায়ের কাপড় নিলে, তারপর মনিব্যাগটা পকেটে ফেলে আমার দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে বললে, "চলো।"

পথে বেরিয়ে দেখি, আকাশের আক্রোশ বেড়ে গেছে। মেঘ আরও ঘনীভূত হয়েছে।

পথ চলতে চলতে শরৎ বললে, "'চরিত্রহীনে' তোমাকে নামিয়েছি

উপীন ; এমন কি, তোমার ডাকনাম যে উপীন, তাও ব্যবহার করেছি। সেইজন্যেই তোমার এতটা উৎসাহ নয় ত ?”

বললাম, “বলা যায় না কিছু ; আমাদের ত একটা গোপন মনও আছে, সেখানে কি ব্যাপার চলছে কে বলতে পারে ?”

কথায় কথায় আমরা ট্রামের রাস্তায় এসে পড়লাম। ট্রাম এলে শরৎ আগে উঠে পড়ল, সঙ্গে সঙ্গে আমিও উঠলাম।

হাওড়ার ট্রাম শেষ ক'রে হ্যারিসন রোডের ট্রাম ধ'রে কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে উপনীত হ'য়ে আমরা যখন শ্যামবাজারের ট্রামে আরোহণ করছি, তখন ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি শুরু হয়েছে।

বলরাম ঘোষ স্ট্রীটের মোড়ে ট্রাম থেকে অবতরণ ক'রে একটিমাত্র ছাতার মধ্যে কোনো প্রকারে দুজনে মাথা গুঁজে একজন উৎসাহদীপ্ত চিত্তে এবং অপরে উদ্বেগচঞ্চল হৃদয়ে সুরেশ সমাজপতির গৃহাভিমুখে অগ্রসর হলাম।

বোধ করি আমাদের অপেক্ষাতেই সুরেশচন্দ্র সমাজপতি বাইরের ঘরে ব'সে কাজ করছিলেন। ছাতা মুড়ে আমাদের দুজনকে ঘরের ভিতর প্রবেশ করতে দেখে সোজা হ'য়ে উঠে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে জিজ্ঞাসা করলেন, "ইনিই শরৎবাবু?"

বললাম, "আজ্ঞে হ্যাঁ, ইনিই।"

নিজের সম্মুখের কাগজপত্র একটু সরিয়ে নিয়ে আমাদের দুজনের বসবার মতো জায়গা ক'রে দিয়ে সাগ্রহে সুরেশচন্দ্র বললেন, "আসুন, আসুন। বসুন। আপনার লেখা প'ড়ে ভারি খুশি হয়েছি। একেবারে পাকা হাতের সম্পূর্ণ নতুন ধাঁজের লেখা। দয়া ক'রে ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে চুপ ক'রে ব'সে যদি না থাকেন, আপনার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল।"

শরতের সঙ্গে চোখাচোখি হ'য়ে গেল। দেখলাম, তার মুখমণ্ডলে সুস্পষ্ট লালচে আভা। অবশ্য ঘরে প্রবেশ করার পূর্বেও মুখের উপর খানিকটা লালচে আভা ছিল; কিন্তু সে ছিল উদ্বেগের আগুন-লাগা আকাশের রক্তিমা, আর এ রক্তিমা আনন্দের উষাকালীন আকাশের। বর্ণ এক হ'লেও উভয়ের গোত্র বিভিন্ন।

এ প্রশস্তির উত্তরে যা হয় একটা কোনো বিনিময়-বাক্য না বললে ভাল দেখায় না। শরৎ বললে, "সামান্য লেখা, কি ক'রে আপনার ভাল লাগল তাই ভাবছি!"

মাথা নেড়ে সুরেশচন্দ্র বললেন, "না না, সামান্য নিশ্চয়ই নয়। আপনার লেখার মধ্যে সেই যাদু আছে যা পাঠককে একান্তভাবে পেয়ে বসে। কাল উপেন চ'লে যাওয়ার পর তার সামনে যতটা পড়েছিলাম,

তার পর থেকে আপনার লেখার ওপর চোখ বুলোতে বুলোতে এমন আকৃষ্ট হ'য়ে পড়লাম যে, শেষ-পর্যন্ত শেষ না ক'রে থাকতে পারলাম না।" তারপর আমার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বললেন, "'চরিত্রহীন' 'সাহিত্যে' যাতে প্রকাশিত হয়, সে বিষয়ে কাল তোমাকে অনুরোধ করেছিলাম। কিন্তু পরে সে বিষয়ে মত বদলেছি। 'সাহিত্যে' ও-লেখা বার করা চলবে না।"

একটু বিস্মিত হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "কেন বলুন ত ?"

সুরেশচন্দ্র বললেন, "ও-লেখা 'সাহিত্যে' বের হ'লে 'সাহিত্য' উঠে যাবে। অবশ্য, যে-সব সাহিত্যিককে আমি কম্‌প্লিমেণ্টারি কাগজ দিই তারা আর তাদের সাহিত্যিক বন্ধুবান্ধবেরা কাড়াকাড়ি ছেঁড়াছিঁড়ি ক'রে 'চরিত্রহীন' পড়বে; কিন্তু তা ছাড়া আর সব গ্রাহক 'সাহিত্য' ছেড়ে দেবে। পয়সা দিয়ে আমাদের দেশে যারা কাগজ কেনে, মেসের ঝিকে হজম করবার মতো জোরালো পরিপাকশক্তি এখনো তাদের হয় নি।" ব'লে উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠলেন।

তখনকার দিনের আবহাওয়ার হিসাবে এ কথার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ করা হয়ত চলত না; কিন্তু তথাপি শরৎ মৃদু ধরনের একটু প্রতিবাদ না ক'রেও থাকতে পারলে না। বললে, "কিন্তু হয় নি যে, সেটা পরীক্ষা ক'রে দেখবার জন্যেও ত একটা মেসের ঝি চাই সুরেশবাবু। বাজরার রুটি আমার পাকস্থলীতে হজম হবে কি হবে না, সে সমস্যার সমাধান করতে হ'লে প্রথমত বাজরার রুটি প্রস্তুত হওয়া দরকার, তারপর সে রুটি আমার খেয়ে দেখা চাই।"

সুরেশচন্দ্র বললেন, "আপনার এ যুক্তিতে কোনো ভুল নেই। আপনি শক্তিমান সাহসী শিল্পী, আপনি উৎকৃষ্ট বাজরার রুটি প্রস্তুত ক'রে দিয়েছেন; আমরা যদি আমাদের পরিপাকশক্তির দুর্বলতা

অনুমান ক'রে সে রুটি উদরসাৎ করতে ভয় পাই, সেটা আমাদের দুর্ভাগ্য। কিন্তু আমি বলি শরৎবাবু, আপনি যখন বাজরার রুটি এত চমৎকার প্রস্তুত করতে পারেন, তখন গমের ময়দার লুচিও আপনার কাছে আটকাবে না। আপনি আমাদের জন্যে ময়দার লুচি ক'রে দিন, আমরা পেট ভ'রে খেয়ে বাঁচি।" ব'লে পুনরায় হেসে উঠলেন।

শরৎ বললে, "কিন্তু আগেও ত আপনারা বাজরার রুটি খেয়েছেন।"

"কোথায়?"

"'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র রোহিণীর চরিত্রে?"

মাথা নেড়ে সুরেশচন্দ্র বললেন, "বঙ্কিমচন্দ্রের রোহিণী চরিত্রের সঙ্গে আপনার সাবিত্রী চরিত্রের বেশ খানিকটা প্রভেদ আছে। প্রথমত, রোহিণী ব্রহ্মানন্দের ভ্রাতুষ্পুত্রী, সমাজে তার প্রতিষ্ঠার অভাব ছিল না, তার একমাত্র অপরাধ সে বিধবা হ'য়ে গোবিন্দলালকে ভালবেসেছিল। আপনার সাবিত্রী চরিত্রের কিন্তু সেরূপ কোনো সামাজিক প্রতিষ্ঠা নেই। দ্বিতীয়ত, রোহিণী ও গোবিন্দলালের মধ্যে ভালবাসাকে অনিবার্য করবার জন্যে বঙ্কিমবাবুকে অনেক কিছু কাঠ-খড় পোড়াতে হয়েছিল। লজ্জা ও নৈরাশ্যের হাত থেকে উদ্ধার লাভের জন্যে রোহিণী বারুণী পুষ্করিণীতে ডুবে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিল, আর দৈবাৎ তা দেখতে পাওয়ায় গোবিন্দলাল রোহিণীর প্রাণরক্ষা করতে বাধ্য হয়েছিল। সমাজের চক্ষে রোহিণী ও গোবিন্দলালের ভালবাসার যা-হোক একটা কিছু কৈফিয়ৎ আছে, আপনার সাবিত্রী ও সতীশের ভালবাসার তেমন কোনো কৈফিয়ৎ নেই। একটা ঘটনাক্রমে, অপরটা ইচ্ছাক্রমে।"

ঠিক কোন্ ভাষায় কি ভাবে সেদিনকার আলোচনা চলেছিল, এত দীর্ঘ কাল পরে তা মনে ক'রে লেখা সম্ভব নয়; কিন্তু এ কথা বেশ মনে আছে, রোহিণী এবং সাবিত্রীকে সূত্রপাত ক'রে সে আলোচনা শাখা-

প্রশাখায় নানা বিষয়-বিষয়ান্তরে বিস্তার লাভ ক'রে ক'রে দীর্ঘ এবং কৌতূহলোদ্দীপক হ'য়ে উঠেছিল। বর্মা দেশে শরৎচন্দ্রের প্রবাস-জীবন সম্বন্ধেও অনেক কথা আলোচিত হ'ল।

বাইরে টিপ টিপ ক'রে বৃষ্টি পড়ছে, পথ কর্দমাক্ত, আকাশ মলিন। শরৎকে যেতে হবে হাওড়ায়, আমাকে ভবানীপুরে। অধিক বিলম্ব করা সমীচীন হবে না মনে ক'রে আমরা ওঠবার জন্যে তৎপর হলাম। শরৎ বললে, "এবার তা হ'লে আমরা আসি। আমার লেখাটা দিন।"

পাশের বাক্স থেকে 'চরিত্রহীনে'র পাণ্ডুলিপি বার ক'রে শরতের হাতে দিয়ে সুরেশচন্দ্র বললেন, "এ লেখা আপনাকে ফেরত দিচ্ছি একমাত্র এই শর্তে যে, শীঘ্রই আপনি আমাকে অন্য লেখা দিচ্ছেন।"

স্মিতমুখে শরৎ বললে, "আগে লুচি ভাজি।"

উত্তরে সুরেশচন্দ্র বললেন, "ভাজতে আরম্ভ ক'রে দিন শরৎবাবু,—বিলম্বও করবেন না, আলস্যও করবেন না। ভাজা লুচি যদি কিছু আপনার ভাণ্ডারে থাকে, বাসি হ'লেও নিতে রাজী আছি।" ব'লে শরতের লেখার বিষয়ে আর এক দফা এমন উচ্ছ্বসিত প্রশংসার সুধাবর্ষণ করলেন যে, আমাদের দুজনের চিত্ত আনন্দের পরিপূর্ণতায় ভ'রে উঠল। 'চরিত্রহীনে'র বিষয়ে ঈষৎ বিরুদ্ধ মন্তব্যের ফলে যদিই বা কিছু মালিন্য আমাদের মনের মধ্যে সঞ্চিত হয়েছিল, এই উচ্ছল প্রশস্তির প্লাবনে তা একেবারে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হ'য়ে গেল।

সুরেশচন্দ্রের নিকট বিদায় নিয়ে পুনরায় দুজনে এক ছাতার মধ্যে মাথা গুঁজে কর্নওয়ালিস স্ট্রীটের অভিমুখে ধীরে ধীরে অগ্রসর হলাম। কর্নওয়ালিস স্ট্রীটের মোড়ে পৌঁছে কিন্তু রাস্তা পার হ'য়েও ট্রামে উঠতে ইচ্ছা হ'ল না। ট্রামের ভিড়ের মধ্যে দুজনে বিচ্ছিন্ন হওয়ার

ফলে পাছে স্বপ্ন ভেঙে যায়, বোধ করি দুজনেরই অজ্ঞাতসারে দুজনের নিশ্চেতন মনের মধ্যে সেই ভয় বর্তমান ছিল। নিমগাছ আজ ইক্ষুরস নিঃসৃত করেছে; কঠিনতম পাষাণ খাঁটি সোনার রঙে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে।

গভীর আনন্দে বুঁদ হ'য়ে আমরা দুজনে বৃষ্টির জল এবং পথের কাদা ভুলে গিয়ে পূর্ব পটির ফুটপাথ ধ'রে দক্ষিণ দিকে চলতে লাগলাম। মনের তন্ত্রী এমন চড়া সুরে বাঁধা যে, বেসুরা মারবার ভয়ে বিশেষ কিছু কথাবার্তা হবারও আগ্রহ ছিল না। মাঝে মাঝে অল্পস্বল্প যা একটু-আধটু হচ্ছিল, তা নিতান্তই সংক্ষিপ্ত এবং অধিকাংশই অবান্তর। ডান দিক দিয়ে ঢং ঢং ক'রে ট্রামের পর ট্রাম আমাদের অতিক্রম ক'রে দক্ষিণ দিকে ছুটে চলেছে। তাদের প্রকোষ্ঠে আমাদের কিরূপ সঙ্কুলান হ'তে পারত, তা একবার চেয়ে দেখার কৌতূহল পর্যন্ত আমাদের নেই।

বহুক্ষণ পরে প্রথম যখন আমাদের গতিরোধ করার প্রবৃত্তি হ'ল, সবিস্ময়ে চেয়ে দেখি, দীর্ঘপথ অতিক্রম ক'রে এসে পড়েছি বউবাজারের মোড়ে। অজ্ঞাতসারে কখন পিছনে ফেলে এসেছি হ্যারিসন রোডের মোড়, যেখান থেকে শরতের হাওড়া ফিরে যাবার পথ।

ছাড়াছাড়ি হবার জন্যে দুজনে মুখোমুখি হ'য়ে দাঁড়ালাম। শরৎ বললে, "তোমার কথা শুনে, সুরেশ সমাজপতির কথা শুনে মনে হচ্ছে, কিছুদিন যদি বাঁচতাম তা হ'লে বাংলা দেশকে হয়ত কিছু দিয়ে যেতে পারতাম। কিন্তু তা হবার নয় উপীন।"

কিছু উদ্বিগ্ন হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "কেন বল ত?"

শরৎ বললে, "বেশিদিন বাঁচব না আমি। কঠিন রোগ হয়েছে আমার।"

"কি রোগ ?"

"তা ঠিক বলতে পারি নে—হয় হার্টের, নয় লাঙ্‌সের। ডাক্তার বলেছে, বর্মায় থাকলে এ রোগ সারবে না।"

কথা শুনে না-হেসে থাকতে পারলাম না। বললাম, "চমৎকার রোগ-নির্ণয়ের ক্ষমতা ত ডাক্তারের! হয় হার্ট ডিজিজ, নয় টি. বি.। হয় মাথা-ধরা, নয় ফোড়া।"

মৃদু হেসে শরৎ বললে, "না না, ঠাট্টা নয়; ডাক্তার ভাল।"

বললাম, "ডাক্তার যদি ভাল, তা হ'লে তার উপদেশ পালন করলেই ত হয়। বর্মা ছেড়ে চ'লে এস এখানে।"

"খাব কি এখানে ?"

বললাম, "ডাল-ভাত-চচ্চড়ি।"

"জোটাবে কে ?"

"যে রামজী সেখানে জোটাচ্ছে সেই রামজীই জোটাবে।"

'সাহিত্যে' সুরেশচন্দ্র 'চরিত্রহীন' প্রকাশ করবার মত পরিবর্তন করায় মাথার মধ্যে একটা মতলবের উদয় হয়েছিল। বললাম, "শোন শরৎ, কাল বৈকালে তুমি অতি অবশ্য ভবানীপুরে আমাদের বাড়িতে আসছ।"

"কেন, কি হবে সেখানে ?"

"একটা ক্ষুদ্রকে বৃহৎ ক'রে তোলবার ভার নিতে হবে তোমায়। শিশু চারাকে মহীরুহে পরিণত করতে হবে।"

"বাপ রে! এ যে এক বিরাট পরিকল্পনা! এর সরল অর্থ কি শুনি ?"

বললাম, "এর সরল অর্থ শুনতে অনেক সময় লাগবে, কাল শুনো। এখন বৃষ্টি কতকটা থেমেছে বটে, সন্ধ্যার ঝোঁকে কিন্তু প্রবল হ'য়ে

নামতে পারে। তাড়াতাড়ি বাড়ি যাও, তোমার আবার ছাতা নেই।"

"কাল বৈকালে কখন বাড়ি থাকবে তুমি?"

একটু ভেবে বললাম, "ধর, বেলা চারটেয় নিশ্চয়; কিন্তু আসা চাই তোমার।"

শরৎ কোনো উত্তর দিলে না। বুঝলাম মৌন সম্মতির লক্ষণ। মৌনের দ্বারা অনেক সময়ে সম্মতি জ্ঞাপনের অভ্যাস শরৎচন্দ্রের ছিল।

শিয়ালদা স্টেশনের দিক থেকে একটা ডালহৌসিগামী ট্রাম আসছিল। তাইতে শরৎকে তুলে দিয়ে ভবানীপুর ফিরলাম।

২৩

ভবানীপুরে আমাদের কাঁসারীপাড়া রোডের বাড়ির ঠিক অপর দিকে সপরিবারে বাস করতেন আমার পরম বন্ধু 'যমুনা'-পত্রিকা-সম্পাদক ঔপন্যাসিক ফণীন্দ্রনাথ পাল। তাঁর মতো উন্মুক্তহৃদয়, বন্ধুবৎসল, আত্মভোলা, আমোদপ্রিয়, আড্ডাজীবী মানুষ জীবনে খুব কম দেখেছি। আপন হৃদয়ের প্রীতির রসায়নের সাহায্যে অতি অল্প সময়ের মধ্যে তিনি পরকে পরমাত্মীয় করতে পারতেন। দিন পাঁচেক আলাপ পরিচয়ের পর যে মানুষের ফণীবাবুর সহিত সৌহৃদ্য স্থাপিত হয় না, বুঝতে হবে সে কঠিনহৃদয়ের প্রাণী।

ফণীবাবুর গুণাবলীর যে তালিকা উপরে দিয়েছি, তা মনে রাখলে সহজেই বোঝা যায়, আড্ডা গ'ড়ে তোলা এবং চালু রাখার জন্য যে-সকল গুণের একান্ত প্রয়োজন, তা তাঁর প্রচুর পরিমাণে ছিল। সুতরাং তাঁকে কেন্দ্র ক'রে একটি যে যৎপরোনাস্তি লোভনীয় আড্ডা সতত চলমান থাকত, তাতে বিস্ময়ের কোনো কথা ছিল না। গান-বাজনা, চা-খাবার, তাস-পাশা, আলাপ-আলোচনার কল্যাণে এই আড্ডা নিতান্ত কাজের মানুষকেও প্রলুব্ধ করত। কঠোর কর্তব্য-নিষ্ঠাও এর মায়া-বেষ্টনীর মধ্যে এসে পড়লে আত্মবিস্মৃত হ'য়ে দু-দণ্ডের জন্যও গতি হারাত।

আমি ছিলাম এই আড্ডার প্রধান পৃষ্ঠপোষক। দীর্ঘকালব্যাপী আড্ডা দিতে পারার প্রতিযোগিতায় আমি থাকতাম ফণীবাবুর সহিত এক গুম্ফবন্ধনীতে আবদ্ধ। ক্লান্ত হ'য়ে আর সকল সদস্য যখন রণে

ভর দিয়ে একে একে স'রে পড়ত, তখনো ফণীবাবু এবং আমি, রণক্ষেত্রে শয়ান আহত বীর সৈনিকের মতো, তাকিয়া মাথায় দিয়ে শুয়ে শুয়ে আড্ডার বাতি জালিয়ে রাখতাম।

আড্ডা দেওয়ার বিষয়ে এই উপযুক্ততা অর্জন করেছিলাম বাল্যকাল থেকে আড্ডা দিয়ে দিয়ে। জীবনের বেশ একটা ভগ্নাংশ আড্ডা দিয়েই কেটেছিল। যেখানে যখন গেছি এবং থেকেছি, আড্ডার পথ খুঁজে নিতে অসুবিধা হয় নি; অনেক সময়ে আড্ডাই আমাকে পথ দেখিয়ে যথাস্থানে নিয়ে গেছে। এর একটা কারণও ছিল। সঙ্গীত এবং সাহিত্য বিষয়ে সামান্য যে একটু অধিকার ছিল, তাই আমাকে আড্ডার প্রবেশপত্র জুটিয়ে দিত। আমার মনে হ'ত, মাত্র তিসি-গম-যব কেনা-বেচার কাজে যারা আত্মনিয়োগ করতে চায় না; সাহিত্য, সঙ্গীত এবং শিল্পকলার দ্বারা নন্দিত সুন্দরতর এবং সূক্ষ্মতর জীবনের সহিত যারা যোগসূত্র অবিচ্ছিন্ন রেখে চলতে চায়, তাদের পক্ষে আড্ডা দেওয়া অপরিহার্য।

ফণীবাবুর বৈঠকখানা-বাড়ির একটি বড় ঘরে দু-তিন দিন অন্তর বসত আমাদের পূর্ণাঙ্গ আড্ডা। অপর একটি ঘরে চলত 'যমুনা' পত্রিকার কাজকর্ম।

আমাদের পাড়ায় ফণীবাবুরা বাড়ি ভাড়া নিয়ে আসার পর ফণীবাবুর সঙ্গে আমার পরিচয় হ'ল ঘনিষ্ঠ। তখন অভাব-অসুবিধার উভয়কূলব্যাপী বালুকারাশির মধ্যে 'যমুনা' নিতান্তই শীর্ণকায়া। গ্রাহক-সংখ্যা শ' দুই-আড়ায়ের বেশি নয়, নগদ বিক্রয় তদপেক্ষাও কম। কার্তিক মাসের পূজার সংখ্যা বাজারে নামে পৌষ মাসে, তাতে পূজার সময়ের উপযোগী জিনিসপত্রের বিজ্ঞাপন; বিজ্ঞাপনদাতারা অসময়ে প্রকাশিত নিষ্ফল বিজ্ঞাপনের বিল শোধ করতে চায় না। সাধারণ নিয়মিত বিজ্ঞাপন

অতি সামান্য যা আছে, তার মূল্যের অর্ধেকও আদায় হয় না। অনিয়মিত প্রকাশের জন্য অসন্তুষ্ট গ্রাহকেরা কাগজ ছেড়ে দেবার ভয় দেখায়। বিনা পয়সার কম্‌প্লিমেণ্টারি কাগজ প্রতি মাসে বোধ হয় শ' দেড়েক-দুই বিতরিত হয়। ডাকে যা যাবার তা ত যায়ই, অধিকন্তু বাড়িতে যে আসে সে-ই একখানা ক'রে সদ্যপ্রকাশিত 'যমুনা' হাতে নিয়ে যায়। কেউ আশ্বিন মাসের কাগজ চাইলে দারুণ চক্ষুলজ্জাগ্রস্ত ফণীবাবু জিজ্ঞাসা করেন, ভাদ্র মাসের কাগজ পেয়েছিলেন ত? নগদ বিক্রয়ের হকারদের কাছে মাসে মাসে বকেয়ার তায়দাদ স্ফীততর হচ্ছে। চতুর্দিকে বিশৃঙ্খলা, অব্যবস্থা; শান্তি সন্তুষ্টি কোনো দিকেই দেখা যায় না, একমাত্র বিনা-পয়সার খদ্দেরদের দিক ছাড়া।

প্রতিদিনই 'যমুনা'র অফিস-ঘরে ক্ষণকালের জন্য এক-আধবার এসে বসি। দৃষ্টিশক্তির প্রশংসা করছি নে, কিন্তু যে অযত্ন, যে অনিষ্ঠা পলে পলে ব্যবসায়কে বিনষ্টির দিকে টেনে নিয়ে যায়, ফণীবাবুর 'যমুনা' পরিচালনার মধ্যে তার অস্তিত্ব চোখে পড়তে লাগল। মনে মনে অস্বস্তি বোধ করি; কিন্তু নূতন পরিচয়, কিছু বলতেও কুণ্ঠিত হই।

একদিন সহসা একটা সুযোগ উপস্থিত হ'ল। সকালবেলা 'যমুনা'র অফিস-ঘরে ব'সে ফণীবাবুর সহিত আলাপ-আলোচনায় রত আছি, এমন সময়ে একটি লোক উপস্থিত হ'য়ে একখানা চিঠি ও কিছু অর্থ টেবিলের উপর স্থাপন করলে। চিঠি প'ড়ে রসিদ-বই বার ক'রে চিঠির সঙ্গে মিলিয়ে রসিদ লিখে দিয়ে ফণীবাবু লোকটিকে বিদায় করলেন। তারপর আমার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে স্মিতমুখে বললেন, "ওঃ! অনেক কষ্টে অনেক তাগাদা দিয়ে শেষ পর্যন্ত আদায় করা গেছে।"

জিজ্ঞাসা করলাম, "কিসের টাকা?"

"যমুনা'র এক বৎসরের চাঁদার। কাগজ পেতে দেরি হ'লে ভদ্রলোক

তাগাদার চোটে অস্থির ক'রে মারে, কিন্তু চাঁদার জন্যে তাগাদা করলে সাড়া-শব্দ দেয় না।"

মনে মনে বললাম, আমি হ'লে আমিও দিতাম না; প্রকাশ্যে জিজ্ঞাসা করলাম, "ফণীবাবু, আপনার সাব্‌স্ক্রাইবার বুক আছে ত?"

সহাস্য মুখে ফণীবাবু বললেন, "সাব্‌স্ক্রাইবার বুক না থাকলে কখনো চলে? নিশ্চয় আছে।"

"তবে তার সঙ্গে মিলিয়ে না দেখে রসিদ দিলেন যে?"

মাথা নেড়ে ফণীবাবু বললেন, "না না,—ও ঠিক আছে। ও বিষয়ে গোলমাল হবে না।"

উত্তরে খুশি হ'তে পারলাম না। গোলমাল হবে না, সে বিশ্বাস মনে মনে থাকলেও মিলিয়ে নেওয়া যে ব্যবসা-বাণিজ্যের একটা অপরিহার্য সবল নীতি, সে বিষয়েও তর্ক তুললাম না। কিন্তু মিনিট দুয়েকের মধ্যে যে অবস্থার উদ্ভব হ'ল, তাতে প্রতিবাদ না ক'রেও থাকতে পারা গেল না।

একজন চাকর এসে সংসারের কয়েকটা খুচরা জিনিস ক্রয় করবার জন্যে ফণীবাবুর কাছে কিছু পয়সা চাইলে।

চাকরের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে ফণীবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "কত চাই তোর?"

চাকর বললে, "আনা বারো দিন।"

সামনে 'যমুনা'র যে চাঁদা রাখা ছিল, তা থেকে একটা টাকা চাকরের হাতে দিয়ে ফণীবাবু বললেন, "যে পয়সা ফিরবে আমাকে দিয়ে যাস।" তারপর বাকি অর্থটা দেরাজের মধ্যে ফেলে আমার সঙ্গে কথা আরম্ভ করলেন।

আমি বললাম, "মাপ করবেন ফণীবাবু, এই যে 'যমুনা'র তবিল থেকে একটা টাকা সংসার-খরচে দিলেন, পরে মোকাবিলা হবে ত ?"

ফণীবাবু বললেন, "হওয়াই তা উচিত ; কিন্তু কখনো হয়, কখনো হ'য়ে ওঠে না। সংসারের তবিল থেকে 'যমুনা'য় যে-টাকা দিই, তারই কি সব সময়ে মোকাবিলা হয় ?"

বললাম, "কিন্তু তবিলে তবিলে এ রকম অসঙ্গত জড়াজড়ি ত ভাল কথা নয়। এর দ্বারা উভয় ব্যাপারেরই পরিচালনার বিষয়ে অসুবিধার সৃষ্টি হয়। অবশ্য, সংসার আর 'যমুনা' দুই-ই আপনার নিজের বটে ; কিন্তু সংসার আপনার যতটা নিজস্ব, 'যমুনা' ততটা নয়। 'যমুনা'র বিষয়ে বাইরের লোকের কাছে আপনার জবাবদিহি আছে। 'যমুনা'র গ্রাহক আর বিজ্ঞাপনদাতারা আপনাকে অর্থ দেয় এই বিশ্বাসে যে, 'যমুনা'র সুপরিচালনার দ্বারা সেই অর্থের পরিপূর্ণ বিনিময় আপনি তাদের ফিরিয়ে দেবেন। আর, তবিলের বিষয়ে অত্যন্ত সতর্ক না হ'লে সুপরিচালনা যে সম্ভব নয়, এ কথা ত আপনি নিশ্চয়ই জানেন।"

কথায় কথায় সেদিন অনেক কথাই উঠল। আমার সুস্পষ্ট মন্তব্য সব সময়ে হয়ত ফণীবাবুর তেমন ভাল লাগে নি, কিন্তু যা কিছু আমি বলেছিলাম, সবই যে তাঁর হিতার্থেই বলেছিলাম, এ কথা বুঝতে তাঁর বাকি ছিল না। এক সময় তিনি দুঃখার্ত কণ্ঠে বললেন, "কিছু ভাল লাগে না উপেনবাবু। প্রতি মাসে লোকসান খেতে হচ্ছে, কি ক'রে কত দিনে যে সামলে উঠব, কিছুই বুঝতে পারি নে।"

আমি বললাম, "লোকসান খেতে হচ্ছে, কে আপনাকে তা বললে ?"

সবিস্ময়ে ফণীবাবু বললেন, "কে আবার বলবে ? আমি নিজেই ত তা বুঝতে পারি।"

বললাম, "আপনি নিজে হয়ত বুঝতে পারেন, কিন্তু অপরে বুঝবে

না। অপরে 'যমুনা'র আয়-ব্যয়ের খতিয়ান দেখতে চাইবে। সন্ধ্যার দিকে আপনার অল্প অল্প জ্বর হয়, আপনি নিজে তা বুঝতে পারেন; কবিরাজকে তা বুঝতে হ'লে সন্ধ্যার সময়ে সে এসে আপনার নাড়ী টিপে দেখবে। আছে আপনার আয়-ব্যয়ের খতিয়ান?"

অত অব্যবস্থার মধ্যে, যেখানে খরচ আছে ত খাতা নেই, খাতা আছে ত জমা নেই, সেখানে খতিয়ান যে ছিল না, তদ্বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ ছিলাম। উত্তর দেবার কিছু না পেয়ে নিরুপায় বিমূঢ়তায় ফণীবাবু আমার দিকে নির্বাক হ'য়ে চেয়ে রইলেন।

ভারি মমতা হ'ল এই ঢিলা-প্রকৃতির কাজেহারা ভালমানুষটির জন্য। যার হাড়ের মধ্যে ব্যবসার ভেলকি খেলে না, সে কেন লিপ্ত হয় এমন দুঃসাধ্য কাজের অধিকার চর্চায়! আইন পরীক্ষা দিয়ে ব'সে আছি, ১৯১৩ সালের প্রারম্ভ থেকে ভাগলপুরে গিয়ে ওকালতি আরম্ভ করব। মনে করলাম, যতদিন সম্ভব 'নেই কাজ ত খই ভাজ' নীতি অনুসরণ ক'রে একটু বন্ধুকৃত্যই করা যাক। সামান্য মানুষের সামান্য ক্ষমতার প্রচেষ্টায় ফণীবাবুর তেমন কোন উপকার না হোক, নিজের ত কিছু হবে। ধীরে ধীরে 'যমুনা'র সেবায় আত্মনিয়োগ করলাম।

ব্যবসার দিকে ফণীবাবুকে একটু সুযোগ এবং সময় ক'রে দেবার উদ্দেশ্যে প্রুফ দেখার প্রায় সব কাজটাই নিজের হাতে নিলাম; প্রবন্ধ পাঠ এবং বিষয় নির্বাচনও করতে লাগলাম। 'যমুনা'র জন্য নিজে লিখতে প্রবৃত্ত হলাম, অপরের লেখাও সংগ্রহ করতে লাগলাম; এমন কি, সময় এবং সুযোগ মতো ব্যবসায় পরিচালনার কাযেও ফণীবাবুকে কিছু কিছু সাহায্য করতে শুরু করলাম। লেবেলের উপর গ্রাহকদের নাম ও ঠিকানা লিখি, ভি. পি.র ফর্‌ম্ পূরণ করি, অভিযোগ-পত্রাবলীর উত্তর রচনা ক'রে দিই। এমন কি, বাড়িতে আত্মীয়-বন্ধুবান্ধব এলে

পীড়াপীড়ি ক'রে কাউকে কাউকে 'যমুনা'র গ্রাহক ক'রেও নিই। মনের মধ্যে আনন্দ ও পরিতৃপ্তির ভারি এক সুমিষ্ট রস অনুভব করতে লাগলাম।

নিঃস্বার্থ পরোপকারের দ্বারা আত্মার একটু উন্নতি সাধন করবার সঙ্কল্প ছিল, কিন্তু অযথা কৃতজ্ঞতাপীড়িত ফণীবাবু তার পরিপন্থী হ'য়ে উঠলেন। সন্ধ্যার পর 'যমুনা' অফিসে গিয়ে বসলে চায়ের ছলে তিনি নোন্‌তা এবং মিষ্ট স্বাদবিশিষ্ট স্বার্থের এমন বিরাট স্তূপের আয়োজন করতে লাগলেন যে, তার উপর হোঁচট খেয়ে নিঃস্বার্থপরতা বেচারা মারা যাবার দাখিল হ'ল। মনকে কিছুতেই আর নিঃস্বার্থ পরোপকারের মহিমান্বিত উচ্চতায় তুলে রাখা যায় না।

একদিন বললাম, "যে রকম ব্যাপার আপনি লাগিয়েছেন ফণীবাবু, লাভের গুড় পিঁপড়েয় খেয়ে যাবে।"

উচ্ছ্বসিত স্বরে ফণীবাবু বললেন, "তা যাক। আপনার মতো পিঁপড়ে লাভের গুড় খেয়ে গেলে আমি দুঃখিত নই। যে রকম অন্তর দিয়ে আপনি..." ইত্যাদি ইত্যাদি।

'অন্তর দিয়ে'—সে কথা বোধ করি নিতান্ত মিছে নয়। আর, তারই পুণ্যে বোধ হয় ভাগ্যদেবতা কিছু প্রসন্ন হয়েছেন ব'লে মনে হয়। অনুযোগের চিঠিপত্র হ্রাস পেয়েছে, প্রকাশ-তারিখের ক্রমোন্নতি লক্ষ্য ক'রে গ্রাহকেরা সন্তুষ্ট হ'তে আরম্ভ করেছে, জমার খাতায় জমা এবং খরচের খাতায় খরচ দিনের দিন যথানিয়মে স্থান পাচ্ছে এবং সবচেয়ে বড় কথা, সর্বত্র একটা যেন শৃঙ্খলা এবং নিয়মানুবর্তিতার আরাম দেখা দিতে আরম্ভ করেছে। মাস তিন-চার পূর্বের অশান্তি এবং অসন্তোষের কর্কশ শব্দ বেশ খানিকটা ক্ষীণ হ'য়ে এসেছে।

'যমুনা'র যখন এই অবস্থা, সেই মাহেন্দ্রক্ষণে কলিকাতায় শরৎচন্দ্রের উদয়।

'যমুনা'র পরিবর্তে 'সাহিত্যে'র ন্যায় খ্যাতনামা মাসিকপত্রে 'চরিত্রহীন' প্রকাশিত হ'লে শরৎচন্দ্রের স্বার্থে আমি নিশ্চয়ই অধিকতর খুশি হতাম, কিন্তু সুরেশ সমাজপতি 'চরিত্রহীন' প্রকাশ না করার সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করা মাত্র 'যমুনা'র কথা মনে ক'রে আমি উৎসাহিত হ'য়ে উঠেছিলাম। মনে হয়েছিল, তবে বুঝি 'যমুনা'য় সৌভাগ্যের বান একান্তই দেখা দিলে।

ডালহৌসির ট্রামে শরৎকে তুলে দিয়ে ঘণ্টাখানেক পরে যখন বাড়ি পৌছলাম, তখন ক্লান্তি এবং ক্ষুৎ-পিপাসায় দেহ অবসন্ন। মুখ-হাত ধুয়ে দু পেয়ালা চা এবং তদুপযুক্ত খাবার উদরসাৎ ক'রে অবিলম্বে 'যমুনা' অফিসে উপস্থিত হলাম।

চেয়ারে ব'সে টেবিলের উপর ঝুঁকে প'ড়ে ফণীবাবু প্রুফ দেখছিলেন। পদশব্দে মুখ তুলে আমাকে দেখতে পেয়ে ব্যগ্রকণ্ঠে বললেন, "কি উপেনবাবু, সমস্ত দিন কোথায় ছিলেন? দুবার আপনার বাড়ি গিয়ে দেখা পাই নি।"

বললাম, "দেখা যে পান নি, তাতে 'যমুনা'র কোনো ক্ষতি হয় নি, বোধ হয় খুব বড় রকমের মঙ্গলই হয়েছে।"

সকৌতূহলে ফণীবাবু বললেন, "কি ব্যাপার বলুন ত?

"শরৎ কলকাতায় এসেছে।"

"কে শরৎ?"

শরতের কথা ফণীবাবু আমার মুখে বহুবার শুনেছেন, মায় 'ভারতী'তে 'বড়দিদি'র প্রকাশ এবং তৎসংক্রান্ত রবীন্দ্রনাথ ও শৈলেশ মজুমদারের কাহিনী পর্যন্ত। বললাম, "শরৎ মানে—'বড়দিদি'র লেখক শরৎচন্দ্রের চট্টোপাধ্যায়। বর্মা থেকে এক বহুমূল্য রত্ন নিয়ে হাজির হয়েছে।"

যৎপরোনাস্তি উৎসুক হ'য়ে ফণীবাবু বললেন, "সে রত্ন কি কলম দিয়ে লেখা রত্ন ?"

বললাম, "অতিশয় শক্তিশালী কলম দিয়ে লেখা।"

তারপর শরতের প্রথম দিন আমাদের বাড়ি বিনা-নোটিশে আসা থেকে আরম্ভ ক'রে সেদিন বৈকালে বউবাজার স্ট্রীটের মোড়ে ছাড়াছাড়ি পর্যন্ত আনুপূর্বিক সমস্ত কাহিনী সবিস্তারে বিবৃত করলাম।

টেবিলের অপর দিক থেকে দু হাত বাড়িয়ে আমার ডান হাত চেপে ধ'রে ফণীবাবু ডাকলেন, "উপেনবাবু!"

স্মিতমুখে বললাম, "কি ব্যাপার ?"

"আমাকে 'চরিত্রহীন' যোগাড় ক'রে দিন,—আমি আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকব।"

বললাম, "তা না থাকলেও চলবে। কিন্তু পেলে ছাপবেন ত ?"

"একশ বার।"

"সুরেশ সমাজপতি কিন্তু সাহস পান নি।"

ঈষৎ উচ্ছ্বাসের সহিত ফণীবাবু বললেন, "সবাই সুরেশ সমাজপতির মতো ভীতু নয়।"

"কিন্তু সুরেশ সমাজপতির ভয়ের কারণ যদি সত্যি হয় ?—'যমুনা' যদি উঠে যায় ?"

"তা হ'লে সাহিত্যের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে কাঁধে কাপড়ের বোঝা ঝুলিয়ে আর হাতে লোহার গজ নিয়ে কলকাতার পথে পথে ফেরি ক'রে বেড়াব।"

খুশি হ'য়ে বললাম, "সাবাস! কিন্তু শুনুন, কাল বিকেল চারটের সময়ে শরৎ আমাদের বাড়ি আসবে। আমি খবর দিলে আপনি গিয়ে তাকে এখানে ধ'রে নিয়ে আসবেন। তারপর আপনার এই

'যমুনা'র বৈঠক তাকে যাতে আকৃষ্ট করতে পারে, তার চেষ্টা দেখতে হবে।"

দীর্ঘকাল ধ'রে নানাপ্রকার কল্পনা-জল্পনার পর যখন বাড়ি ফিরলাম, তখন রাত্রি নটা বেজে গেছে।

২৪

পরদিন যথাসময়েই, অর্থাৎ বৈকাল প্রায় চারটের সময়ে, শরৎ আমাদের বাড়ি উপস্থিত হ'ল। এবার কথাটা পরিপূর্ণভাবে রাখার জন্য খুশি হ'য়ে তাকে ধন্যবাদ দিলাম।

আসন গ্রহণ করা মাত্র শরৎ বললে, "কই, তোমার চারাগাছ কোথায় দেখাও।"

কথাটা ভুলে গিয়েছিলাম; বললাম, "কোন্ চারাগাছ?"

"যা আমাকে মহীরুহে পরিণত করতে হবে ব'লে কাল বলেছিলে?"

সহাস্যে বললাম, "ও, দেখাচ্ছি। আগে চা-খাবার খাও। চল, ভেতরে চল।"

প্রবলভাবে মাথা নেড়ে শরৎ বললে, "না উপীন, ভেতরে আমি কিছুতেই যাব না। বোম-মামাকে (লালমোহন গঙ্গোপাধ্যায়) না জানিয়ে, তাঁর অনুমতি না নিয়ে এই বাড়ি থেকে একদিন রেঙ্গুন পালিয়েছিলাম। আমার মুখ দেখাবার উপায় নেই।"

বললাম, "সে কাজ আট-দশ বৎসরের কথা হ'ল, কারো সে কথা মনে নেই। থাকলেও, সে কথা তুলে কেউ তোমাকে ধমক দেবে না। তা ছাড়া, দাদা এখনো হাইকোর্ট থেকে ফেরেন নি।"

আমার আশ্বাসে এবং অনুরোধে শেষ পর্যন্ত শরৎ অন্দর মহলে প্রবেশ করিতে বাধ্য হ'ল। দ্বিতলে আমার নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে তাকে বসালাম।

শরৎ আজ বৈকালে আসবে, সে কথা বাড়িতে সকলেরই জানা ছিল।

একে একে সকলে এসে জুটতে লাগল। দেখতে দেখতে গল্প উঠল জ'মে। ক্ষণকাল পরে যখন চা ও খাবার উপস্থিত হ'ল, তখন গল্প বলবার গুণে মগের মুল্লুকের আজব কাহিনী তার ইন্দ্রজাল বিস্তার ক'রে বসেছে। ইত্যবসরে আমি ফণীবাবুর কাছে শরতের আসার সংবাদ পাঠিয়ে আধ ঘণ্টাটাক পরে তাঁকে আসতে বলেছিলাম। আমাদের চা পান শেষ হবার কিছু পরেই তিনি এসে হাজির হলেন। শরৎকে নিয়ে একতলার বৈঠকখানা-ঘরে প্রবেশ করলাম।

একটা চেয়ারে ফণীবাবু ব'সে ছিলেন,—আমাদের দুজনকে প্রবেশ করতে দেখে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে যুক্তকরে শরৎকে নমস্কার করলেন। প্রতিনমস্কার ক'রে আমার দিকে চেয়ে শরৎ জিজ্ঞাসা করলে, "ইনি?"

বললাম, "ইনি আমার বন্ধু ফণীন্দ্রনাথ পাল, তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছেন।"

"কোথায়?"

"ওঁর বাড়ি।"

ঈষৎ বিস্মিত কণ্ঠে শরৎ বললে, "সেখানে কি হবে?"

স্মিতমুখে বললাম, "সেখানে তোমাকে ওঁর সেই চারাগাছটি দেখাবেন, যেটিকে তোমায় মহীরুহে পরিণত করতে হবে।"

উকিল যখন হাকিমের নিকট আবেদন-নিবেদন করে, তখন আবেদনকারী যেমন সাগ্রহে হাকিমের মুখের দিকে চেয়ে থাকে, ঠিক সেই ভাবে ফণীবাবু এ পর্যন্ত নিঃশব্দস্মিতমুখে শরতের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ভাবটা, উপেনবাবুর মুখে যা-কিছু শুনছেন, সব আমারই অন্তরের কথা। এবার কিন্তু মৌন পরিত্যাগ ক'রে বললেন, "শুধু আমার চারাগাছ বলছেন কেন উপেনবাবু?—সে ত আপনারও চারাগাছ!"

আমাকে কোনো কথা বলবার সময় না দিয়ে ফণীবাবুর প্রতি তীক্ষ্ণ

দৃষ্টিপাত ক'রে সবিস্ময়ে শরৎ বললে, "কাল থেকে চারাগাছ চারাগাছ শুনছি,—ব্যাপার কি বলুন ত মশায়?—কিসের চারাগাছ?"

মনে মনে এক মুহূর্ত কি চিন্তা ক'রে ফণীবাবু বললেন, "আপনার জন্যে চারাগাছ অফিস-ঘরে টেবিলের উপর সাজিয়ে রেখে এসেছি, দেখবেন চলুন।"

সবিস্ময়ে শরৎ বললে, "আমার জন্যে সাজিয়ে রেখে এসেছেন? দেবেন না-কি আমাকে?"

হাসিমুখে ফণীবাবু বললেন, "নিশ্চয় দেবো। ট্রামে তুলে দিয়ে আসব।"

"কত দূরে আপনার বাড়ি?"

"রাস্তার ও-পারে।"

আর কোনো প্রশ্ন না ক'রে শরৎ অগ্রসর হ'ল। পথে নেমে শুধু একবার জিজ্ঞাসা করলে, "কোন্ বাড়িটা?"

পথের অপর পার্শ্বে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের মোড়ের বাড়িটা দেখিয়ে ফণীবাবু বললেন, "ঐ সাদা রঙের বাড়ি।"

আর বাক্যব্যয় না ক'রে হনহন ক'রে শরৎ ফণীবাবুর বাড়ির দিকে এগিয়ে চলল; আমরা তাকে দ্রুতগতিতে অনুসরণ করলাম। দ্বারদেশে পৌঁছে তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে ফণীবাবু শরৎকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চললেন। অফিস-ঘরে টেবিলের সম্মুখে উপনীত হ'য়ে বললেন, "বসুন।"

অফিস-ঘর আজ গুছিয়ে-গাছিয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা হয়েছে। সকালের দিকে ঝুল ঝাড়াও হয়ত হ'য়ে থাকবে। প্রতিদিন টেবিলের উপর এলোমেলো কাগজ-পত্রের যে বন-বাদাড় দেখা যায়, তা সমূলে উৎপাটিত হ'য়ে অপসারিত হয়েছে চক্ষুর অন্তরালে কোন গোপন স্থানে।

টেবিলের উপরিভাগ তক্‌তকে ঝক্‌ঝকে। শুধু কোণের দিকে ফুলদানিতে একটা পুষ্পগুচ্ছ, এবং মধ্যস্থলে পরিপাটি ক'রে বাঁধা এক থাক্ 'যমুনা' মাসিক পত্রিকা। উপরে দড়ির তলায় একটা সাদা কাগজে লেখা,—"পরম শ্রদ্ধার সহিত ভবিষ্যৎ বাংলার শক্তিমান ঔপন্যাসিক শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের করকমলে উৎসর্গ করিলাম। স্নেহাকাঙ্ক্ষী শ্রীফণীন্দ্রনাথ পাল।"

টেবিলের সম্মুখের প্রধান আসনটি দেখিয়ে ফণীবাবু বললেন, "বসুন শরৎবাবু।" সেই চেয়ারটির উপরে পশমের একটি সুদৃশ্য পুরু আসন পাতা। তার উপরে উৎকীর্ণ লাল রঙের ফুলগুলি যেন মান্য অতিথিকে প্রসন্ন অভ্যর্থনা জানাচ্ছে।

চেয়ারের উপর ধীরে ধীরে উপবেশন ক'রে শরৎ প্রথমে সাদা কাগজের উপরকার লেখাটুকু পাঠ করলে; তারপর বাঁধন খুলে 'যমুনা'গুলো একে একে নিবিষ্টচিত্তে বহুক্ষণ ধ'রে পর্যবেক্ষণ ক'রে বললে, "এই তোমাদের চারাগাছ?"

বললাম, "হ্যাঁ, এই আমাদের চারাগাছ,—একে তোমায় বড় করতে হবে শরৎ।" তারপর, একজন নিরীহ অব্যবসায়ী ভালমানুষ নিছক সাহিত্যের নেশায় প'ড়ে সেই নেশার ব্যবসায়ের দিকটা নিয়ে কিরূপ বিব্রত এবং ক্ষতিগ্রস্ত হ'য়ে চলেছে, তার একটা সুস্পষ্ট বিবরণ দিয়ে বললাম, "যে-সব কাগজ বড়লোকের কাগজ, পাকা বিষয়-বুদ্ধির প্রভাবে যারা সুদৃঢ় ব্যবসায়-ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, কি হবে তাদের তেলা মাথায় তেল ঢেলে? বিপন্নকে নিরাপদ ক'রে তোলবার যে আনন্দ, সেই আনন্দ লাভ করবার সুযোগ তোমার সম্মুখে উপস্থিত; সে সুযোগকে অবহেলা ক'রো না শরৎ।"

আমার আবেগময় আবেদন শরতের উপর খানিকটা কাজ করেছে

ব'লে মনে হ'ল; ঈষৎ গভীর কণ্ঠে সে বললে, "তা না-হয় নাই করলাম; কিন্তু সে আনন্দ লাভ করবার শক্তি কোথায় আমার উপীন?"

বললাম, "শক্তি তোমার কলমের মুখে। তুমি যদি দয়া ক'রে তোমার 'চরিত্রহীন' 'যমুনা'য় প্রকাশ করবার অনুমতি দাও, সে শক্তির পরিচয় লাভ করতে তোমার অসুবিধে হবে না।"

শরৎ বললে, "আমার অসুবিধে হবে কি-না, তা জানি নে; কিন্তু ফণীবাবুর হবে। 'চরিত্রহীন' 'যমুনা'য় প্রকাশিত হ'লে তাঁর সামান্য যা গ্রাহক আছে, একে একে 'যমুনা' ছেড়ে দেবে। কাল শুনলে ত সুরেশ সমাজপতির কথা?"

বললাম, "সে কথা ফণীবাবুকে বলেছি। 'চরিত্রহীনে'র কাহিনীও যতটুকু পড়েছি, তা শুনিয়েছি। সব শুনে উনি কি বলেছেন জানো?"

"কি বলেছেন?"

"বলেছেন, 'চরিত্রহীন' প্রকাশিত হওয়ার ফলে 'যমুনা' যদি উঠে যায়, তা হ'লে সাহিত্যের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে কাপড়ের বোঝা কাঁধে ফেলে পথে পথে ফেরি ক'রে বেড়াবেন।"

ফণীবাবুর প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে শরৎ বললে, "অর্থ যদি আপনার কাম্য হয় ফণীবাবু, তা হ'লে 'চরিত্রহীন' প্রকাশিত হ'য়ে 'যমুনা' উঠে যাওয়াই ভাল। কাঁধে কাপড়ের বোঝা ফেলে পথে পথে ফেরি ক'রে বেড়ানো আর্থোপার্জনের একটা ভাল উপায়। অনেক কোটিপতির জীবনের প্রথম দিককার ইতিহাস ঐ রকমই।"

আড্ডা দেওয়ার বড় ঘরে ফণীবাবু আমাদের নিয়ে গিয়ে বসালেন। আমরা সেখানে উপস্থিত হওয়ামাত্র তিন প্রস্থ চা ও দুই প্রস্থ খাবার এল—ধূমায়িত সুগন্ধ চা এবং প্রচুর উৎকৃষ্ট খাবার।

খাবার দেখে শরৎ লাফিয়ে উঠল; বললে, "আমার বাড়িতে যে

খাবার খেয়ে এসেছি, তাই হজম করতে এখনো অনেক দেরি। তার ওপর লোভে প'ড়ে অথবা ভদ্রতার খাতিরে এর সামান্য অংশও যদি খাই, তা হ'লে বাড়ি ফিরে গিয়ে আর একটি দানাও মুখে তোলা যাবে না। চা থাক্, খাবার ফেরত দিন।"

বোধ করি, আসন্ন ভবিষ্যতের কথা ভেবেই আর দ্বিরুক্তি না ক'রে ফণীবাবু দুই প্লেট খাবার ফেরত পাঠিয়ে দিলেন। পীড়াপীড়ি ক'রে খাওয়াবার চেষ্টা করলেন না।

আলাপ-আলোচনায়, হাস্য-কৌতুকে, কল্পনা-জল্পনায় আড্ডা দেখতে দেখতে জ'মে উঠল। এমন কি, শেষ পর্যন্ত সঙ্গীতও বাদ পড়ল না। ফণীবাবু জোর ক'রে আমাকে দিয়ে গোটা দুই গান গাওয়ালেন; আমিও শরৎকে পীড়াপীড়ি ক'রে একখানা গাওয়ালাম। আমি সেদিন কি গেয়েছিলাম তা মনে পড়ে না, কিন্তু শরৎ গেয়েছিল নিধুবাবুর প্রসিদ্ধ টপ্পা 'তোমারই তুলনা তুমি এ মহীমণ্ডলে।'—সে কথা স্পষ্ট মনে আছে। শরতের সঙ্গীতের কণ্ঠস্বর ছিল সুরেলা, মিহি, সুমিষ্ট; কতকটা মেয়েলী ধরনের। গিটকিরি ও মিড়ের অলঙ্কারের দ্বারা তার কণ্ঠস্বর ছিল সমৃদ্ধ।

ডাক পড়ল অন্দর মহলে।

সকৌতূহলে শরৎ জিজ্ঞাসা করলে, "সেখানে আবার কি হবে ফণীবাবু?"

মৃদু হাস্যের সহিত ফণীবাবু বললেন, "মা সামান্য আয়োজন করেছেন আপনার জন্যে।"

"কিসের আয়োজন?"

আমার দিকে একবার তাকিয়ে দেখে অপ্রতিভ স্মিত মুখে শরতের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে ফণীবাবু বললেন, "সামান্য একটু খাওয়ার।"

শরৎ বললে, "খাবার ত একটু আগে ফেরত দিলাম। আবার খাওয়ার কথা তুলছেন কেন?"

ফণীবাবু বললেন, "সে ত অনেক আগে চারটের সময়ে উপেনবাবুর বাড়ি খেয়েছেন, এখন আটটা বেজে গেছে।"

আমি বললাম, "ডাক যখন মা'র, তখন ফণীবাবুর সঙ্গে তর্ক ক'রে কোনো ফল নেই। চল, সেরে আসা যাক। তোমাকে আবার অনেক দূরে যেতে হবে।"

ভিতরে গিয়ে দেখা গেল, পাশাপাশি তিনখানা পাত পড়েছে, পরিপূর্ণ আয়োজন,—একেবারে দস্তুরমতো নৈশ ভোজনের ব্যবস্থা। মাছ মাংস ডিম চাটনি মিষ্টান্ন দধি—কিছুরই অভাব নেই। চায়ের সহিত কিছু পূর্বে যে-খাদ্য এসেছিল, পীড়াপীড়ি ক'রে ফণীবাবু কেন তা আমাদের খাওয়ান নি, সে কথা আর অস্পষ্ট রইল না। গৌণের দ্বারা অগৌণকে তিনি নষ্ট হ'তে দেন নি। অন্তরাল হ'তে পুরমহিলাগণের অদৃশ্য কিন্তু অনজ্ঞেয় যত্ন ও তত্ত্বাবধানের ফলে সাধ্যাতিরিক্ত আহার সমাপন ক'রে পুনরায় বৈঠকখানায় এসে আমরা বসলাম। সঙ্গে সঙ্গে একজন ভৃত্য শরতের সম্মুখে একটা আলবোলা স্থাপন ক'রে নলটা তার হাতে দিয়ে গেল। মূল্যবান অম্বুরী তামাকের সুমিষ্ট সৌরভে আমার মতো অতাম্রকূটসেবীও উৎফুল্ল হ'য়ে উঠল। মনে হ'ল, মাথা ঘোরে ঘুরবে, এই সুযোগে দু-চার টান দিয়ে দেখলে মন্দ হয় না।

একটা তাকিয়ায় হেলান দিয়ে শরৎ অর্ধশায়িতভাবে অবস্থান করছিল। আলবোলার নল হাতে পেয়ে আনন্দিত হ'য়ে ন'ড়ে-চ'ড়ে একটু খাড়া হ'য়ে উঠে প্রসন্নমুখে বললে, "এতখানি ব্যবস্থাও ক'রে রেখেছেন ফণীবাবু? নাঃ! আপনাকে আর কোনমতেই সামলাতে পারা গেল না দেখছি!"

ফণীবাবুর প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে আমি বললাম, "তৎপর হোন ফণীবাবু, শুভ কের প্রসাদে আপনার মাহেন্দ্রক্ষণ উপস্থিত। এই সময়ে 'চরিত্রহীনে'র অনুমতি আদায় ক'রে নিন।"

এ কথার উত্তরে ফণীবাবু মৃদুস্বরে শুধু একটু হাসলেন; তা ছাড়া আর কিছুই করলেন না। কপট বিরক্তির সুরে বললাম, "তখন থেকে শুধু আমিই উপরোধ-অনুরোধ করছি, আপনি বিশেষ কিছুই বলছেন না। শরৎ হয়ত মনে করছে, যার বিয়ে তার মনে নেই, পাড়া-পড়শীর ঘুম নেই।"

মুদিত নেত্রে শরৎ আলবোলা টানছিল, চোখ খুলে বললে, "উকিল যখন মক্কেলের হ'য়ে কথা কয়, তখন অমন কথা কেউ মনে করে না উপীন। তা ছাড়া শুধু কি মানুষের সরব ভাষাই কথা কয়?"

সে কথা সত্যি। ফণীবাবুর মুখ-চক্ষের নিঃশব্দ হাসির মধ্যে এমন একটা আন্তরিকতার ছাপ, যা শরতের মতো বুদ্ধিমান লোকের পক্ষে ত কথাই নেই, যে-কোনো লোকের পক্ষে ভুল করা কঠিন। বললাম, "তা হ'লে অনুমতি দিচ্ছ ত?"

"যদি তোমাদের ইচ্ছে হয়, যদি ভয় না পাও, তা হ'লে ছেপো।"

"একেবারে ঠিক কথা ত?"

শরৎ বললে, "মানুষে নেশার জিনিস হাতে ক'রে কখনো বেঠিক কথা বলে না।"

শরতের কথায় আমি ও ফণীবাবু উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠলাম।

আরও কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর আলবোলায় দু-চারটে বড় বড় টান দিয়ে শরৎ উঠে পড়ল। বললে, "আর দেরি করলে ওপারে হয়ত ট্রাম পাব না।"

ফণীবাবু বললেন, "কাল আসছেন ত এখানে?"

সবিস্ময়ে শরৎ বললে, "কি আশ্চর্য। আজ এতক্ষণ আড্ডা দিয়ে গিয়ে আবার কাল? তা ছাড়া, খাওয়া-দাওয়ার এ রকম হাঙ্গামা করলে আর কোনো দিনই আসব না।"

হাসিমুখে ফণীবাবু বললেন, "আচ্ছা, সে না-হয় কিছু কম ক'রে করলেই হবে। রেঙ্গুন যাওয়ার আগে যে-কদিন কলকাতায় আছেন, এখানে এসে বসলেই ভাল হয়। আজ ত 'যমুনা' সম্বন্ধে আপনার কোনো উপদেশ, কোনো পরামর্শই নেওয়া গেল না। এবার যেদিন আসবেন, 'যমুনা'র বিষয়ে একটু আলোচনা করা যাবে।"

আমি বললাম, "আমরা যে কজন আছি, দাঁড়ে ব'সে যাই শরৎ, তুমি হাল ধ'রে পথ দেখিয়ে চল।"

মনে হ'ল, কথাটা শরতের কতকটা ভাল লেগেছে। নিঃশব্দে মনে মনে একটা কিছু ভেবে বললে, "আচ্ছা, এবার যেদিন আসব, সেদিন দাঁড় আর হালের বিষয়ে কিছু আলোচনা করা যাবে। দিন তিনেক পরে একদিন আসব।"

তার প্রত্যাশায় আমি ও ফণীবাবু প্রত্যহ বৈকাল থেকে 'যমুনা' অফিসে উপস্থিত থাকব, সে কথা তাকে জানিয়ে দিলাম।

কিছুক্ষণ পরে শরৎকে ট্রামে তুলে দিয়ে উৎফুল্ল হৃদয়ে দুজনে বাড়ি ফিরলাম। যে সঙ্কল্প নিয়ে কাল থেকে আমাদের কল্পনা-জল্পনা উদ্যোগ-আয়োজনের অন্ত ছিল না, তা যে কতকটা সহজেই সফল হয়েছে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। 'যমুনা'র পৃষ্ঠায় যেদিন 'চরিত্রহীন' প্রথম আত্মপ্রকাশ করবে, সেদিনকার 'যমুনা'র সেই পাতাটির মহিমান্বিত চিত্র কল্পনা ক'রে আমাদের উভয়ের মনে একটা সুমিষ্ট আনন্দের সুর ঝঙ্কৃত হ'তে লাগল।

২৫

প্রতিদিন আমরা আশার প্রদীপ জ্বালিয়ে 'যমুনা' অফিসে ব'সে থাকি, শরৎ কিন্তু আসে না। আবার একদিন হওড়ায় খুরুট রোডে তার সন্ধানে যাব কি-না মনে মনে চিন্তা করছি, এমন সময়ে একদিন সন্ধ্যার কিছু পূর্বে শরৎ এসে উপস্থিত হ'ল।

'যমুনা'র বিষয়ে আলোচনা আরম্ভ হ'তেই বুঝলাম, 'যমুনা'র প্রতি বেশ-একটু দরদ নিয়েই সে এসেছে। 'যমুনা'কে বড় ক'রে তোলবার ইচ্ছায় এবং আগ্রহে সে যেন আমাদের দুজনের কারোর চেয়ে কম নয়; এমন কি, সময়ে সময়ে তার উৎসাহ যেন আমাদের দুজনের উৎসাহকে পিছনে ফেলে এগিয়ে চলে।

কলিকাতায় অবস্থানকালে 'যমুনা'র বিষয়ে শরৎ ক্রমশ কত যে উৎসাহশীল হ'য়ে উঠেছিল এবং রেঙ্গুনে ফিরে যাওয়ার পর আমাদের নিকট হ'তে চিঠি পেতে বিলম্ব হওয়ায় আমাদের উৎসাহের শৈথিল্য ঘটেছে কল্পনা ক'রে আমাদের প্রতি কিরূপ বিরক্ত হয়েছিল, তার পরিচয় পাওয়া যায় রেঙ্গুন থেকে আমাকে ভাগলপুরে লিখিত তার ১৯১৩ সালের ১০ই জানুয়ারির পত্রে। সে পত্রের কতক-কতক অংশ এইরূপ,—

প্রিয় উপীন,—তোমার পত্র পেয়ে দুর্ভাবনা গেল। দু'দিন পূর্বে ফণীন্দ্রের পত্র ও চরিত্রহীন পেয়েছি। তোমাদের ওপরে বেশিদিন রাগ ক'রে থাকা সম্ভব নয়, তাই এখন আর রাগ নেই। কিন্তু কিছু দিন পূর্বে সত্যই অনেকটা রাগ ও দুঃখ হয়েছিল। আমি কেবলই আশ্চর্য হয়ে ভাবতাম এরা করে কি? একখানা চিঠিও যখন দেয় না, তখন

নিশ্চয়ই এদের মতিগতি বদলে গেছে।...আমি যমুনার প্রতি স্নেহহীন নই। সাধ্যমত সাহায্য করব, তবে ছোটো গল্প লিখতে আর ইচ্ছে হয় না—ওটা তোমরা পাঁচ জনেই কর। প্রবন্ধ লিখব—এবং পাঠাবও।.. তুমি দু'একটা গল্প লিখতে বলেচ এবং পাঠাতেও লিখেচ, যদি লিখিই কাকে পাঠাব? তোমাকে না ফণীকে?—
[শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়: 'শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়,' পৃ. ৫৩-৫৪]

'যমুনা'র প্রতি শরৎচন্দ্রের উৎসাহের এবং ফণীন্দ্রনাথ পালের প্রতি সহানুভূতির পরিচয় রেঙ্গুন হ'তে ভাগলপুরে আমাকে লিখিত শরৎচন্দ্রের ১৯১৩ সালের ১০ই মে তারিখের চিঠির নিম্নোদ্ধৃত অংশগুলি থেকেও প্রকাশ পায়,—

....ফণীর কাগজখানা ছোট বটে, কিন্তু তার মত ভাল কাগজ বোধ করি আজকাল আর একটাও বাহির হয় না। ঈশ্বর করুন, ফণী এই ভাবে পরিশ্রম করিয়া তাহার কাগজ সম্পাদন করুক—দুদিন পরে হোক দশ দিন পরে হোক শ্রীবৃদ্ধি অনিবার্য। তবে চেষ্টা করা চাই —পরিশ্রম করা চাই। আর আমার কথা। আমি তাকে ছোট ভাইয়ের মতই দেখি। তার কাগজ থেকে যদি কিছু বাঁচে, তবে অন্য কাগজ। ....ফণীর কাগজে প্রতি মাসেই যাতে এই রকম একটা কিছু [পথ-নির্দেশের মতো] বার হয় তার চেষ্টা সবিশেষ করা উচিত।....তারপরে হয় চরিত্রহীন, না হয় ওর চেয়েও একটা ভাল কিছু যমুনায় বার করা চাই। আর প্রবন্ধ। এটাও খুব প্রয়োজন। ভাল প্রবন্ধের বিশেষ দরকার।....আমাকে যদি তোমরা ছোট গল্প লিখবার পরিশ্রম থেকে অব্যাহতি দিতে পার ত আমি প্রবন্ধও লিখতে পারি। বোধ করি গল্পের মত সরল এবং সুপাঠ্য ক'রেই। এ বিষয়ে তোমার

অভিমত জানাবে। যদি গল্পলেখার কাযটা তোমরা চালিয়ে নিতে পার, আমি শুধু novel ও প্রবন্ধ নিয়েই থাকি।—[শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : 'শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়,' পৃ. ৫৯-৬০]

'যমুনা'র প্রতি শরতের অনুরাগ কত বেশি ছিল, স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হ'য়ে 'যমুনা'র জন্য কতটা পরিশ্রম করতে সে চেয়েছিল, এবং কলিকাতা পরিত্যাগ করবার পূর্বে 'যমুনা'র বিষয়ে যা কিছু প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তা পালন করবার কতটা তার সঙ্কল্প ছিল, ১৯১৩ সালের মাঘ মাসে ফণীবাবুকে লিখিত পত্রের নিম্নোদ্ধৃত অংশগুলি হ'তে তা জানা যায়—

গল্প ছাড়া সমস্ত রকম subject নিয়েই প্রবন্ধ লিখতে পারি, তা যদি আপনার আবশ্যক থাকে লিখবেন। যে কোন subject—তাতেই আমি স্বীকার আছি।....আর একটা কথা—আপনি 'যমুনা' ছাপাতে দেবার আগে গল্প, প্রবন্ধ ইত্যাদি আমাকে একবার যদি দেখাতে পারেন, বড় ভাল হয়। এই ধরুন চৈত্রের জন্য যে-সব ঠিক করেছেন সেইগুলো এখন অর্থাৎ মাসখানেক আগে আমাকে পাঠালে—একটু নির্বাচন ক'রে দিতেও পারি।....আমাকে দিয়ে যতটুকু উপকার হ'তে পারে আমি তা নিশ্চয় করব। কথা দিয়েছি, সেই মত কাজও করব।—[শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় : 'শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়,' পৃ. ৭১]

সুতরাং, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, ১৯১২ সালের শেষভাগে শরৎচন্দ্রের কলিকাতায় আগমনের পর সুরেশচন্দ্র সমাজপতির সহিত পরিচয় সাধন ও তাঁর নিকট হ'তে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লাভ, এবং বিশেষ

ক'রে 'যমুনা'র সহিত অতিনিবিড় সংযোগ স্থাপন গভীরভাবে তাঁর সাহিত্য-জীবনকে প্রভাবিত এবং উত্তেজিত করতে সমর্থ হয়েছিল। এমন কথা শরৎচন্দ্র নিজেও বিবৃত করেছেন। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে শরৎচন্দ্রের সহিত শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ঘোষালের যে কথোপকথন হয়, তা "শরৎ-প্রসঙ্গ" নামে ২২শে সেপ্টেম্বর ১৯২৮ তারিখের 'স্বদেশী বাজারে' প্রকাশিত হয়েছিল। শরৎচন্দ্র বলেছিলেন,—

> আমার সত্যিকারের সাহিত্যিক জীবন বল্‌তে যা বুঝায় তা ১৯১৩ সাল থেকেই আরম্ভ হয়েছে। তখন ফণী পালের 'যমুনা' মাসিক পত্রখানা মর মর—আমিও সবেমাত্র রেঙ্গুন থেকে ফিরে এসেছি—ফণীবাবু আমাকে তাঁর কাগজের জন্যে কিছু লিখতে অনুরোধ করেন। তাঁর বিশ্বাস হ'ল, আমি লিখলেই তাঁর কাগজখানা বেঁচে যাবে। আমি তাঁর অনুরোধ পালন ক'রে স্বনামে-বেনামে অনেক কিছুই লিখতে লাগলুম।—[শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়: 'শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়,' পৃ. ১১-১২]

শরৎচন্দ্রের এই উক্তির সহিত তার আরও দুটি উক্তি যুক্ত করলে কথাটা স্পষ্টতর হবে। কলিকাতা হ'তে রেঙ্গুনে প্রত্যাবর্তনের পর ২৬এ এপ্রিল ১৯১৩ তারিখে তিনি আমাকে যে পত্র লেখেন, তাঁর এক স্থানে নিম্নলিখিত প্রথম উক্তিটি আছে।—

> তুমি যে আমার কত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী তাও যদি না বুঝিতাম উপীন, এমন করিয়া আজ গল্প লিখিতেও পারিতাম না।—[শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়: 'শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়,' পৃ. ৫৭]

যৎপরোনাস্তি সঙ্কোচের সঙ্গে এই উক্তিটি উদ্ধৃত করলাম। আমি যে শরৎচন্দ্রের বিশেষ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ছিলাম, সে কথা একান্তই সত্য।

কিন্তু সেই সত্য অবগত থাকার ফলে শরৎচন্দ্র ভাল ক'রে গল্প লিখতে পেরেছিলেন, এমন অহঙ্কার কোনো দিনই আমার মন অধিকার ক'রে ছিল না। এ উক্তির দ্বারা আমি শুধু এই কথাটুকুই বলতে চাই যে, শরৎচন্দ্রের কলিকাতায় অবস্থানকালে যে-ঘটনাবলী তাঁর সাহিত্য-প্রতিভাকে জাগিয়ে তোলবার কারণ হয়েছিল, শরৎচন্দ্র মনে করতেন তদ্বিষয়ে আমার চেষ্টাও সেই ঘটনাবলীর একটা অংশ।

শরৎচন্দ্রের দ্বিতীয় উক্তিটি উল্লিখিত প্রথম উক্তিরই সমর্থক। রেঙ্গুন হ'তে ১০ই মে ১৯১৩ তারিখের পত্রে তিনি আমাকে লিখেছিলেন,—

> তুমি লিখিতেছ আমরা যমুনাকে বড় করিব। আমরাটা কে? তুমি যে যমুনার পরম বন্ধু, এবং নিঃস্বার্থ বন্ধুত্ব করিতে গিয়াই লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছ তাহা আমি বিশেষ জানি বলিয়াই তোমার সম্বন্ধে যত কিছু শুনিয়াছি একটাতেও বিন্দুমাত্র কান দিই নাই। হইতে পারে কিছু diplomatic চাল চালিয়াছ—তা বেশ করিয়াছ। যাকে ভালবাসিবে, তাকে এমনি করিয়াই সাহায্য করিবে। ফণীকে তুমিই ভালবাস, কিন্তু তা ছাড়া "আমরা" কথাটার অর্থ ঠিক বুঝিলাম না। এবারে বুঝাইয়া বলিবে।—[শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়: 'শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়,' পৃ. ৬১]

সেদিন 'যমুনা'-অফিসে ব'সে শরৎ পূর্বদিনের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী দাঁড় ও হাল সম্বন্ধে সুদীর্ঘ আলোচনা চালালে। কে কে গল্প এবং উপন্যাস লিখবে, কাদের ওপর প্রবন্ধ লেখবার ভার দেওয়া হবে, কবিতা কার কার নেওয়া যেতে পারে—ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার পর সিদ্ধান্তগুলি খাতায় লিখে ফেলা হ'ল। ব্যবসায়-সংক্রান্ত আলোচনাও একেবারে বাদ পড়ল না। তিন জন অব্যবসায়ী মিলে

ক'রে 'যমুনা'র সহিত অতিনিবিড় সংযোগ স্থাপন গভীরভাবে তাঁর সাহিত্য-জীবনকে প্রভাবিত এবং উত্তেজিত করতে সমর্থ হয়েছিল। এমন কথা শরৎচন্দ্র নিজেও বিবৃত করেছেন। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে শরৎচন্দ্রের সহিত শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ঘোষালের যে কথোপকথন হয়, তা "শরৎ-প্রসঙ্গ" নামে ২২শে সেপ্টেম্বর ১৯২৮ তারিখের 'স্বদেশী বাজারে' প্রকাশিত হয়েছিল। শরৎচন্দ্র বলেছিলেন,—

> আমার সত্যিকারের সাহিত্যিক জীবন বল্‌তে যা বুঝায় তা ১৯১৩ সাল থেকেই আরম্ভ হয়েছে। তখন ফণী পালের 'যমুনা' মাসিক পত্রখানা মর মর—আমিও সবেমাত্র রেঙ্গুন থেকে ফিরে এসেছি—ফণীবাবু আমাকে তাঁর কাগজের জন্যে কিছু লিখতে অনুরোধ করেন। তাঁর বিশ্বাস হ'ল, আমি লিখলেই তাঁর কাগজখানা বেঁচে যাবে। আমি তাঁর অনুরোধ পালন ক'রে স্বনামে-বেনামে অনেক কিছুই লিখতে লাগলুম।—[শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়: 'শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়,' পৃ. ১১-১২]

শরৎচন্দ্রের এই উক্তির সহিত তার আরও দুটি উক্তি যুক্ত করলে কথাটা স্পষ্টতর হবে। কলিকাতা হ'তে রেঙ্গুনে প্রত্যাবর্তনের পর ২৬এ এপ্রিল ১৯১৩ তারিখে তিনি আমাকে যে পত্র লেখেন, তাঁর এক স্থানে নিম্নলিখিত প্রথম উক্তিটি আছে।—

> তুমি যে আমার কত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী তাও যদি না বুঝিতাম উপীন, এমন করিয়া আজ গল্প লিখিতেও পারিতাম না।—[শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়: 'শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়,' পৃ. ৫৭]

যৎপরোনাস্তি সঙ্কোচের সঙ্গে এই উক্তিটি উদ্ধৃত করলাম। আমি যে শরৎচন্দ্রের বিশেষ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ছিলাম, সে কথা একান্তই সত্য।

কিন্তু সেই সত্য অবগত থাকার ফলে শরৎচন্দ্র ভাল ক'রে গল্প লিখতে পেরেছিলেন, এমন অহঙ্কার কোনো দিনই আমার মন অধিকার ক'রে ছিল না। এ উক্তির দ্বারা আমি শুধু এই কথাটুকুই বলতে চাই যে, শরৎচন্দ্রের কলিকাতায় অবস্থানকালে যে-ঘটনাবলী তাঁর সাহিত্য-প্রতিভাকে জাগিয়ে তোলবার কারণ হয়েছিল, শরৎচন্দ্র মনে করতেন তদ্বিষয়ে আমার চেষ্টাও সেই ঘটনাবলীর একটা অংশ।

শরৎচন্দ্রের দ্বিতীয় উক্তিটি উল্লিখিত প্রথম উক্তিরই সমর্থক। রেঙ্গুন হ'তে ১০ই মে ১৯১৩ তারিখের পত্রে তিনি আমাকে লিখেছিলেন,—

> তুমি লিখিতেছ আমরা যমুনাকে বড় করিব। আমরাটা কে? তুমি যে যমুনার পরম বন্ধু, এবং নিঃস্বার্থ বন্ধুত্ব করিতে গিয়াই লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছ তাহা আমি বিশেষ জানি বলিয়াই তোমার সম্বন্ধে যত কিছু শুনিয়াছি একটাতেও বিন্দুমাত্র কান দিই নাই। হইতে পারে কিছু diplomatic চাল চালিয়াছ—তা বেশ করিয়াছ। যাকে ভালবাসিবে, তাকে এমনি করিয়াই সাহায্য করিবে। ফণীকে তুমিই ভালবাস, কিন্তু তা ছাড়া "আমরা" কথাটার অর্থ ঠিক বুঝিলাম না। এবারে বুঝাইয়া বলিবে।—[শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়: 'শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়,' পৃ. ৬১]

সেদিন 'যমুনা'-অফিসে ব'সে শরৎ পূর্বদিনের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী দাঁড় ও হাল সম্বন্ধে সুদীর্ঘ আলোচনা চালালে। কে কে গল্প এবং উপন্যাস লিখবে, কাদের ওপর প্রবন্ধ লেখবার ভার দেওয়া হবে, কবিতা কার কার নেওয়া যেতে পারে—ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার পর সিদ্ধান্তগুলি খাতায় লিখে ফেলা হ'ল। ব্যবসায়-সংক্রান্ত আলোচনাও একেবারে বাদ পড়ল না। তিন জন অব্যবসায়ী মিলে

ব্যবসায়ের মূল নীতির অবলম্বনে হয়ত কতকগুলি ভ্রমাত্মক সিদ্ধান্তেই উপনীত হওয়া গেল।

এর পর দিন-কতক শরৎ প্রায় প্রত্যহই 'যমুনা' অফিসে আসতে লাগল। দিন দিন ক্রমশ তার আসবার লগ্ন হ'তে লাগল ত্বরিত, আর বিদায়ের ক্ষণ বিলম্বিত। বুঝলাম, সাগরপারের পাখী ফণীবাবুর সহৃদয়তার পিঞ্জরে ধরা পড়েছে। আড্ডা এবং আলোচনার যুগল অশ্বের দ্বারা দিনগুলি বাহিত হ'য়ে ছাড়াছাড়ির মুহূর্ত ঘনিয়ে এল। শরৎ জমাবে রেঙ্গুনে পাড়ি; তারপর আমি একদিন যাত্রা করব ভাগলপুরের পথে।

জাহাজ ছাড়বার কয়েকদিন পূর্বে বুকপকেট থেকে একটা ফাউণ্টেন পেন খুলে নিয়ে আমার হাতে দিয়ে শরৎ বললে, "আমার এই পছন্দসই কলমটা তোমাকে দিলাম উপীন, কাজে লাগিয়ো।" পরম শ্রদ্ধা এবং আনন্দের সহিত এই স্নেহের উপহার হৃৎপিণ্ডের নিকটতম স্থানে স্থাপন ক'রে শরৎকে ধন্যবাদ জানালাম। ১৯১৩ সালের ১০ই জানুয়ারির পূর্বোল্লিখিত পত্রে এই কলম সম্বন্ধে শরৎ লিখেছিল, "আমার ফাউণ্টেন পেন তোমার হাতে অক্ষয় হোক—ও কলমটা অনেক জিনিসই লিখেছে, খাটিয়ে নিলে আরও লিখবে।"

খাটিয়ে নিতে কসুর করি নি। চিঠিপত্র কবিতা গল্প থেকে আরম্ভ ক'রে 'শশিনাথ' উপন্যাসের প্রায় সবটাই ঐ কলমে লিখেছিলাম। কিন্তু শরতের মঙ্গলকামনা সফল হবার অবসর পায় নি; ফাউণ্টেন পেনটি আমার হাতে অক্ষয় ব'লে প্রতিপন্ন হবার পূর্বেই কোনো সমঝদার ব্যক্তির গোপন পকেটে বন্দী হয়েছিল। অনেক দিনের কথা, কিন্তু এখনো অতি আদরের সেই স্নেহের নিদর্শনটি হারানোর বেদনা মন থেকে সম্পূর্ণ লুপ্ত হয় নি।

আর একটি যৎপরোনাস্তি কৌতুকজনক কাহিনী বিবৃত করলেই শরতের সাহিত্য-জীবনের এই গুরুত্বপূর্ণ যুগের কথা বলা মোটামুটি শেষ হয়।

'যমুনা'য় 'চরিত্রহীন' প্রকাশিত হবে স্থির হওয়ার পর শুধু সে কথাই নয়, 'বড়দিদি' উপন্যাসের শক্তিশালী লেখক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অতঃপর প্রতি মাসে নিয়মিতভাবে 'যমুনা'য় লেখা দেবার ভার গ্রহণ করেছেন, 'যমুনা'র প্রচারকল্পে ফণীবাবু ও আমি এ সংবাদ কলিকাতার সাহিত্যিক ও পাঠক মহলে বহুলভাবে প্রচারিত করতে লাগলাম। পৃথকভাবে ও একত্রে আমরা দুজনে বিভিন্ন সাহিত্যিক আসরে গিয়ে বসি ও ফলাও ক'রে সংবাদ রটাই। দেখতে দেখতে কথাটা সর্বত্র রাষ্ট্র হ'য়ে গেল। টনক পড়ল বিশেষ ক'রে দুটি জায়গায়,—'সাহিত্য' ও 'ভারতবর্ষ' মাসিক পত্রদ্বয়ের চৈতন্যে।

'সাহিত্য'-সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি 'চরিত্রহীন' হাতে পেয়ে ছেড়ে দিয়ে পরে বোধ হয় কতকটা অনুতপ্ত হয়েছিলেন; তারপর যখন দেখলেন 'যমুনা'র মতো দ্বিতীয় শ্রেণীর পত্রিকা 'চরিত্রহীন' প্রকাশিত ক'রে উন্নতির পথে অগ্রসর হবার ব্যবস্থা করেছে, এবং 'চরিত্রহীন' অপরে প্রকাশিত করলে তাকে অতিক্রম ক'রে শরৎচন্দ্রের নূতন লেখা সংগ্রহ করা তাঁর পক্ষে কঠিন হবে, তখন 'চরিত্রহীন' ফিরে পাবার জন্য তিনি রেঙ্গুনে শরৎকে চিঠি লিখতে ও টেলিগ্রাম পাঠাতে আরম্ভ করলেন।

ওদিক 'ভারতবর্ষ' শরতের মজঃফরপুরের অন্তরঙ্গ বন্ধু প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে দিয়ে 'চরিত্রহীন' হস্তগত করবার জন্য বিধিমতে চেষ্টা করছে। রেঙ্গুন থেকে শরৎ আমাকে লিখলে—

আর একটা কথা উপীন। 'ভারতবর্ষ' কাগজের জন্য প্রমথ চরিত্রহীন বরাবরই চাহিতেছিল। শেষে এমনি পীড়াপীড়ি করিতেছে যে, কি আর বলিব।... সে জাঁক করিয়া সকলের আছে বলিয়াছে চরিত্রহীন দিবই এবং এই আশায় — প্রভৃতির লেখা চার পাঁচটা উপন্যাস অহঙ্কার করিয়া ফিরাইয়া দিয়াছে। সেই হইতেছে 'ভারতবর্ষে'র মোড়ল। এখন দ্বিজবাবু প্রভৃতি তাহাকে চাপিয়া ধরিয়াছে। এদিকে যমুনাতেও বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছে ঐ কাগজে চরিত্রহীন ছাপা হইবে। সমাজপতিও registery চিঠি ক্রমাগত লিখিতেছেন। কোন্ দিকে কি করি একেবারে ভেবে পাইতেছি না। এইমাত্র আবার প্রমথনাথের দীর্ঘ কান্নাকাটি চিঠি পাইলাম। সে বলে, এটা সে না পেলে আর তার মুখ দেখাইবার যো থাকিবে না। এমন কি, পুরাতন বন্ধু-বান্ধব club প্রভৃতি ছাড়িতে হইবে। কি করি? একটু ভাবিয়া জবাব দিবে। তোমার জবাব চাই, কেন না, একা তুমিই এর সুরু থেকে history জান।—[শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়: 'শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়,' পৃ. ৫৭-৫৮]

কি উপদেশ শরৎকে দিয়েছিলাম তা মনে নেই; সম্ভবত তারই ওপর সিদ্ধান্তের ভার ছেড়েছিলাম; কিন্তু ভারি চিন্তিত হ'য়ে পড়লাম। ত্রিশক্তির দ্বারা তিন দিক থেকে 'চরিত্রহীন' নিয়ে টানাটানি পড়েছে। 'সাহিত্যে'র জন্যে তেমন ভয় নেই, হাতে পেয়ে প্রত্যাখ্যান ক'রে সে তার মামলা দুর্বল ক'রে ফেলেছে। ভয় শুধু প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী 'ভারতবর্ষ'কে নিয়ে। প্রভাব, প্রতিপত্তি, অর্থ—কোনো বিষয়েই আমরা তার সমকক্ষ নই। এদিকে ফণীবাবু প্রতিদিন কান্নাকাটি ক'রে চিঠি লিখছেন—'বাঁচন আমায় উপেনবাবু, 'যমুনা'য় বিজ্ঞাপন

প্রকাশিত হওয়ার পর 'চরিত্রহীন' যদি অপর কাগজে প্রকাশিত হয় কলকাতা ছেড়ে আমাকে পালাতে হবে।"

ঘটনাচক্রে 'চরিত্রহীনে'র পাণ্ডুলিপি শেষ পর্যন্ত গিয়ে পৌছল প্রমথনাথ ভট্টাচার্যের হাতে। 'ভারতবর্ষে'র দৃঢ় মুষ্টি থেকে 'চরিত্রহীন'কে উদ্ধার করবার কোনো উপায়ই মাথার মধ্যে আসে না। ফণীবাবু ত পাগল হবার যোগাড় করলেন।

কিন্তু রাখে কেষ্ট মারে কে! যে মেসের ঝি একদিন সুরেশচন্দ্র সমাজপতির হাত থেকে 'চরিত্রহীন'কে উদ্ধার ক'রে আমাদের হাতে সঁ'পে দিয়েছিল, এবারও সেই 'মেসের ঝি'ই হ'ল 'চরিত্রহীন'র উদ্ধারকর্ত্রী। ফণীবাবু ও আমি, দুজনে প্রাণ ভ'রে সাবিত্রীকে আশীর্বাদ করলাম।

শরৎ আমাকে লিখলে, "তাহারা ('ভারতবর্ষ') সাবিত্রীকে 'মেসের ঝি' বলিয়াই দেখিয়াছে। যদি চোখ থাকিত, এবং কি গল্প কি চরিত্র কি ভাবে শেষ হয়, কোন্ কয়লার খনি থেকে কি অমূল্য হীরা মাণিক ওঠে তা যদি বুঝিত, তাহা হইলে অত (?) সহজে ওখানা ছাড়িতে চাহিত না। শেষে হয়ত একদিন আপশোষ করিবে কি রত্ন হাতে পাইয়াও ত্যাগ করিয়াছে।"

সেই চিঠিতেই ('শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়,' পৃ. ৬০) শরৎ আমাকে লিখেছিল, "চরিত্রহীন আমার হাতে আসিয়া পড়িলেই ফণীকে পাঠাইয়া দিব। আমার হাতে আর রাখিব না। তবে প্রমথ ফণীর হাতে ওটা দিবে না, কেন না, ফণীর উপর তাহারা কিছু রাগিয়া গিয়াছে। তা হয়। কারণ, মাসিক পত্রের পরিচালকেরা পরস্পরকে দেখিতে পারে না।"

দুবার সাগর পার হ'য়ে তারপর 'চরিত্রহীন' আমাদের হাতে পৌছবে, আমরা কিন্তু সে বিলম্বিত প্রণালীর অপেক্ষায় রইলাম না। শুভস্য

শীঘ্রং নীতি অবলম্বন ক'রে ভাগলপুর থেকে প্রমথবাবুকে চিঠি লিখে দিন, সময় এবং স্থান ঠিক করলাম। তারপর কলিকাতায় এসে নির্দিষ্ট দিনে এবং সময়ে প্রমথবাবুর স্ট্র্যাণ্ড রোডের অফিসে উপস্থিত হলাম।

আমার হাতে 'চরিত্রহীনে'র পাণ্ডুলিপি অর্পণ ক'রে প্রমথবাবু স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। তার ঘণ্টাখানেক পরে ভবানীপুরে 'চরিত্রহীনে'র পাণ্ডুলিপি হাতে পেয়ে ফণীবাবুও ত্যাগ করলেন স্বস্তির নিশ্বাস। উভয়েরই সঙ্কট মোচন হ'ল।

॥ প্রথম পর্ব সমাপ্ত ॥